সরল প্রাথমিক পৌরনীতি

সরল প্রাথমিক পৌরনীতি

(For the Pre-University Course of Civics)

অধ্যাপক ইউ. এন. সেন, এম. এ.
প্রণীত

মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড
পুস্তকবিক্রেতা ও প্রকাশক
১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২
১৯৬০

ভূমিকা

১৯৬০ সাল হইতে আমাদের বিশ্ববিদ্যালযে তিন বৎসরের বি. এ. ক্লাস ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করা হইতেছে। যে সব ছাত্র-ছাত্রী স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা পাস করিয়া আসিবে তাহাদিগকে এক বৎসর কলেজে পড়িতে হইবে। তাহার পর পরীক্ষায় পাস করিলে বি. এ. ক্লাসে ভর্ত্তি করিয়া লওয়া হইবে। এই এক বৎসরের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় যে পাঠ্যসূচী নির্দ্দেশ করিয়াছে এই বইখানি তদনুযায়ী লেখা হইয়াছে। ইহার মধ্যে জাতীয় আয়, অনুন্নত দেশের অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য ও আর্থিক পরিকল্পনা প্রভৃতি নূতন বিষয় সম্বন্ধে প্রশ্নের বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। আশা করি সরল পৌরনীতির ন্যায় এই বইখানিও ছাত্র-ছাত্রীদের উপকারে আসিবে। ইতি—

কলিকাতা ইউ. এন. সেন

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

এই সংস্করণে তৃতীয় পরিকল্পনার আলোচনা করা হইয়াছে এবং অন্য অধ্যায়ে কিছু কিছু নূতন তথ্যের সন্নিবেশ করা হইয়াছে। আশা করি এই সংস্করণও পূর্ব্বের ন্যায় ছাত্রপ্রিয় হইবে। ইতি—

ইউ. এন. সেন

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড

পৌরনীতি

বিষয়		পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়ঃ	পৌরনীতির বিষয়বস্তু	১
দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ	রাষ্ট্রের বিবর্তন	৪
তৃতীয় অধ্যায়ঃ	রাষ্ট্র	১৩
চতুর্থ অধ্যায়ঃ	রাষ্ট্রের বিভিন্ন রূপ	২০
পঞ্চম অধ্যায়ঃ	শাসনক্ষমতা পৃথকীকরণনীতি	৩৮
ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ	জাতীয়তাবাদ	৪৫
সপ্তম অধ্যায়ঃ	নাগরিক অধিকার	৫২
অষ্টম অধ্যায়ঃ	আইন, স্বাধীনতা এবং সাম্য	৬৭
নবম অধ্যায়ঃ	জনমত	৭৪
দশম অধ্যায়ঃ	দলব্যবস্থা	৭৮
একাদশ অধ্যায়ঃ	নির্বাচকমণ্ডলী	৮৩
দ্বাদশ অধ্যায়ঃ	বিবিধ	৯৫

দ্বিতীয় খণ্ড

ধনবিজ্ঞান

প্রথম অধ্যায়ঃ	ধনবিজ্ঞানের ব্যাখ্যা-নির্দেশ	৯৭
দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ	ধন, দ্রব্য এবং উৎপাদন	১০৩
তৃতীয় অধ্যায়ঃ	জাতীয় আয়	১০৮
চতুর্থ অধ্যায়ঃ	উৎপাদনের উপাদান	১১৪
পঞ্চম অধ্যায়ঃ	শ্রমবিভাগ	১৩১
ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ	মূল্য-নিরূপণ নীতি	১৫০

বিষয়		পৃষ্ঠা
সপ্তম অধ্যায় ঃ	অর্থ, ক্রেডিট ও ব্যাঙ্ক	১৬৯
অষ্টম অধ্যায় ঃ	আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য	১৯২
নবম অধ্যায় ঃ	ধনবিভাগ	১৯৯
দশম অধ্যায় ঃ	করনীতি	২১২

তৃতীয় খণ্ড
ভারতের অর্থনীতি

প্রথম অধ্যায় ঃ	প্রাকৃতিক পরিবেশ	২২৩
দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ	কৃষিকার্য্য	২৩০
তৃতীয় অধ্যায় ঃ	সমবায়	২৪৫
চতুর্থ অধ্যায় ঃ	ভূমি-রাজস্ব	২৫৩
পঞ্চম অধ্যায় ঃ	কুটিরশিল্প	২৫৭
ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ	শিল্প	২৬৫
সপ্তম অধ্যায় ঃ	বৈদেশিক বাণিজ্য	২৭২
অষ্টম অধ্যায় ঃ	ভারতের মুদ্রানীতি এবং ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থা ...	২৭৮
নবম অধ্যায় ঃ	সরকারী রাজস্বনীতি	২৮৩
দশম অধ্যায় ঃ	পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	২৮৯

প্রথম অধ্যায়

পৌরনীতির বিষয়বস্তু

Q. 1. *Define Civics.* (C. U. 1927)

উঃ। "পৌর" শব্দটি পুর অর্থাৎ নগর কথাটি হইতে উদ্ভূত। পুরবাসী অর্থাৎ সহরে বাসকারী লোকসম্বন্ধীয় আলোচনাকেই পৌরনীতি বলা স্বাভাবিক। কিন্তু পৌরনীতিতে "পৌর" শব্দটি আরও ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়। পুরবাসী বলিতে শুধু নগরবাসী নয়, সকল শ্রেণীর সমাজবদ্ধ মানুষকেই বুঝায়। এই অর্থে পুরবাসীদের বিভিন্ন কর্ম্মের আলোচনাকেই পৌরনীতি বলে। আমরা যে সমাজে বাস করি, সেই সমাজের প্রতি আমাদের বহু কর্ত্তব্য আছে। আবার সমাজের নিকট হইতে আমরা অনেক অধিকার ও সুবিধা লাভ করি। এই অধিকার ও কর্ত্তব্যজড়িত কার্য্যাবলী পৌরনীতির বিষয়বস্তু। এই শ্রেণীর কার্য্যের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ইত্যাদি বিভিন্ন দিক আছে। পৌরনীতিতে এই কর্ম্মপ্রণালীর বিভিন্ন দিকের আলোচনা করা হয়।

Q. 2. *Define the scope of Civics.* (C. U. 1930, 1947)

উঃ। পুরবাসী বা নাগরিক হিসাবে মানুষের কর্ম্মপ্রণালীর আলোচনা যে শাস্ত্রে পাওয়া যায়, তাহারই নাম পৌরনীতি। এখানে নাগরিক বলিতে আমরা শুধু নগরবাসীকে বুঝি না। সমাজবদ্ধ মানুষকে নাগরিক আখ্যা দেওয়া হয়। নাগরিক জীবনের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক পৌরনীতির আলোচনার বিষয়বস্তু। মানুষ সমাজবদ্ধ না হইয়া বাস করিতে পারে না। নাগরিক হিসাবে মানুষের যে কার্য্যকলাপ এবং নাগরিকদের পরস্পরের মধ্যে যে সম্পর্ক, পৌরনীতি এ সমস্ত বিষয়ের আলোচনা করে। যে যে পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার ভিতর দিয়া এবং যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে

যুক্ত হইয়া মানুষের নাগরিক জীবন গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাদের আলোচনা পৌরনীতির উদ্দেশ্য। আবার সাধারণ লোক নাগরিক হিসাবে রাষ্ট্রের নিকট হইতে যে সমস্ত অধিকার অর্জ্জন করিয়াছে, অথবা যে-সব অধিকার তাহার প্রাপ্য এবং রাষ্ট্রের প্রতি তাহার যে কর্ত্তব্য, তাহাও পৌরনীতির বিষয়ীভূত। পৌরনীতি নাগরিক জীবনের শুধু বর্ত্তমানকে আলোচনা করিয়াই ক্ষান্ত নয়, তাহার অতীত ইতিহাসকেও বিশ্লেষণ করে। কেমন করিয়া যুগ যুগ ধরিয়া মানুষের নাগরিক-বোধ উন্নতিলাভ করিয়াছে, তাহার আলোচনাও পৌরনীতির অন্তর্গত।

নাগরিককে বহু প্রকারের সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়। সে যে গ্রামে বা সহরে বাস করে, সেখানকার স্থানীয় সমস্যা লইয়া তাহাকে ভাবিতে হয়। শুধু এই সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিলেই তাহার চলে না। সে যে রাষ্ট্রের সদস্য, সেই রাষ্ট্রের সহিত তাহার ভাগ্য জড়িত। প্রতি পদক্ষেপে তাহাকে রাষ্ট্রের বিধিনিষেধ মানিয়া চলিতে হয়। রাষ্ট্রের সদস্য হিসাবে তাহার অনেক কর্ত্তব্য ও অধিকার আছে। এই সমস্ত সমস্যা আলোচনা করাও পৌরনীতির কার্য্য। আবার, বর্ত্তমান সভ্য সমাজ-ব্যবস্থায় মানুষ তাহার নিজ নিজ রাষ্ট্রের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিয়া সম্পূর্ণ হইতে পারে না। কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এ কথা আজ সভ্য মানবের কাছে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে, শান্তি ও উন্নতি সুনিশ্চিত করিয়া তুলিতে হইলে সর্ব্ব-মানবের একটি রাষ্ট্র গঠন করা অতি প্রয়োজন। এইজন্য একজন ইংরাজ লেখক বলিয়াছেন যে, পৌরনীতি নাগরিক জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্ত বিসয়গুলির অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ এবং স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যা লইয়াই আলোচনা করে।

Q. 3. *Discuss the relation of Civics with (a) Politics, (b) Economics, (c) Sociology and (d) History.*

উঃ। (ক) পৌরনীতি ও রাষ্ট্রনীতি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। রাষ্ট্রের

আলোচনা যে শাস্ত্র করে, তাহার নাম রাষ্ট্রনীতি। রাষ্ট্রের সভ্য হিসাবে মানুষের কর্ম্মধারার আলোচনা পৌরনীতিতেও করা হয়। এই দিক দিয়া এই দুইয়ের মধ্যে প্রচুর সাদৃশ্য রহিয়াছে। কিন্তু প্রভেদও অনেক আছে। নাগরিকের জীবন কেবলমাত্র রাজনৈতিক গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। প্রত্যেকের জীবনের রাজনৈতিক দিক্ ছাড়াও অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক প্রভৃতি দিক রহিয়াছে। পৌরনীতি নাগরিক জীবনের এই দিকগুলিরও আলোচনা করে। এইজন্য ইহার বিষয়বস্তু রাষ্ট্রনীতি হইতেও বিস্তৃত।

(খ) নাগরিক হিসাবে মানুষের কার্য্যাবলীর আলোচনা করাই পৌরনীতির কাজ। সুতরাং মানুষের অর্থনৈতিক কার্য্যকলাপের আলোচনার সঙ্গে তাহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। অর্থনৈতিক জ্ঞান ব্যতীত কোন নাগরিকের পক্ষে কর্ত্তব্য পালন অথবা নিজ সামর্থ্যের পূর্ণ বিকাশ করা সম্ভবপর নয়। তাহার জীবনের উন্নতি অর্থনৈতিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। প্রত্যেক নাগরিককেই দারিদ্র্য, বেকারসমস্যা, বাজার-মন্দা প্রভৃতি অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়। সুতরাং পৌরনীতির ছাত্রের পক্ষে অর্থনীতি অধ্যয়ন করা খুবই প্রয়োজন। কিন্তু তাই বলিয়া এ কথা বুঝিলে চলিবে না যে, পৌরনীতির বিষয়বস্তু কেবলমাত্র নাগরিক জীবনের অর্থনৈতিক প্রকাশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। নাগরিক কর্ম্মপন্থার সমস্ত দিকই এই শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়।

(গ) সমাজের সামগ্রিক রূপ-সম্বন্ধে আলোচনা করাই সমাজ-বিজ্ঞানের কাজ। পৌরনীতির কাজ হইতেছে সমাজ-জীবনের কেবলমাত্র একটি দিক্, নাগরিক জীবন লইয়া আলোচনা করা। অতএব পৌরনীতি বৃহত্তর সমাজ-বিজ্ঞানের একটি অংশমাত্র।

(ঘ) নাগরিক জীবনের বিভিন্ন কর্ম্মপদ্ধতি লইয়া যে শাস্ত্রের কারবার, ইতিহাসের সঙ্গে তাহার নিকট সম্পর্ক রহিয়াছে। ইতিহাস আমাদের বলিয়া দেয়, কেন এবং কি করিয়া আমরা আমাদের বর্ত্তমান নাগরিক জীবনে

পৌঁছাইতে পারিয়াছি। সুতরাং পৌরনীতির সহিত ইতিহাসের সম্পর্ক বেশ ঘনিষ্ঠ। কিন্তু তাই বলিয়া পৌরনীতিকে ইতিহাস মাত্র বলা চলে না। তাহার কারণ, পৌরনীতি শুধু অতীত লইয়া ব্যস্ত নয়, নাগরিক জীবনের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ কার্য্যাবলীর আলোচনাও তাহার কাজ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

রাষ্ট্রের বিবর্ত্তন

Q. 1. *Write short notes on the theories of the Origin of the State :*

(*a*) *Social Contract Theory.*

(*b*) *The Theory of Divine Origin.*

(*c*) *The Theory of Force.* (C. U. 1945, 1948)

"*Will, and not force, is the basis of the State.*"—

Comment.

উঃ। (ক) **সামাজিক চুক্তি-মতবাদ**ঃ এই মতবাদে বলে যে, রাষ্ট্রের উৎপত্তি একটি চুক্তির মধ্য দিয়া হইয়াছে। আদিম অবস্থায় মানুষ এমন প্রাকৃতিক অবস্থায় বাস করিত, যেখানে মনুষ্যকৃত আইনের বন্ধন ছিল না এবং কোন সামাজিক প্রতিষ্ঠানও গড়িয়া উঠে নাই। কেবলমাত্র কতকগুলি প্রাকৃতিক অনুশাসন ব্যতীত লোকে আর কোন নিয়ম মানিয়া চলিত না। নানাকারণে এইরূপ প্রাকৃতিক রাজ্যে (state of nature) অনেক অসুবিধা দেখা দিল। এই সব অসুবিধা দূর করিবার উদ্দেশ্যে লোকেরা নিজেদের মধ্যে চুক্তি করিয়া একটি শৃঙ্খলাপূর্ণ সমাজ-ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করিল। এইভাবে রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিয়াছে।

আমাদের দেশের কৌটিল্য ও গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর লেখায় এই মতবাদের প্রথম প্রকাশ হইয়াছিল। ইউরোপে ইংরাজ লেখক হব্‌স্ ও লক্ এবং ফরাসী লেখক রুশো এই তিনজন বিখ্যাত দার্শনিক এই মত প্রচার করেন। **হব্‌সের** মতে আদিম যুগের মানুষ যে প্রাকৃতিক রাজ্যে বাস করিত, সেখানে মারামারি-কাটাকাটিই ছিল স্বাভাবিক নিয়ম। বনের মধ্যে যেমন জীবজন্তুর বিরোধ লাগিয়াই থাকে, প্রাকৃতিক রাজ্যেও সেইরূপ মানুষে মানুষে সর্ব্বদাই লড়াই লাগিয়া থাকিত। কাজেই প্রাণের ভয়ে মানুষকে সর্ব্বদা সশঙ্কচিত্তে বাস করিতে হইত। এই অসহনীয় অবস্থা হইতে মুক্তি পাইবার আগ্রহে একদিন সমস্ত লোক একজোট হইয়া একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হইল। এই চুক্তির দ্বারা তাহারা তাহাদের সমস্ত অধিকার একজন রাজার হস্তে সমর্পণ করিল, তিনি শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার ভার গ্রহণ করিলেন। ফলে রাজা সার্ব্বভৌম শক্তির অধিকারী হইলেন। লোকেরা চুক্তির সময় রাজার হস্তে সমস্ত ক্ষমতা ও অধিকার সমর্পণ করিয়াছিল। সুতরাং রাজার বিরুদ্ধাচরণ করিবার অধিকার তাহাদের রহিল না। হব্‌স্ এইভাবে স্বেচ্ছাচারী রাজার সমর্থন করিয়াছি[illegible] কিন্তু দার্শনিক **লকের** মত একটু অন্য ধরণের। তাঁহার মতে প্রাকৃতিক রাজ্য শান্তি এবং ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রত্যেক লোক কতকগুলি প্রাকৃতিক অনুশাসন অনুযায়ী কাজ করিত। অবশ্য ক্রমে ক্রমে প্রাকৃতিক অনুশাসনগুলির প্রকৃত অর্থ লইয়া মতভেদ উপস্থিত হইল ও ভিন্ন মতের সংঘাতে নানা অসুবিধা হইতে লাগিল। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য জনসাধারণ রাজার সঙ্গে চুক্তি করিয়া একটি সমাজ-ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করিল। কিন্তু লকের মতে রাজাকে সার্ব্বভৌম ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই। চুক্তিপত্রের সর্ত্ত অনুযায়ী কতকগুলি জন্মগত অধিকার সংরক্ষণের দায়িত্ব রাজার উপর ন্যস্ত করা হইল। রাজা যদি চুক্তির কোন সর্ত্ত পালন না করেন, তবে জনসাধারণ তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে পারে। লক্ এই মতবাদ দ্বারা গণতন্ত্রের সমর্থন করিলেন। **রুশোর** মতে প্রাকৃতিক রাজ্য ছিল

ভূস্বর্গতুল্য আদর্শস্থান। কিন্তু জনসংখ্যা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই আদর্শরাজ্যেও অনেক গলদ দেখা দিল এবং এই গলদ দূর করিবার জন্যই জনসাধারণ নিজেদের মধ্যে একটি চুক্তি করিয়াছিল। সার্ব্বভৌম শক্তি কিন্তু এই চুক্তির পরেও জনসাধারণের হস্তে রহিয়া গেল। 'General Will' বা জনগণের ইচ্ছাই হইল এই সার্ব্বভৌম শক্তি। রুশোর মতে দেশে রাজা থাকিবার কোন প্রয়োজন নাই।

এই মতবাদ অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। পরে অনেকগুলি কারণে এই মতবাদ বর্জ্জিত হইয়াছে। প্রথমতঃ, এই মতবাদের ভিত্তি ঐতিহাসিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। ইতিহাসে এমন একটিও রাষ্ট্রের নজির মিলে না, যাহার প্রতিষ্ঠা কোন চুক্তি দিয়া করা হইয়াছিল। রাষ্ট্র কোন চুক্তির ফলে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সহজাত প্রবৃত্তির বশেই মানুষ অতি আদিমকাল হইতেই সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন করিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, যখন কোন রাষ্ট্র ছিল না, তখন মানুষের কোন অধিকার (ন্যাচারাল রাইটস্) থাকিতে পারে না এবং থাকা সম্ভবপর নহে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত [illegible] অধিকার রক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বদাই বদ্ধপরিকর না থাকে, ততক্ষণ সর্ব্বসাধারণের কোন স্বাধীনতা বা অধিকার প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর নয়। তৃতীয়তঃ, কোন চুক্তির ফলে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এই মতের পরিণতি বিপজ্জনক। ইহার অর্থ এই যে, সে রকম অসুবিধা হইলে প্রত্যেকেরই চুক্তিভঙ্গের অধিকার আছে অর্থাৎ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবার অধিকার আছে। এই মতবাদে পরিণাম এই দিক দিয়া বিপজ্জনক। কিন্তু এই সমস্ত ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও এই মতবাদের মধ্যে একটি বিশিষ্ট সত্য রহিয়াছে। সম্মতি না থাকিলে সাধারণতঃ কেহ কোন চুক্তি করে না, এবং চুক্তি পরে মানিয়া চলার অর্থ এই যে, লোকেদের সেই চুক্তিতে সায় আছে। রাষ্ট্র চুক্তির দ্বারা গঠিত হইয়াছে বলার অর্থ এই যে, রাষ্ট্র জনসাধারণের সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত।

চুক্তির কথা সত্য না হইলেও দ্বিতীয় কথাটি সত্য। রাষ্ট্র জনসাধারণের সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রত্যেক দেশের গভর্ণমেণ্ট বা সরকারের স্থায়িত্ব—যাহারা শাসিত, তাহাদের ইচ্ছা ও সম্মতির উপর নির্ভর করে।

(খ) **ঐশ্বরিক উৎপত্তি বা ডিভাইন অরিজিন মতবাদঃ** এই মতে মূল অর্থ হইতেছে যে, রাষ্ট্র বিধাতার সৃষ্টি এবং রাজা তাঁহার প্রতিনিধি। সুতরাং সর্ব্ববিষয়ে রাজানুশাসন মানিয়া চলাই হইতেছে মানুষের ধর্ম্ম। ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে ইউরোপে এই মতবাদ প্রচলিত ছিল। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে নিম্নলিখিত কারণগুলির জন্য ইহা বর্জ্জন করা হইয়াছে। প্রথমতঃ, বিধাতা রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করেন নাই। রাষ্ট্র সম্পূর্ণভাবে মানুষের গড়া প্রতিষ্ঠান। দ্বিতীয়তঃ, এই মতবাদের পরিণতি হইতেছে, রাজাকে সর্ব্বশক্তিমান্ করিয়া স্বৈরাচারতন্ত্রের প্রশ্রয় দেওয়া। সুতরাং ইহার সমর্থন করা চলে না। রাষ্ট্রগঠনের প্রথমাবস্থায় এই মতবাদের হয়তো প্রয়োজন ছিল। ভগবানের অনুশাসন মনে করিয়াই মানুষ রাষ্ট্রবন্ধনের আনুগত্য মানিয়া লইতে পারিয়াছিল।

(গ) **"রাষ্ট্র বলের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত" (ফোর্স থিওরী) মতবাদঃ** অনেক লেখক বলেন যে, রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা এবং স্থায়িত্ব শক্তিপ্রয়োগের ফলেই সম্ভবপর হইয়াছে। রাষ্ট্রগঠনের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, অনেক ক্ষেত্রেই কোন শক্তিমান্ ব্যক্তি দুর্ব্বল ব্যক্তি বা অরক্ষিত অঞ্চলের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছে। কেবলমাত্র দৈহিক কিংবা মানসিক শক্তির বলে একজন লোক অন্যান্য ব্যক্তির উপর নিজের প্রভুত্ব বিস্তার করে। এইভাবে ক্রমে ক্রমে রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সৈন্যবাহিনী ও পুলিসের সাহায্যে রাষ্ট্র শাস্তি দিতে পারে বলিয়াই লোকে রাষ্ট্রের আদেশ মানিয়া চলে।

রাষ্ট্রের স্থায়িত্বের জন্য সৈন্যবল এবং আইন ও শৃঙ্খলাভঙ্গকারীদের শাস্তি দিবার জন্য পুলিস প্রভৃতির প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু ইহার দ্বারা একথা

প্রমাণিত হয় না যে, রাষ্ট্রের জন্ম কেবলমাত্র কোন শক্তিমান্ পুরুষ কিংবা সম্প্রদায়ের শক্তিপ্রয়োগের ফলেই সম্ভবপর হইয়াছে। রাষ্ট্রের ভিত্তি একমাত্র বাহুবলের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। মানুষ সহজাত সংস্কারের বশেই রাষ্ট্র গঠন করিয়াছে। রাষ্ট্রের বন্ধন সে যদি সহজভাবে মানিয়া না লইত, তবে শাসনকার্য্য পরিচালনা করা সম্ভব হইত না। এই কথা মনে করিয়াই ইংরাজ দার্শনিক গ্রীন বলিয়াছেন যে, রাষ্ট্রের ভিত্তি জনগণের সম্মতির উপর স্থাপিত, শক্তির উপর নহে। কেবলমাত্র সৈন্যসামন্তের উপর নির্ভর করিয়া কোন গভর্ণমেণ্টই দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে না। জনসাধারণের সম্মতি এবং শাসিতদের মানিয়া লওয়ার উপরেই রাজশক্তির স্থায়িত্ব নির্ভর করে। নাগরিকদের অধিকাংশ লোক রাষ্ট্রকে যদি না মানে, তবে সে রাষ্ট্র বেশীদিন টিকিতে পারে না। যে গভর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠা কেবলমাত্র পশুশক্তির উপর, তাহার আয়ুষ্কাল খুবই সাময়িক। রুশিয়ার এমন যে সর্ব্বশক্তিমান্ জার(সম্রাট্), তাঁহারও একদিন পতন ঘটিয়াছিল। ভারতবর্ষে যে শক্তিমান্ বৃটিশরাজ প্রতিষ্ঠিত ছিল তাহারও একদিন অবসান ঘটিয়াছে। কারণ এই রাজ্যের পশ্চাতে জনসাধারণের সমর্থন ছিল না। রাষ্ট্রের [illegible] নির্ভর করে জনসাধারণের আন্তরিক সমর্থনের জন্য, পুলিস বা সৈন্যবাহিনীর উপর নহে। সুতরাং এ কথা নিঃসন্দেহ যে, রাষ্ট্রের আসল ভিত্তি জনসাধারণের সম্মতির উপর নির্ভর করে।

Q. 2. *Write notes on :*

(a) Patriarchal Theory ;

(b) Matriarchal Theory.

উঃ। (ক) অনেকের মতে পরিবারই মানুষের সর্ব্বপ্রথম সামাজিক প্রতিষ্ঠান। মানুষ প্রথমে পরিবার গঠন করে। ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে সম্বন্ধবন্ধন গড়িয়া উঠে। এইভাবে রাষ্ট্র স্থাপিত হয়। রাষ্ট্র যেন একটি বৃহদায়তন পরিবার। পরিবারের মধ্যে পিতাই হইলেন

পরিবারের কর্ত্তা। পিতার অবর্ত্তমানে পরিবারের মধ্যে যিনি জ্যেষ্ঠ, তিনিই পিতার স্থান গ্রহণ করেন। এই পিতৃপ্রধান সমাজ-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হইতেছে পরিবারের সমস্ত সমস্যা ও উহাদের সম্পত্তির উপরে পিতার অথবা সর্ব্বজ্যেষ্ঠ পুরুষের পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকে। সমাজ-বিবর্ত্তনের ইতিহাসে ইহার পরের ধাপ হইল কতকগুলি পরিবারের একত্রীকরণে একটি "পরিবার গোষ্ঠী" (ক্লান) স্থাপন ও ক্রমে ক্রমে কতকগুলি পরিবারগোষ্ঠী একত্র হইয়া একটি "জাতিগোষ্ঠী" (ট্রাইব) গঠিত হইল। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর বিস্তারের মধ্য দিয়া রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইল। রাষ্ট্রোৎপত্তির এই মতবাদের নাম দেওয়া হইযাছে "পিতৃপ্রধান সমাজ-ব্যবস্থা মতবাদ" (পেট্রিয়ার্কাল্ থিওরি)।

বর্ত্তমানে এই মতবাদকে আর পূর্ণভাবে গ্রহণ করা হয় না। কারণ, নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন যে, রাষ্ট্রের উৎপত্তি একমাত্র পুরুষপ্রধান পরিবারের বিস্তৃতিসাধনের মধ্য দিয়া হয় নাই। প্রাচীন ইতিহাসে এরূপ বহু নজীব মিলে যে, অনেক দেশে মাতাই পরিবারের কর্ত্তা ছিলেন।

(খ) এই মতবাদ অনুসারে বলা হয় যে, পরিবারই মানুষের প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান নয়। [illegible]কালে মানুষ ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া বাস করিত। প্রত্যেক দলের বা গোষ্ঠীর সদস্যেরা তাহাদের পরস্পরের সম্পর্ক মাতার দিক হইতে নির্দ্দিষ্ট করিত, পিতার দিক হইতে নয়। মাতার দিক্ হইতে সম্পর্ক ধরা হইত বলিযা এই মতবাদকে "মাতৃপ্রধান সমাজ-ব্যবস্থা মতবাদ" (মেট্রিয়ার্কাল্ থিওরি) বলে।

কিন্তু অনেকেই এই মতবাদকে গ্রহণ করে না। তাহার কারণ খুবই সহজ : এই মাতৃপ্রধান সমাজ-ব্যবস্থা পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল না।

Q. 3. *Explain what you understand by the Organic Theory of the State.*

"The State is a living organised unity, not a lifeless instrument."—Discuss this statement. (C. U. 1940, 1946)

উঃ। এই মতবাদে রাষ্ট্রকে মানবদেহের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। মানুষের দেহ যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবকোষ লইয়া গঠিত, তেমনি অনেকগুলি ব্যক্তির সমন্বয়ে রাষ্ট্রের গঠন হইয়াছে। মানবদেহে প্রত্যেকটি জীবকোষের বিশিষ্ট কার্য্য আছে ও জীবকোষগুলির কার্য্যের সমন্বয়ের উপরেই জীবন নির্ভর করে। যে কোন একটি জীবকোষের মৃত্যু হইতে পারে। কিন্তু তাহাতে দেহের গঠন বাধা পায় না। রাষ্ট্রের মধ্যেও প্রত্যেক নাগরিকের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য আছে এবং ইহাদের প্রত্যেকের কার্য্যের সমন্বয়ের মধ্য দিযা রাষ্ট্রের সম্যক্ বিকাশ পায। যে কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইতে পারে, কিন্তু সমষ্টির যে রাষ্ট্র, তাহার মৃত্যু নাই। আদিম জীবের গঠন অতি সরল ছিল। বিবর্ত্তন যত বেশীদূর অগ্রসর হইতেছে ততই জীবদেহের গঠনে ক্রমেই জটিলতা দেখা দিতেছে। আদিম যুগের রাষ্ট্রের গঠনও অতি সরল ছিল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে রাষ্ট্রের কাজ বাড়িতেছে ও সঙ্গে সঙ্গে গভর্ণমেণ্টের গঠন-প্রণালীও জটিল হইতেছে। রাষ্ট্রের বৃদ্ধি ঠিক মানবদেহের বৃদ্ধির মতই হইয়াছে। এই মতবাদ হইতে এ কথা অতি সহজেই অনুমেয় যে, ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক জীবকোষের সহিত দেহের সম্পর্কের [illegible] ঘনিষ্ঠ। একে অন্যকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। মানুষও জীবকোষের মতই রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল।

এই মতবাদও অতি প্রাচীন। আদিমকালের বহু লেখকই রাষ্ট্র ও মানবদেহের সাদৃশ্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এই মতবাদের সবচেয়ে আগ্রহশীল প্রচারক ছিলেন **ব্লাণ্টস্লি** ও **হারবার্ট স্পেন্‌সার**। রাষ্ট্র ও জীবদেহের মধ্যে অনেক বিষয়ের সাদৃশ্য আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাদের মধ্যে বহু পার্থক্যও আছে। রাষ্ট্রের উপাদান ব্যক্তি ও মানবদেহের উপাদান জীবকোষের মধ্যে অনেক প্রভেদ আছে। প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব সত্তা আছে, যাহার দ্বারা সে তাহার জীবনকে পরিচালিত করিতে পারে। কিন্তু জীবকোষের কোন নিজস্ব চেতনাবোধ নাই। তাহাদের না

আছে কোন নিজস্ব ইচ্ছা, না আছে নিজস্ব জীবন। দ্বিতীয়তঃ, জীবদেহের বিভিন্ন কোষগুলির জীবন জীবদেহের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। কোন একটি কোষকে দেহ হইতে কাটিয়া ফেলিলে কোষটির মৃত্যু হইবে। কিন্তু কোন ব্যক্তি রাষ্ট্র হইতে বিক্ষিপ্ত হইলেও বাঁচিয়া থাকিতে পারে। সুতরাং এই মতবাদকে বর্ত্তমানে আর কেহ গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে করেন না।

Q. **4.** *"The State is neither a divine institution, nor a deliberate human contrivance ; it has come into existence as the result of natural evolution".—Discuss the statement, and indicate the processes by which the State has come into existence.* (C. U. 1944)

"We should regard the modern State as the outcome of a gradual process of evolution."—Amplify this statement.

Write a note on the theory of evolution as an explanation of the origin of the State. (C. U. 1956)

উঃ। আদিম[illegible] অনেক লেখকের মত ছিল যে, রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা বিধাতার দ্বারা হইয়াছে। কিন্তু এ মতবাদ যে সত্য নয় তাহা আমরা জানি। বিধাতা রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করেন নাই ; মানুষ নিজের প্রয়োজনে তাহা গড়িয়া তুলিয়াছে। কিন্তু একথাও ঠিক নহে যে, জনসাধারণ একটি চুক্তি স্বাক্ষর করিয়া রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। রাষ্ট্রচুক্তিমতবাদে কোন ঐতিহাসিক সত্য নাই এবং ইহা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। মানুষ সামাজিক জীব এবং সে কখনও সমাজ ছাড়া বাস করে নাই। সমাজে বাস করিবার এই আকাঙ্ক্ষার মধ্য দিয়াই স্বাভাবিকভাবে রাষ্ট্রের জন্ম হইয়াছে। রাষ্ট্রের উৎপত্তি কোন একটি বিশেষ কারণসম্ভূত নয়। নদীর মত বহু উৎসের মিলনের ফলে, বহু ঘটনা-সংঘাতের মধ্য দিয়া রাষ্ট্রের প্রকাশ হইয়াছে।, সমাজ-বিবর্ত্তনের বহু ধাপ পার হইয়া, রাষ্ট্র একদিন বর্ত্তমানের রূপ ধারণ করিয়াছে।

সমাজবদ্ধভাবে বাস করা মানুষের সহজাত প্রকৃতি। মানুষ নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করিতে ভালবাসে না। এই সহজাত সমাজবোধ হইতে আদিম সমাজ-ব্যবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। পারিবারিক বন্ধন এবং ধর্ম্মবিশ্বাস এই দু'টি জিনিস আদিম সমাজ-ব্যবস্থায় জনসাধারণের মধ্যে একটি ঐক্যবোধ এবং সমাজের প্রতি আনুগত্যবোধ আনিয়া দিয়াছিল। ক্রমে ক্রমে শৃঙ্খলারক্ষার প্রয়োজনে নানাপ্রকার প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হইল। সমাজের ক্রমবিবর্ত্তন কিন্তু এইখানেই বন্ধ হইয়া রহিল না। সাধারণের মধ্যে যাহারা নেতৃস্থানীয়, তাহাদের মধ্যে একটি রাজনৈতিক চেতনাবোধ ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিল। ক্রমে এই চেতনাবোধ সাধারণের মধ্যেও ছড়াইয়া পড়িল। এইভাবে গভর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠা এবং রাষ্ট্রের জন্ম হইল।

সুতরাং দেখা যায় যে, রাষ্ট্রগঠনের পথে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রত্যেকেরই অবদান আছে—আত্মীয়তার বন্ধন, ধর্ম্ম, শৃঙ্খলা এবং সাধারণের অধিকার-রক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং রাজনৈতিক চেতনাবোধ। (১) রাষ্ট্রগঠনে আত্মীয়তাবন্ধন-বোধ অনেকখানি সহায়তা করিয়াছে। আদিম সমাজ-ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপেই পরিবারের [illegible] রক্তসম্পর্কের উপরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। একই পিতার অথবা একই মাতার বংশ হইতে পরিবারের কিংবা গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। পরিবারবৃদ্ধির মধ্য দিয়া পরিবারগোষ্ঠী (ক্লান) প্রতিষ্ঠিত হইল। পরিবারগোষ্ঠীর মধ্য দিয়া ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী (ট্রাইব) এবং গ্রামাসম্প্রদায় ও রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হইল। (২) প্রাচীনকালে ধর্ম্মের বিশেষ প্রভাব ছিল। ধর্ম্মই জনসাধারণের মধ্যে ভক্তি এবং আনুগত্যবোধ আনিয়া দিয়াছিল। শাসকের কর্ত্তৃত্বকে মানিয়া লওয়া ছিল ধর্ম্মের অনুশাসন। বিধাতা যে প্রাচীন আইনগুলির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এ বিশ্বাস জনসাধারণের মনে ছিল এবং এই বিশ্বাসের প্রাচীন আইন ও অনুশাসনগুলির প্রতি তাহাদের স্বতঃস্ফূর্ত্ত সম্মতিও ছিল। (৩) সকলের জীবন ও অধিকার-রক্ষার জন্য ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা, আদিম

সমাজেই অনুভূত হইয়াছিল। জনসাধারণের ধনসম্পদ্-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সাধারণের নিরাপত্তা-রক্ষার ব্যবস্থার প্রয়োজন হইয়াছিল। এই প্রয়োজনানুভূতির মধ্য দিয়া একটি রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা হইল। (৪) রাজনৈতিক চেতনাবোধ সকলের পরে দেখা দিল। প্রথমেই এই চেতনাবোধ নেতৃস্থানীয় অল্প কয়েকজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তারপরে ধীরে ধীরে তাহা জনসাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িল। একটি শাসনযন্ত্র স্থাপনের মধ্য দিয়া ইহার পরিপূর্ণ প্রকাশ হইল।

এইভাবে আত্মীয়তাবন্ধন, পশুশক্তি, ধর্ম্ম, অর্থনৈতিক প্রয়োজন, প্রভৃতি অনেক উপাদানের মিলনের ফলে রাষ্ট্রের গঠন হইয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়

রাষ্ট্র

Q. 1. *Define State.* (C. U. 1931, 1937, 1943, 1945, 1951, 1952, 1953 ;

What are the essential charateristics of a State ?

"A State is a people organised for law within a definite territory." Explain fully. (C. U. 1947)

উঃ। কোন জনসমষ্টি যখন স্বাধীনভাবে নিজস্ব গভর্ণমেণ্টের শাসনাধীনে একটি নির্দ্দিষ্ট ভূখণ্ডে বাস করে, তখন সেই দেশকে রাষ্ট্র বলা হয়। প্রসিদ্ধ আমেরিকান লেখক অধ্যাপক গার্নারের মতে রাষ্ট্র হইতেছে একটি জনসমষ্টি, যাহারা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে অধিকাংশের মনোনীত গভর্ণমেণ্টের অধীনে

স্থায়িভাবে একটি নির্দ্দিষ্ট ভূখণ্ডে বাস করে। সুতরাং রাষ্ট্রের মধ্যে চারিটি উপাদান আছে—জনসমষ্টি, নির্দ্দিষ্ট ভূখণ্ড, গভর্ণমেণ্ট ও সার্ব্বভৌমশক্তি।

(১) **জনসমষ্টি**—জনসমষ্টি লইয়াই রাষ্ট্রের গঠন। এই জনসংখ্যা অল্প হইতে পারে, বৃহৎও হইতে পারে।

(২) **নির্দ্দিষ্ট অঞ্চল**—যে জনসমষ্টি রাষ্ট্রগঠন করিবে তাহাদের স্থায়িভাবে কোন নির্দ্দিষ্ট অঞ্চলে বাস করিতে হইবে। যাযাবর জাতি লইয়া কখনও রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে না। যখন একদল লোক একটি নির্দ্দিষ্ট অঞ্চলে স্থায়িভাবে বাস করে তখন তাহারা রাষ্ট্রগঠনের পথে অনেকটা অগ্রসর হইযাছে। জনসংখ্যার মত ভূখণ্ডের আযতন বৃহৎও হইতে পারে, আবার ক্ষুদ্রও হইতে পারে। একদিকে আমেরিকার মত বিরাট, বিস্তৃত ভূখণ্ডের উপর প্রতিষ্ঠিত রাজ্য ও অন্যদিকে গ্রীসের মত ক্ষুদ্র ভূখণ্ড লইযা প্রতিষ্ঠিত রাজ্যও আছে।

(৩) **গভর্ণমেণ্ট**—বহু লোক কোন নির্দ্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্থাযিভাবে বাস করিলেই রাষ্ট্র গড়িয়া উঠে না। তাহাদের মধ্যে শাসনকার্য্য পরিচালনার জন্য একটি সরকার প্রতিষ্ঠিত থাকা প্রয়োজন। রাষ্ট্রের জনসমষ্টির অধিকাংশই এই সরকারের বিধিনিষেধ মানিয়া চলিতে অভ্যস্ত এবং বাধ্য থাকিবে।

(৪) **সার্ব্বভৌমশক্তি (Sovereignty)**—শুধু সরকার থাকিলেই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় না। সেই দেশের লোকের সার্ব্বভৌমশক্তি বা পূর্ণ-স্বাধীনতা থাকা প্রয়োজন। সেই দেশ সর্ব্বপ্রকারে পরাধীনতার বন্ধন হইতে মুক্ত থাকিবে এবং দেশের ভিতরে সর্ব্বসাধারণ ও সর্ব্বপ্রতিষ্ঠানের উপর রাজশক্তির পূর্ণ-কর্তৃত্ব বজায় থাকিবে। এই সার্ব্বভৌমশক্তি ছাড়া কোন রাষ্ট্রেরই গঠন হইতে পারে না। যে দেশ স্বাধীন নয়, তাহাকে রাষ্ট্র বলা হয় না।

এই চারিটি উপাদান লইয়া যে রাজ্য গঠিত, তাহাকে রাষ্ট্র বলা হয়।

Q. 2. *Are India, the States of India and the British Dominions States ?* (C. U. 1943)

Is the State of New York a State ? (C. U. 1951)

Is the State of West Bengal a State ? (B. U. 1962)

Are the following States ? A College Union, The United Nations ? (B. U. 1962)

উঃ। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্টের পূর্ব্বে ভারতবর্ষকে রাষ্ট্ররূপে গণ্য করা হইত না। তাহার কারণও সুস্পষ্ট। ভারত ছিল বৃটিশ-শাসিত দেশ, তাহার কোন স্বাধীনতা ছিল না। কিন্তু ১৫ই আগস্টের পর ভারতের সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব স্বীকৃত রহিয়াছে। ভারতে বৃহৎ জনসমষ্টি, বিস্তৃত ভূখণ্ড এবং সুপ্রতিষ্ঠিত গভর্ণমেণ্ট আছে। ভারতবর্ষ এখন সম্পূর্ণ স্বাধীন। সুতরাং বর্ত্তমানে ভারতবর্ষকে রাষ্ট্র বলিয়া গণ্য করা হয়।

এ দেশের ভূতপূর্ব্ব সামন্ত রাজ্যগুলি কিন্তু কোন কালেই রাষ্ট্রের পর্য্যায়ে পড়িত না। বাহ্যিক দিক দিয়া এবং বহুল পরিমাণে আভ্যন্তরিক দিক দিয়া, তাহাদের উপরে ভারত-সরকারের কর্ত্তৃত্ব চিরকালই প্রতিষ্ঠিত ছিল। সমস্ত দেশীয় রাজ্যগুলিই এখন ভারত ও পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত।

পশ্চিমবঙ্গকেও রাষ্ট্র বলা চলে না। কারণ পশ্চিমবঙ্গ ভারত রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত অংশ। পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রের তিনটি লক্ষণ বর্ত্তমান আছে, যথা জনসমষ্টি, ভূখণ্ড ও গভর্ণমেণ্ট। ইহার নিজের সার্ব্বভৌম ক্ষমতা নাই। সুতরাং ইহাকে রাষ্ট্র বলে না।

বৃটিশ ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলগুলি, যেমন ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, ও নিউজিল্যাণ্ড, কার্য্যতঃ সার্ব্বভৌমত্ব রাষ্ট্র হিসাবে পরিগণিত হয়। "বৃটিশ ক্রাউনের" সহিত ইহাদের নামেমাত্র একটি সম্পর্ক আছে বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ আভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক, উভয় দিক দিয়াই ইহারা সম্পূর্ণ স্বাধীন।

রাষ্ট্রের সমস্ত উপাদান—যেমন জনসমষ্টি, নির্দ্দিষ্ট ভূখণ্ড, শাসনযন্ত্র ও সার্ব্বভৌমশক্তি ইহাদের মধ্যে আছে। সুতরাং ইহাদের রাষ্ট্র বলিয়া গণ্য করা হয়।

সাধারণ কথায় নিউ ইয়র্ককে রাষ্ট্র আখ্যা দেওয়া হয়। যে ৫০টি রাষ্ট্র লইয়া আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র গঠিত, নিউ ইয়র্ক তাহার একটি। নিউ ইয়র্কে বহু লোক একটি নির্দ্দিষ্ট অঞ্চলে বাস করিতেছে এবং তাহাদের একটি গভর্ণমেণ্টও আছে। কিন্তু নিউ ইয়র্কের হস্তে সার্ব্বভৌম ক্ষমতা নাই। সুতরাং তাহাকে রাষ্ট্র আখ্যা দেওয়া চলে না।

কলেজে যে ছাত্রসঙ্ঘ গঠন করা হয় তাহাতে জনসমষ্টি ও কর্ম্মসমিতি (বা সরকার) থাকে। কিন্তু এই সঙ্ঘের কোন সার্ব্বভৌমক্ষমতা নাই এবং ইহা কোন নির্দ্দিষ্ট ভূখণ্ডের সহিত সংশ্লিষ্ট নহে। সুতরাং ইহাকে রাষ্ট্র বলে না।

সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘ (U.N.O.)-এরও জনসমষ্টি ও কর্ম্মসমিতি (অর্থাৎ সিকিউরিটি কাউন্সিল) আছে। কিন্তু ইহারও অধিকার কোন নির্দ্দিষ্ট ভূখণ্ডের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে এবং ইহার সার্ব্বভৌম [illegible] নাই। অন্য রাষ্ট্রেরা ইহার কথা মানিতে বাধ্য নহে। সুতরাং ইহাকে রাষ্ট্র বলে না।

Q. 3. *Distinguish between the State and other associa- tion.* (C. U. 1945)

In what respects does a State differ from an association of students in your college ? (C. U. 1953)

উঃ। রাষ্ট্র একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। কিন্তু ইহা ছাড়া আরও অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠান আছে—যেমন, শ্রমিকসঙ্ঘ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি। রাষ্ট্র ও এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য আছে। রাষ্ট্রের ন্যায় প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের জনসংখ্যা আছে, কার্য্যকরী সমিতি বা গভর্ণমেণ্ট আছে। এই দুইটি বিষয়ে রাষ্ট্রের সঙ্গে ইহাদের মিল নাই। কিন্তু অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলি

সম্পূর্ণরূপে স্বেচ্ছামূলক। কোন ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে ইহাদের সভ্য হওয়া বাধ্যতামূলক নয়। কিন্তু রাষ্ট্রের সভ্যপদ বাধ্যতামূলক। একজন ভারতীয় ভারতীয়-রাষ্ট্রের সভ্য। সাধারণতঃ এই সভ্যপদকে বাতিল করিয়া দিবার ক্ষমতা তাহার নাই। কিন্তু ইচ্ছা না হইলে সে কোন শ্রমিকসঙ্ঘের সভ্য না হইতেও পারে। দ্বিতীয়তঃ, কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে একই সময়ে একাধিক প্রতিষ্ঠানের সভ্য হইতে পারে। কিন্তু সে একই সময়ে একাধিক রাষ্ট্রের সভ্য হইতে পারে না। রাষ্ট্রের আধিপত্য একচ্ছত্র. তৃতীয়তঃ, কোন নির্দ্দিষ্ট ভূখণ্ড লইয়া রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলি কোন নির্দ্দিষ্ট ভূখণ্ডে সীমাবদ্ধ নাও থাকিতে পারে। রাষ্ট্রের কথা যখন আমরা বলি, তখন কোন নির্দ্দিষ্ট ভূখণ্ডের কথাই বলি। কিন্তু যখন কোন প্রতিষ্ঠানের কথা বলি তখন কোন নির্দ্দিষ্ট ভূখণ্ডের কথা ভাবি না। চতুর্থতঃ, রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সাধারণ, কিন্তু অন্য যে-কোন প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য একটি বিশেষ শ্রেণীর। জনগণের সাধারণ মঙ্গলসাধনই রাষ্ট্রের লক্ষ্য; কিন্তু অন্য প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য হইতেছে, তাহাদের সভ্যদের কোন বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যসাধন। সর্ব্বশেষ পার্থক্য হইতেছে যে, রাষ্ট্রের হাতে সার্ব্বভৌম শক্তি আছে। সে দরকার হইলে সভ্যদের প্রাণদণ্ডও দিতে পারে। অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের সার্ব্বভৌম শক্তি নাই। কোন প্রতিষ্ঠান তাহার অবাধ্য সভ্যকে বড়জোর সভ্যপদচ্যুত করিতে পারে; কিন্তু তাহার প্রাণদণ্ডের বিধান করিতে পারে না।

Q. 4. *Define the term government. Distinguish between State and Government.*

উঃ। রাষ্ট্রের কার্য্য পরিচালনার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান থাকা প্রয়োজন। এই প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রের মধ্যে শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার ব্যবস্থা করে, আইন বহাল রাখে ও আইন অমান্যকারীদের শাস্তি দেয়। এই প্রতিষ্ঠানকে সরকার বলা হয় এবং ইহার কাজ শাসনকার্য্য পরিচালনা করা। সরকার রাষ্ট্রগঠনের

একটি প্রধান উপাদান। রাষ্ট্র এবং সরকার এই দুই শব্দ অনেক সময় একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এই দুইটির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে।

যে সকল উপাদান লইয়া রাষ্ট্র গঠন হয়, সরকার তাহাদের অন্যতম। কিন্তু তাই বলিয়া সরকার রাষ্ট্রের সব কিছু নয়। রাষ্ট্রের ইচ্ছা বা আদেশ প্রকাশ হয় সরকারের মধ্য দিয়া। এমন দেশ আছে যাহাদের গভর্ণমেণ্ট আছে, কিন্তু তাহাদের রাষ্ট্র বলিয়া গণ্য করা হয় না। যেমন তিব্বত দেশকে রাষ্ট্র বলা চলে না, কারণ সে দেশ বহিরস্থশাসনমুক্ত নয়। কিন্তু তিব্বত দেশেরও একটি গভর্ণমেণ্ট আছে।

রাষ্ট্র বলিতে আমরা একটি নির্দ্দিষ্ট ভূখণ্ডের সমগ্র জনসমষ্টিকে বুঝি। কিন্তু সরকার গঠিত হয় অল্পসংখ্যক লোক লইয়া, যাহারা শাসনকার্য্যে লিপ্ত আছে। ভারত-রাষ্ট্র বলিতে সমগ্র ভারতের লোককে বুঝায়। কিন্তু মন্ত্রিসভা ও সরকারী কর্ম্মচারী লইয়া ভারত-সরকার গঠিত।

সরকার অস্থায়ী, কিন্তু রাষ্ট্র চিরস্থায়ী। সরকারের পরিবর্ত্তন খুবই স্বাভাবিক। একটি গভর্ণমেণ্টের স্থানে ভিন্ন গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা অনেক সময়েই হইয়া থাকে। কিন্তু রাষ্ট্রের কোন পরিবর্ত্তন নাই। [illegible]কিস্তানে গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের অবসান হইয়া আয়ুবসাহী সরকারের প্রতিষ্ঠা হইল। কিন্তু রাষ্ট্র হিসাবে পাকিস্তান অপরিবর্ত্তিত রহিয়া গেল।

Q. 5. (*a*) *Define Sovereignty. Explain its chief characteristics.* (C. U. 1952); (*b*) *Distinguish between legal and political sovereignty.*

উঃ। (ক) সার্ব্বভৌমশক্তি রাষ্ট্রের একটি বিশিষ্ট উপাদান। নিজ ভূখণ্ডে সমস্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের উপর অবাধ ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার যে অধিকার রাষ্ট্রের হস্তে আছে, তাহারই নাম সার্ব্বভৌমশক্তি। এই শক্তি কি প্রকারের বুঝিতে হইলে ইহার আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক রূপ বিশ্লেষণ করিতে হইবে। দেশের সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের

অধিকার রাষ্ট্রশক্তির আছে। বৈদেশিক নিয়ন্ত্রণ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত অবস্থা রাষ্ট্রের বাহ্যিক সার্ব্বভৌমশক্তির প্রকাশ। নিজরাজ্য মধ্যে ব্যক্তি-দল-নির্ব্বিশেষে সকলের উপর রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধিকারকে সার্ব্বভৌমশক্তি বলে। সার্ব্বভৌমশক্তির নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য আছে :—(১) সার্ব্বভৌম বা সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব। আইন অনুসারে রাজশক্তির কর্ত্তৃত্ব সীমাহীন ; দেশের ভিতর রাষ্ট্রের আদেশ লঙ্ঘন করিবার শক্তি কাহারও নাই। (২) সর্ব্বব্যাপকত্ব। নিজ ভূখণ্ডে প্রত্যেকটি নাগরিক ও প্রতিষ্ঠানের উপর এই শক্তির সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব রহিয়াছে। (৩) অখণ্ডত্ব। একটি রাষ্ট্রে কেবল একটিমাত্র সার্ব্বভৌমশক্তি থাকিতে পারে। এই শক্তির খণ্ড খণ্ড প্রকাশ হইতে পারে না। (৪) অপরিবর্ত্তনীয়তা। কোন মানুষের পক্ষে যেমন নিজের জীবন হস্তান্তর করা সম্ভব নয়, তেমনি রাষ্ট্রের পক্ষে রাজশক্তি হস্তান্তর করাও অসম্ভব। সার্ব্বভৌমশক্তি অন্যত্র চলিয়া যাওয়ার অর্থ রাষ্ট্রের মৃত্যু হওয়া।

সার্ব্বভৌমশক্তিকে অনেক সময় দুই ভাগে বিভক্ত করা হয় যে সার্ব্বভৌমশক্তি আইন-প্রণয়ন ও প্রয়োজন হইলে সর্ব্বপ্রকার দণ্ডবিধান করিতে পারে, তাহাকে "আইনগত সার্ব্বভৌমশক্তি" (Legal Sovereign) বলা হয়। ইংলণ্ডে "King-in-Parliament" অর্থাৎ পার্লামেণ্ট ও রাজা একযোগে এই রাজশক্তির অধিকারী

রাষ্ট্রে, যে ব্যক্তিসমষ্টির ইচ্ছাই শেষ পর্য্যন্ত কার্য্যকরী হয়, তাহাকে সেই রাষ্ট্রের "রাজনৈতিক সার্ব্বভৌমশক্তি" (Political Sovereign) বলা হয়। এই নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিসমষ্টির হস্তে আইন প্রণয়নের অধিকার না থাকিলেও আইনগত রাজশক্তি ইহার নির্দ্দেশকেই আইনে পরিণত করিতে বাধ্য ইংলণ্ডে সমস্ত ভোটদাতা সমষ্টিগতভাবে এই রাজনৈতিক শক্তির অধিকারী এবং পার্লামেণ্ট এই রাজশক্তির নির্দ্দেশ মানিয়া চলিতে বাধ্য।

চতুর্থ অধ্যায়

রাষ্ট্রের বিভিন্ন রূপ

Q. 1. *What are the different forms of State ?* (C. U. 1936)

উঃ। রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগ অনেক দিন হইতে করা হইয়াছে। রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের জনক গ্রীক-পণ্ডিত আরিষ্টটল যে শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন, তাহাতে যে নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিসমষ্টির হস্তে রাষ্ট্রের রাজশক্তি বর্ত্তমান তাহাদের সংখ্যা এবং রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য কি এই দুইটি বিষয়ে দেখা হইয়াছে। যখন রাষ্ট্রের সর্ব্বময় কর্তৃত্ব একজনের হস্তে ন্যস্ত থাকে তখন তাহাকে রাজতন্ত্র (Monarchy); যেখানে কতিপয় ব্যক্তির হস্তে থাকে, তাহাকে অভিজাততন্ত্র (Aristocracy); আবার যেখানে এই রাজশক্তি বহুর হস্তে ন্যস্ত থাকে, তাহাকে জনতন্ত্র (Polity) বলা হয়। এই রাষ্ট্রগুলিকে তিনি 'স্বাভাবিক' রাষ্ট্র বলিয়া আখ্যা দিযাছেন। এই শ্রেণীর রাষ্ট্রের লক্ষ্য হইতেছে সাধারণের উন্নতি করা। আবার কতকগুলি রাষ্ট্র কেবলমাত্র শা[illegible]র স্বার্থসিদ্ধির জন্য পরিচালনা করা হয়। এই রাষ্ট্রগুলিকে তিনি 'অস্বাভাবিক বা মন্দ রাষ্ট্র' আখ্যা দিয়াছেন। রাজশক্তি যখন কোন ব্যক্তিবিশেষের হস্তে থাকে এবং সেই ব্যক্তি কেবল নিজের স্বার্থে রাজ্য পরিচালনা করে, তখন সেই রাষ্ট্রকে স্বেচ্ছাচারতন্ত্র (Tyranny) বলা হয়। আবার যখন কতিপয় ব্যক্তি রাজশক্তির অধিকারী হইযা কেবল নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করে, সেই রাষ্ট্রকে বলা হয় ধনিকতন্ত্র (Oligarchy)। রাজশক্তি বহুর হস্তে ন্যস্ত থাকিয়া যদি কেবলমাত্র বহুর স্বার্থে পরিচালিত হয়, সেই রাষ্ট্রকে গণতন্ত্র (Democracy) বলা হয।

বর্ত্তমানে কিন্তু এই ধরণের রাষ্ট্রবিভাগ সকলে অনুমোদন করে না। বর্ত্তমান রাষ্ট্র অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 'মিশ্র রাষ্ট্র'। ইংলণ্ডে রাষ্ট্রের সর্ব্বাধিনায়ক

হিসাবে একজন রাণী আছেন, কিন্তু সেখানে গণতন্ত্র বিদ্যমান আছে। আরিষ্টটলের মতে গণতন্ত্র হইতেছে রাষ্ট্রের সর্ব্বাপেক্ষা নিন্দনীয় রূপ। আমাদের মতে গণতন্ত্রই রাষ্ট্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ।

বর্ত্তমানকালের লেখকেরা রাষ্ট্রকে দুইটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন ; স্বৈরাচারতন্ত্র ও গণতন্ত্র। স্বৈরাচারতন্ত্রে রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা ব্যক্তিবিশেষের হস্তে ন্যস্ত থাকে। এই ব্যক্তি নিজের খুশীমত রাজ্য পরিচালনা করে। ১৯৩৩ সাল হইতে ১৯৪৫ সাল পর্য্যন্ত জার্ম্মানীকে এই ধরণের রাষ্ট্র বলা হইত। বর্ত্তমানে স্পেন এবং আফগানিস্তান এইরূপ রাষ্ট্রের উদাহরণ।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব সমষ্টিগতভাবে জনসাধারণের হস্তে ন্যস্ত। ইংলণ্ড, আমেরিকা ও ভারতবর্ষকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলা হয়। গণতন্ত্রের মধ্যেও আবার বিভিন্ন শ্রেণীবিভেদ রহিয়াছে। কোন কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজা আছে, আবার কোথাও বা রাজা নাই। ইংলণ্ডের রাজারা বংশপরম্পরায় ঐ দেশে রাজত্ব করিতেছেন। কিন্তু তাঁহারা নামে মাত্রই রাজা। সর্ব্ববিষয়েই তাঁহারা মন্ত্রীদের কথামত কাজ করেন। এইরূপ রাষ্ট্রকে সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্র (Limited Monarchy) বলা হয়। আবার আমেরিকায় কোন রাজা নাই। সেখানকার রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের কর্ত্তা এবং তিনি জনগণের ভোটে নির্ব্বাচিত। এই সমস্ত রাষ্ট্রকে বলা হয় সাধারণতন্ত্র (Republic)।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির মধ্যে আর এক ধরণের শ্রেণীবিভেদ রহিয়াছে। ইহাদের কতকগুলি 'ঐকিক রাষ্ট্র', আবার কতকগুলি 'যুক্তরাষ্ট্র'। ঐকিক রাষ্ট্রে শাসনের সর্ব্বক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকার ও আইনসভার উপর ন্যস্ত থাকে। ইংলণ্ড এই রকমের একটি ঐকিক রাষ্ট্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন। যুক্তরাষ্ট্রে কোন একটি গভর্ণমেণ্টের হস্তে সকল ক্ষমতা দেওয়া নাই। সেখানে স্ব-স্ব-প্রধান অনেকগুলি গভর্ণমেণ্ট আছে ও প্রত্যেকে নিজ গণ্ডীর মধ্যে শাসনকার্য্য

পরিচালনা করে। সুইট্‌জারল্যাণ্ড, আমেরিকা, ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান এইরূপ যুক্তরাষ্ট্রের নিদর্শন।

আবার এই দুই রকমের গণতন্ত্রে, হয় ইংলণ্ডের মত পার্লামেন্টারী ব্যবস্থা নতুবা আমেরিকার মত প্রেসিডেন্সিয়াল ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। পার্লামেণ্টারী ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের পরিচালকবর্গ (Executive) অর্থাৎ মন্ত্রিসভা (The Cabinet) আইনসভার (Legislature) সভ্যদের মধ্য হইতে নিযুক্ত হন ও আইনসভার নিকট দায়ী থাকেন। ইংলণ্ড, ভারতবর্ষ এবং অন্যান্য ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলগুলি এইরূপ পার্লামেণ্টারী শাসন-ব্যবস্থায় চলে। প্রেসিডেন্সিয়াল শাসন-ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের পরিচালক কিংবা পরিচালকবর্গ জনসাধারণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত এবং তাঁহারা আইনসভার নিকট দায়ী নহেন। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে শাসন-ব্যবস্থা এই দ্বিতীয় উপায়ে হইয়া থাকে।

আরিষ্টটলের শ্রেণীবিভাগ

	স্বাভাবিক (সকলের স্বার্থে)	অস্বাভাবিক (শাসকশ্রেণীর স্বার্থে)
সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব এক ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত	রাজতন্ত্র	স্বৈরাচারতন্ত্র
„ „ কতিপয় ব্যক্তির „ „	অভিজাততন্ত্র	ধনিকতন্ত্র
„ „ বহু ব্যক্তির „ „	জনতন্ত্র	গণতন্ত্র
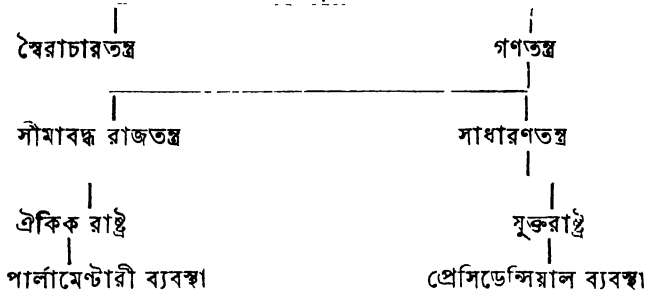
Q. 2. *Discuss the merits and demerits of Monarchy.*

উঃ। রাষ্ট্রের সার্ব্বভৌম ক্ষমতা যখন রাজার হস্তে ন্যস্ত থাকে, সেই রাষ্ট্রকে রাজতন্ত্র বলা হয়। রাজতন্ত্র দুই শ্রেণীর হইতে পারে। স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্র ও সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্র। প্রথম শ্রেণীর রাজতন্ত্রে রাজার হস্তে অসীম ক্ষমতা থাকে। তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেহ কিছু করিতে পারে না। দ্বিতীয় শ্রেণীর রাজতন্ত্রে রাজা নামেমাত্র রাজ্যের চালক থাকেন। আসল ক্ষমতা জনসাধারণের হাতেই থাকে।

স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্রের অনেক গুণ আছে: (১) শাসন-সংক্রান্ত কার্য্য অতি দ্রুত পরিচালিত হয়। দ্বিতীয় কোন ব্যক্তির সঙ্গে আলোচনা করার প্রয়োজন থাকে না বলিয়া রাজকার্য্যে সাধারণতঃ দেরী হয় না। (২) রাজা যদি ভাল হন তবে গভর্ণমেণ্টের কাজ খুব দক্ষতার সঙ্গে পরিচালিত হইবে এবং দেশের অনেক উন্নতি হইতে পারে। কিন্তু এই ব্যবস্থার বহু দোষ আছে: (১) রাজা যে সদাশয় বা ভাল হইবেন তাহার কোন ভরসা নাই। রাজা খারাপ ও স্বার্থপর হইতে পারেন,—তাহাতে দেশের বহু ক্ষতি হইবে। (২) অত্যাচারী রাজা জনসাধারণের উপর নানারূপ উপদ্রব করিতে পারেন। (৩) শাসন-কার্য্যে জনসাধারণের কোন অংশ নাই বলিয়া তাহাদের রাজনৈতিক শিক্ষা

পাওয়ার কোন সুযোগ থাকে না। (৪) নিজের দেশকে তখন কেউ আর ভালবাসে না। রাজতন্ত্রে কেবল রাজাই নিজে একমাত্র দেশপ্রেমিক।

Q. 3. ***Discuss the merits and demerits of Aristocracy.***

উঃ। রাষ্ট্রের প্রধান ক্ষমতা যদি কয়েকজন লোকের হাতে ন্যস্ত থাকে, তখন তাহাকে অভিজাততন্ত্র বলা হয়। ইহাকে গ্রীক দেশের লোকেরা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শাসনতন্ত্র বলিয়া মনে করিত। এই ধরণের রাষ্ট্রের সরকার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের লইয়া গঠিত। সুতরাং ইহার কার্য্যক্ষমতা সবচেয়ে বেশী হওয়া উচিত। কিন্তু ইহার প্রচুর দোষ আছে : (১) শাসন করিবার পক্ষে কে শ্রেষ্ঠ লোক তাহা বাছিয়া লওয়া সব সময়ে সম্ভব নয়। অযোগ্য লোকের হস্তে ক্ষমতা গেলে দেশের ক্ষতি হইবে। (২) সাধারণ লোকের শাসনকার্য্যে কোন অংশ থাকে না, সেইজন্য জনসাধারণের রাজনৈতিক কোন শিক্ষা হয় না। (৩) প্রায়ই ইহা ধনিকতন্ত্রে পরিণত হয়। অভিজাত শ্রেণীর শাসকেরা প্রায়ই নিম্ন শ্রেণীদের সহিত কঠোর ও নির্দ্দয় ব্যবহার করেন।

Q. 4. *Define Democracy. What are the different forms of Democracy ?* (C. U. 1927, '35, '43, '55, [illegible] 1942)

Which type do you prefer, and why ? (P. U. 1961)

উঃ। 'গণ' শব্দের অর্থ 'সাধারণ'। গণতন্ত্রের অর্থ হইল জনসাধারণের শাসনতন্ত্র : যখন শাসন-ব্যবস্থার সকল ক্ষমতা জনসাধারণের হস্তে থাকে, তখন তাহাকে গণতন্ত্র বলা হয়। গণতন্ত্রে দেশের প্রাপ্তবয়স্ক সকল লোক প্রত্যক্ষভাবে অথবা পরোক্ষে নির্ব্বাচনে অংশ গ্রহণ করে এবং তাহাদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের দিয়া গভর্ণমেণ্ট চালান হয়। যুক্তরাষ্ট্রের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি লিঙ্কন বলিতেন যে, জনসাধারণকে লইয়া, জনসাধারণ দিয়া এবং জনসাধারণের জন্যই যে শাসন-ব্যবস্থা তাহাকেই গণতন্ত্র বলা হয়।

সাধারণতঃ গণতন্ত্রকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। প্রত্যক্ষ, এবং পরোক্ষ অথবা নির্ব্বাচিত গণতন্ত্র। প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে দেশের সমস্ত নাগরিক একত্র

হইয়া আইন পাশ করে এবং শাসনকার্য্য পরিচালনা করে। প্রাচীন গ্রীসের ছোট ছোট নগররাষ্ট্রগুলিতে এই ধরণের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল। এখনও সুইট্জারল্যাণ্ডের কয়েকটি ক্যাণ্টন বা ক্ষুদ্র বিভাগে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র চলিত আছে। রাষ্ট্রগুলি যদি আকারে ছোট হয় এবং নাগরিকের সংখ্যা খুব অল্প হয়, তবেই এই ধরণের গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়। আধুনিক রাষ্ট্রগুলিতে এত বেশী লোক বাস করে যে, সেখানে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র চলে না।

পরোক্ষ বা নির্ব্বাচিত গণতন্ত্রে সাধারণ লোকের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি-মণ্ডলীর দ্বারাই আইন-কানুন তৈযারী হয় ও শাসনকার্য্য পরিচালিত হয়। নির্দ্ধারিত সময়ে সেই দেশের লোক কয়েকজন প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করে। এই সমস্ত প্রতিনিধি লইযা আইনসভার প্রতিষ্ঠা হয়। কোন কোন দেশে রাষ্ট্রপতিও জনসাধারণের ভোটে নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। সেইজন্য ইহাকে নির্ব্বাচিত গণতন্ত্র বলা হয়। আজকাল সকল গণতন্ত্রই এই শ্রেণীর।

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ গণতন্ত্রের মধ্যে দ্বিতীয়টিকে সকলে পছন্দ করে। ইহার নানা কারণ আছে। প্রথমতঃ, প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র যতই ভাল হউক না কেন দেশের আয়তন ও জনসংখ্যা বেশী হইলে ইহা কার্য্যকরী হইবে না। দেশ যদি খুব ছোট ও লোকসংখ্যাও কম হয়, তবেই সকল লোকে একত্র সভা করিযা নিজেরাই দেশের শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতে পারে। বর্ত্তমানে এইরূপ ছোট দেশ নাই। যেখানে জনসংখ্যা বেশী সেখানে অত লোকের পক্ষে একত্র সভা করিয়া কোন কাজ করা সম্ভব নহে। দ্বিতীয়তঃ, সাধারণ লোকের রাজ্যশাসন-সম্বন্ধে বিশেষ কোন জ্ঞান নাই। রাজ্যশাসনকার্য্য বিশেষভাবে দক্ষ লোক দ্বারা পরিচালিত হইলেই দেশের মঙ্গল হয়। সুতরাং প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র অপেক্ষা পরোক্ষ গণতন্ত্র বাঞ্ছনীয় সন্দেহ নাই।

Q. 5. *(i) Discuss the merits and demerits of Democracy'* **(C. U. 1928, '33, '34, '37, '41 ; U. P. 1939) ;** *"Good govern-*

ment is no acceptable substitute for self-government."—*Discuss.*

Discuss the advantages and disadvantages of representative government. (C. U. 1950, '52)

(*ii*) *Do you prefer democracy or dictatorship and why?*

উঃ। (১) গণতন্ত্র আজকাল আদর্শ হিসাবে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শাসনতন্ত্র বলিয়া গণ্য হয়। ইহা যে একনায়কতন্ত্র হইতে বাঞ্ছনীয় তাহা নিম্নলিখিত কারণ হইতে জানা যায়।

গণতন্ত্রের গুণঃ—(ক) প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রে গভর্ণমেণ্টকে সব সময়েই সকল কার্য্যের জন্য জনসাধারণের নিকট জবাবদিহি করিতে হয়। সেইজন্য গভর্ণমেণ্ট অত্যাচারী হইতে পারে না। জনসাধারণের গভর্ণমেণ্ট বলিয়া জনসাধারণের মঙ্গলবিধান করাই ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য। একমাত্র গণতন্ত্রেই সাধারণ লোকের অবস্থার উন্নতি হওয়া সম্ভব।

(খ) গণতন্ত্রে সাধারণ লোক শাসনকার্য্যে যোগ [illegible] সাধারণ লোককে দেশের অবস্থা ও সমস্যা সম্বন্ধে চিন্তা করিতে হয়। ফলে, লোকের রাজনৈতিক শিক্ষা বাড়ে, তাহাদের চরিত্র উন্নত হয়। ইংরাজ-পণ্ডিত লর্ড ব্রাইস বলিয়াছেন, "রাজনৈতিক স্বাধীনতায় মানুষের মনুষ্যত্ব সম্মানিত হয়।"

(গ) গভর্ণমেণ্ট আমাদেরই, ইহা মনে করিয়া জনসাধারণের দেশপ্রীতি বাড়িয়া যায়। নিজেরাই আইন তৈয়ারী করে বলিয়া তাহারা আইন বেশী করিয়া মানে।

(ঘ) গণতন্ত্রের ভিত্তি হইতেছে সাম্য। আইনের চক্ষে সব নাগরিকই সমান। কেহ শাসন করিবার জন্য, আর কেহ কেবল শাসিত হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, গণতন্ত্র এ কথা স্বীকার করিতে রাজী নয়। গণতন্ত্রে সকলেরই সমান অধিকার থাকে।

(ঙ) জনসাধারণ জানে যে, তাহারা ইচ্ছা করিলেই গভর্ণমেণ্টের পরিবর্ত্তন করিতে পারে এবং নিজেদের মত অনুযায়ী ব্যবস্থা করিতে পারে। সেইজন্য ইহাতে রাষ্ট্রবিপ্লবের সম্ভাবনা অনেক কম।

(চ) অন্য কোন শাসনব্যবস্থা হইতে গণতন্ত্রেই সকল শ্রেণী ও সকল লোকের অধিকার ও সুবিধাগুলি সবচেয়ে বেশী দেওয়া হয়। ব্যক্তি স্বাধীনতা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, প্রভৃতি মৌলিক অধিকার একমাত্র গণতন্ত্রেই সবচেয়ে বেশী পরিমাণে রক্ষিত হয়। একনায়কতন্ত্রে সাধারণতঃ মত প্রকাশের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করা হয়।

গণতন্ত্রের দোষ :—(ক) বিখ্যাত লেখক লেকি (Lecky) বলিয়াছেন যে, গণতন্ত্র ভাল শাসনতন্ত্র নয় এবং ইহাতে ব্যক্তিস্বাধীনতা অনেক কম থাকিবে। গণতন্ত্রে গভর্ণমেণ্ট জনসাধারণের হাত থাকে। সাধারণ লোক অশিক্ষিত ও নির্বোধ। মূর্খ-পরিচালিত রাষ্ট্র ভাল হইতে পারে না। জনমত অত্যন্ত অসহিষ্ণু। সাধারণ লোক নিজেদের বিরুদ্ধ মতকে বরদাস্ত করিতে পারে না। সুতরাং গণতন্ত্রে ব্যক্তির বা মতপ্রকাশের স্বাধীনতা কমিয়া যাইবার সম্ভাবনাই অধিক।

(খ) গণতন্ত্রে মাথা-গুণতি রায় মানিয়া লইতে হয়। সে মাথার পিছনে বুদ্ধি কতখানি আছে, তাহা দেখা হয় না। গণতন্ত্রে সবাইকে সমান বলিয়া ধরা হয়। বিভিন্ন লোকের ক্ষমতার কোন তফাৎ করা হয় না এবং সবাই সব কাজ পারে, ইহাই গণতন্ত্রের ধারণা। সুতরাং গণতন্ত্রে শাসনতন্ত্র দুর্ব্বল এবং কার্য্যে অপটু হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।

(গ) ইংরাজ লেখক মেইন (Maine) বলেন যে, গণতন্ত্র সংস্কৃতির উন্নতির পথে বিঘ্নস্বরূপ। শিল্পবিজ্ঞান ও সাহিত্যের উন্নতি রাজতন্ত্র কিংবা অভিজাততন্ত্রেই বেশী হইয়াছে। গণতন্ত্রে কম হয়।

(ঘ) গণতন্ত্রে গভর্ণমেণ্টের স্থায়িত্ব নাই। সদা-পরিবর্ত্তনশীল জনমতের সঙ্গে সঙ্গে গভর্ণমেণ্টের নীতি বদল হইতে থাকে।

(ঙ) গণতন্ত্র অপব্যয়ে সাহায্য করে। নিজের টাকা লোকে হিসাব করিয়া খরচ করে, পরের টাকা বা সাধারণের টাকা খরচের বেলায় সকলেই মুক্তহস্ত হয়। সুতরাং গণতন্ত্রে শাসনতন্ত্রের ব্যয় বৃদ্ধি প্রায়।

এই সব দোষ থাকা সত্ত্বেও গণতন্ত্র অন্য যে কোন শাসনতন্ত্র অপেক্ষা সর্ব্বসাধারণের উন্নতিসাধনে বেশী সমর্থ হয়। এই দোষগুলির মূল কারণ হইতেছে জনসাধারণ উপযুক্ত শিক্ষিত নয়। উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা হইলে অনেক দোষ কাটিয়া যাইবে। সব কিছু বিচার করিয়া বলা যায় যে, গণতন্ত্রই নিঃসন্দেহে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম শাসনব্যবস্থা।

(২) কিছুদিন পূর্ব্বে গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে একটা মতবাদ সৃষ্টি হইয়াছিল। এখন অনেকে আর ইহাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শাসনতন্ত্র বলেন না। গণতন্ত্র হইতে একনায়কতন্ত্র নাকি অনেক বেশী কর্ম্মদক্ষতা দেখাইতে পারে। কিন্তু গণতান্ত্রিক ও একনায়ক তান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে যে মহাযুদ্ধ হইয়া গেল, সে যুদ্ধে গণতন্ত্র নিজের যোগ্যতা ও শক্তি প্রমাণ করিয়াছে। একনায়কতন্ত্র কোন সময়ে প্রাধান্য লাভ করিলেও কখনই তাহা শাসনতন্ত্র হিসাবে স্থায়িত্ব লাভ করে নাই। সব দোষ থাকা সত্ত্বেও গণতন্ত্র বাঁচিয়া আছে, তাহার কারণ ইহাতে জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা মূর্ত্ত হইয়া উঠে। সাধারণ মানুষ গণতন্ত্রেই তাহার নিজস্ব সত্তা খুঁজিয়া পায়। অন্য সমস্ত শাসনতন্ত্রে গুণের চেয়ে দোষই বেশী। সেজন্য গণতন্ত্রের পরিবর্ত্তে অন্য কিছুর কথা চিন্তা করা যায় না।

Q. 6. *Discuss the condition for the successful working of democracy or popular government.* (B. U. 1961)

উঃ। গণতন্ত্রের সফলতা নির্ভর করে নাগরিক কর্ত্তব্যগুলি সুষ্ঠুভাবে পালন করার উপর :

(১) যে দেশের নাগরিক সবচেয়ে শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান সে দেশে গণতান্ত্রিক সরকার খুব সাফল্যের সহিত পরিচালিত হইবে। শিক্ষিত ও

বুদ্ধিমান নাগরিক দেশের বিভিন্ন সমস্যা বুঝিতে পারিবে ও ইহার সমাধানও খুঁজিয়া বাহির করিবে।

(২) নাগরিকদের শুধু বুদ্ধিমান্ হইলেই চলিবে না, দেশের জন্য তাহাদের আঘাত সহিতে বা ত্যাগস্বীকারে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। স্বার্থপর হইলে চলিবে না।

(৩) নাগরিকেরা যদি অধিকাংশই অলস প্রকৃতির হয় তবে গণতন্ত্র সফল হইবে না। নিজেদের অধিকার রক্ষার জন্য ও দায়িত্ব পালনের জন্য নাগরিকদের সব সময়ে সজাগ থাকিতে হইবে।

(৪) সাধারণের উন্নতিকল্পে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করা নাগরিকদের অবশ্য কর্তব্য।

গণতন্ত্রের সাফল্য সম্বন্ধে মিল (Mill) তিনটি বিষয়ের উপর জোর দিয়াছেন :

(ক) জনসাধারণ গণতন্ত্র চালু রাখিতে হইলে যাহা করা প্রয়োজন তাহা করিতে ইচ্ছুক ও সমর্থ হইবে। অর্থাৎ গণতন্ত্র চালু করিতে হইলে যাহা প্রে[illegible] করিবার জন্য তাহারা প্রস্তুত আছে।

(খ) দ্বিতীয়তঃ, গণতন্ত্রকে রক্ষার জন্য জনসাধারণকে চেষ্টা করিতে হইবে। জনসাধারণ গণতন্ত্র পছন্দ করিতে পারে, কিন্তু বহিরাক্রমণের সময়ে যদি অলসতা, অসাবধানতা, কাপুরুষতা বা শক্তিহীনতার জন্য ইহাকে রক্ষা না করে, অথবা সাময়িক ভীতি বা মোহের বশে তাহাদের স্বাধীনতাকে কোন ব্যক্তি বিশেষের নিকট বলি দেয়, তাহা হইলে তাহারা গণতন্ত্রের উপযুক্ত নয়। সে দেশে গণতন্ত্র বেশীদিন স্থায়ী হইবে না।

(গ) জনসাধারণ তাহাদের নাগরিক কর্তব্যপালনে ইচ্ছুক থাকিবে।

Q. 7. *Define dictatorship.* (C. U. 1956)

How would you classify modern dictatorship ?

উঃ। এক ব্যক্তির বা একটি দলের শাসনকে আমরা একনায়কতন্ত্র

বলি। 'বর্ত্তমান যুগে সাধারণতঃ একটি দলই রাজ্য শাসন করে এবং সেই দলের নেতাকে রাষ্ট্রনায়ক বলা হয়।

একনায়কতন্ত্র সামরিক, সাম্যবাদী ও ফ্যাসিষ্ট, এই তিন প্রকারের হইতে পারে।

সামরিক একনায়কতন্ত্র সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন। যখন একজন সৈন্যাধ্যক্ষ সমস্ত সৈন্যবাহিনীর বিশ্বাস অর্জন করিয়া দেশ শাসন করে, তখন সেই রাষ্ট্রকে সামরিক একনায়কতন্ত্র বলে। উদাহরণস্বরূপ ক্রমওয়েল ও নেপোলিয়নের শাসনতন্ত্রের নাম করা যাইতে পারে।

সোভিয়েট রাশিয়াতে সাম্যবাদী একনাযকতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত আছে। কোন দলের পরিবর্ত্তে এখানে একটি বিশেষ-শ্রেণী সর্ব্বহারাদের একনাযকত্ব রহিয়াছে। যতদিন পর্য্যন্ত শ্রেণীহীন সমাজের উদ্ভব ও অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত না হয়, শুধু ততদিনের জন্যই এই ব্যবস্থা বহাল থাকিবার কথা। তারপর গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইবে ইহাই সাম্যবাদীদের ধারণা।

ফ্যাসিষ্ট গণতন্ত্র ইটালী ও জার্ম্মানীতে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এখানে একটিমাত্র দলের হস্তে সমস্ত ক্ষমতা ন্যস্ত ছিল। ইটালীতে ফ্যাসিষ্ট দল ও জার্ম্মানীতে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল রাজ্যশাসন করিত।

Q. 8. *What are the aims and objects of Totalitarian States ?*

উঃ। যখন একটি দলের একনাযকত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তাহাকে সামগ্রিক-রাষ্ট্র বলা হয়। এই ধরণের রাজ্যে মাত্র একটি দলকে টিকিতে দেওয়া হয়। অন্য দলগুলিকে জোর করিয়া তুলিয়া দেওয়া হয়। দলের যিনি নেতা তাঁহার হুকুমে সমগ্র রাষ্ট্র পরিচালিত হয়।

এই রাষ্ট্রগুলি অত্যন্ত উগ্র জাতীয়তাবাদী হয়। রাষ্ট্রই পৃথিবীতে সর্ব্বোচ্চ সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান; প্রয়োজন হইলে নাগরিকদের সব কিছুই রাষ্ট্রের জন্য বলি দিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, ফ্যাসিষ্ট দর্শনের মতে

জীবন মানেই যুদ্ধ। সুতরাং জাতিদের জীবনে পরস্পরের মধ্যে ক্ষমতা ও প্রাধান্য লইয়া যুদ্ধ হওয়া স্বাভাবিক। শক্তি ও হিংসা সব কিছুরই ভিত্তি। এই রাষ্ট্রগুলি সবসময়ে শান্তিবাদীদের ঘৃণা করে এবং যুদ্ধের প্রশংসা করে। তৃতীয়তঃ, ইহারা গণতন্ত্রকে দুর্ব্বল, অক্ষম ও অপব্যয়ী বলিয়া উপহাস করে। জার্ম্মানরা মনে করিত আর্য্যরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি। অন্যকে শাসন করিবার জন্যই তাহাদের জন্ম। ইহার সঙ্গে ইহুদী-বিদ্বেষও তাহাদের নীতির একটি অঙ্গ ছিল।

Q. 9. *Distinguish between Democracy and Dictatorship.* (C. U. 1954 ; B. U. 1961 ; P. U. 1961)

উঃ। একনায়কতন্ত্র ও গণতন্ত্রের মধ্যে দুইটি মূলগত পার্থক্য আছে। একনায়কতন্ত্র বাহুবলের পূজারী, অপরদিকে গণতন্ত্র নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির বাহক। দ্বিতীয়তঃ, একনায়কতন্ত্র ব্যক্তি স্বাধীনতার বিরোধী। তাহারা রাষ্ট্রকে সামাজিক জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান মনে করে। নাগরিকেরা পরিপূর্ণভাবে রাষ্ট্রের অধীন। গণতন্ত্র রাষ্ট্রকে জনকল্যাণ-সাধনের একটি উপায় হিসাবে গণ্য করে। ধর্ম্ম, বিজ্ঞান ও শিল্পের স্বাধীনতা এবং কোনপ্রকার ব্যক্তি স্বাধীনতাকেই গণতন্ত্র দমন করে না। শতগুণ-সমন্বিত হইলেও কোন বিশেষ নেতাকে দেবতুল্য মনে করে না। গণতন্ত্র শান্তিকামী এবং যুদ্ধ বা সমস্ত প্রকার শক্তিতন্ত্রের বিরোধী।

Q. 10. *Discuss the merits and defects of Dictatorship.* (C. U. 1956)

Ans. *See answer to Qs. 2 and 5 (ii).*

Q. 11. *What is meant by Federal Government ? Distinguish it from Unitary Government.* (P.U. 1962 ; B.U. 1962)

উঃ। অনেক দেশে একটি কেন্দ্রীয় সরকার ও কয়েকটি আঞ্চলিক সরকার প্রতিষ্ঠিত আছে এবং শাসনের বিষয়গুলিও দুই ভাগে ভাগ করা

থাকে। " কেন্দ্রীয় সরকারের শাসন দেশের সমস্ত অঞ্চলের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং দেশের সমস্ত অঞ্চলের স্বার্থ জড়িত বিষয়গুলির (যেমন দেশরক্ষা, বৈদেশিক নীতি, মুদ্রাব্যবস্থা ইত্যাদি) শাসনভার এই সরকারের হস্তে ন্যস্ত থাকে। দেশটি কয়েকটি অঞ্চলে বিভক্ত এবং প্রত্যেক অঞ্চলেরই একটি আঞ্চলিক সরকার গঠিত থাকে। অঞ্চলের স্বার্থজড়িত বিষয়গুলির শাসনের দায়িত্ব এই সরকারগুলির উপর ন্যস্ত। প্রত্যেক গভর্ণমেণ্টই নিজ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন। একে অন্যের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না, এইরূপ শাসনতন্ত্রকে যুক্তরাষ্ট্র বলে। প্রাদেশিক সরকারের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের কোন নিয়ন্ত্রণাধিকার নাই। সমস্ত দেশের সাধারণ স্বার্থজড়িত বিষয়গুলি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে থাকে। ভারতীয় শাসনতন্ত্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের অধীনে দেশরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক, সংবাদ আদান-প্রদান ব্যবস্থা, প্রভৃতি বিষয়গুলি রহিয়াছে। শিক্ষা, কৃষি, প্রভৃতি প্রাদেশিক স্বার্থসম্পন্ন বিষয়গুলি রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন রহিয়াছে।

প্রচলিত যুক্তরাষ্ট্রকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়ঃ—**আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র-ব্যবস্থা** এবং **কানাডার যুক্তরাষ্ট্র-ব্যবস্থা** প্রথমটিতে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা শাসনতন্ত্রে নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রদত্ত বিষয়গুলি ব্যতীত অন্য সমস্তই আঞ্চলিক বা প্রাদেশিক সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকে। কানাডার যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় প্রাদেশিক সরকারের অধীন বিষয়গুলি শাসনতন্ত্রে উল্লেখ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অন্য সমস্ত বিষয়গুলি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে থাকে।

ঐকিক শাসনতন্ত্রে সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে কেন্দ্রীভূত করা হইয়াছে। দেশের মধ্যে হয়তো প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক গভর্ণমেণ্ট থাকিতে পারে। কিন্তু তাহা সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় কিন্তু কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট একে অপরের অধীনে থাকে না। কেহই অন্যের নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না।

Q. 12. *Discuss the main features af a Federal Government.* (C. U. 1939, '54, '58 ; U. P. 1943)

উঃ। যুক্তরাষ্ট্রে অনেকগুলি ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চল সমবেত হইয়া তাহাদের সাধারণ স্বার্থজড়িত বিষয়গুলির সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থার জন্য একটি কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট স্থাপন করে। প্রত্যেক যুক্তরাষ্ট্রে দুই প্রকারের গভর্ণমেণ্ট বর্ত্তমান: কেন্দ্রীয় বা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার এবং যোগদানকারী অঞ্চলের আঞ্চলিক বা স্থানীয় সরকার। ইহারা প্রত্যেকে নিজ ক্ষেত্রে স্বাধীন। প্রত্যেক যুক্তরাষ্ট্রেই লিখিত শাসনতন্ত্র থাকে। লিখিত শাসনতন্ত্রে এই দুই শ্রেণীর সরকারের শাসনক্ষমতা বিভক্ত করিয়া দেওয়া হয়।

শাসনকার্য্যের বিষয়গুলিকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। একটি অংশে থাকে সমস্ত দেশের স্বার্থজড়িত বিষয়গুলি, যাহাদের শাসনভার যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারকে অর্পণ করা হয়। অপর অংশে থাকে অন্যান্য বিষয় যাহাদের শাসনকার্য্য পরিচালনা করার ভার আঞ্চলিক সরকারগুলিকে দেওয়া হয়। প্রথমোক্ত বিষয়গুলির নাম 'যুক্তরাষ্ট্রীয় বিষয়সমূহ' এবং দ্বিতীয় অংশকে বলা য 'প্রাদে[illegible] স্থানীয় বিষয়সমূহ'।

দুই শ্রেণীর গভর্ণমেণ্ট থাকিবার ফলে তাহাদের মধ্যে বিবাদ হওয়া খুবই স্বাভাবিক। এই বিবাদ মীমাংসা করিবার জন্য প্রত্যেক যুক্তরাষ্ট্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় থাকে। দেশের শাসনতন্ত্রের ভাষ্য করা ও দুই প্রকারের সরকারের মধ্যে সর্ব্বপ্রকার বিবাদের মীমাংসা করা এই বিচারালয়ের প্রধান কাজ।

Q. 13. *Discuss the merits and defects of the Federal form of Government.* (P. U. 1962)

উঃ। গুণাবলীঃ—(১) যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চল নিজেদের সুবিধার জন্য একত্র হইয়া একটি কেন্দ্রীয়-সরকার প্রতিষ্ঠা করে। ফলে তাহারা সমস্ত সাধারণ বিষয়গুলিতে কেন্দ্রীভূত শাসনের সুবিধা ভোগ করে। আবার

স্থানীয় বিষয়গুলিতে স্বায়ত্তশাসনের সুবিধাও লাভ করে। যুক্তরাষ্ট্র গঠন করিয়া ইহারা কেহই নিজের পৃথক সত্তা হারায় না। প্রথম সুবিধা অর্থাৎ সমস্ত অঞ্চলের স্বার্থজড়িত বিষয়গুলিতে কেন্দ্রীভূত শাসনের সুবিধা একক শাসনব্যবস্থাতেও পাওয়া যায়। কিন্তু সেখানে অঞ্চলগুলির নিজেদের কোন বিষয়ে স্বাধীনতা থাকে না। একমাত্র যুক্তরাষ্ট্রেই অঞ্চলগুলির পক্ষে এই দুইটি সুবিধা ভোগ করা সম্ভব হয়।

(২) এই শ্রেণীর রাষ্ট্রে শাসনকার্য্যের দায়িত্ব একটিমাত্র গভর্ণমেণ্টের উপর ন্যস্ত থাকে না। বিভিন্ন সরকারের হস্তে সরকারী কার্য্যাবলী বণ্টন করা থাকে বলিযা শাসনকার্যে্য শ্রমবিভাগের সুবিধা পাওয়া যায়। দেশের সমস্ত অঞ্চলের কাজ যদি একটি মাত্র সরকারকে করিতে হয় তবে তাহার উপর অত্যন্ত বেশী চাপ পড়ে এবং ইহার ফলে সেই সরকার কোন কাজই অথবা অনেক কাজ ঠিকমত করিতে পারে না। যুক্তরাষ্ট্রে দুই শ্রেণীর সরকার থাকে এবং তাহাদের মধ্যে শাসনকার্য্য বিভাগ করিযা দেওয়া হয়। ফলে কোন সরকারের ঘাড়েই বেশী চাপ পড়ে না। কাজেই সকলেই সব কাজ ঠিকমত করিতে পারে।

(৩) দেশের মধ্যে মাত্র একটি গভর্ণমেণ্ট থাকিলে বেশী লোকে শাসন-কার্য্য-পরিচালনার অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারে না। যুক্তরাষ্ট্রে বহু আঞ্চলিক সরকার থাকায় অনেক লোক পৌরকর্ত্তব্য-পালনের শিক্ষা অর্জ্জন করিবার সুযোগ পায়।

দোষাবলীঃ—(১) যুক্তরাষ্ট্রে স্ব-প্রধান দুইটি সরকার আছে। এ ব্যবস্থা যেমন ব্যয়বহুল তেমনি শাসনকার্য্যে নানাপ্রকারের জটিলতা সৃষ্টি করে।

(২) কেন্দ্রীয এবং স্থানীয় সরকারের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টনের ফলে কোন গভর্ণমেণ্টই পূর্ণ ক্ষমতাশালী হইতে পারে না। কোন সরকারের হস্তে সমস্ত বিষয়ের নিযন্ত্রণভার নাই। ফলে উভয়েই দুর্ব্বল হয়। বৈদেশিক

সম্পর্ক এবং আভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থা-পরিচালনায় এই দুর্ব্বলতা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।

(৩) এ ব্যবস্থায় বিভিন্ন আঞ্চলিক গভর্ণমেণ্টের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইয়া অনেক সময়ে যুক্তরাষ্ট্র ভাঙ্গিয়া যাইবার বিপদ আছে।

Q. 14. *"Many political thinkers look upon Federalism as the key to the organisation of World State."—Discuss.* (C. U. 1943)

What, according to you, are the reasons for the present tendency towards Federalism ? (C. U. 1958)

উঃ। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার ক্রটি আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার গুণ, সমস্ত দোষক্রটিকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। কয়েকটি বিভিন্ন রাষ্ট্র নিজেদের সত্তা না হারাইয়া সাধারণ স্বার্থজড়িত বিষয়গুলির সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থার জন্য একটি যুক্তরাষ্ট্রে মিলিত হইতে পারে। ভবিষ্যৎ পৃথিবী-রাষ্ট্রে দেশরক্ষা বং অন্যান্য কয়েকটি সাধারণ বিষয়ের শাসনব্যবস্থা একটি যুক্তরাষ্ট্রের উপর অর্পণ করা যাইতে [illegible]। নিজ আভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থায় প্রত্যেকটি রাষ্ট্রই তাহার স্বাধীনতা বজায় রাখিতে পারিবে। সুতরাং ভবিষ্যতে কোন পৃথিবী-রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিলে তাহা যুক্তরাষ্ট্রীয় আদর্শেই প্রতিষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা।

Q. 15. *Distinguish between Parliamentary and Presidential form of Government.*

উঃ। পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থায় শাসনক্ষমতা একটি মন্ত্রিসভার হস্তে ন্যস্ত থাকে। মন্ত্রীদের পার্লামেণ্ট বা আইনসভার সভ্যদের মধ্য হইতে নিযুক্ত করা হয় এবং তাঁহারা নিজেদের কার্য্য ও নীতির জন্য আইনসভার নিকট দায়ী। অর্থাৎ আইনসভা তাঁহাদের বিরুদ্ধে অনাস্থাসূচক প্রস্তাব গ্রহণ করিলে মন্ত্রীরা পদত্যাগ করেন। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান শাসনব্যবস্থা

এই শ্রেণীতে পড়ে। এইরূপ শাসনব্যবস্থায় শাসনতন্ত্রের শীর্ষদেশে একজন রাষ্ট্রপতি অথবা রাজা থাকেন। কিন্তু তিনি নামে মাত্র শাসনকর্তা। আসল ক্ষমতা মন্ত্রিসভার উপর ন্যস্ত থাকে।

প্রেসিডেন্সিয়াল শাসনব্যবস্থায় আসল ক্ষমতা একজন প্রেসিডেণ্ট বা রাষ্ট্রপতির হস্তে ন্যস্ত থাকে! তিনি জনসাধারণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত এবং তাঁহার কোন কার্য্যের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী নহেন। তিনি আইনসভার সভ্য হইতে পারেন না। তাঁহার একটি মন্ত্রিসভা থাকিতে পারে। কিন্তু মন্ত্রীরা আইনসভার নিকট দায়ী নহেন,—তাঁহারা রাষ্ট্রপতির নিকট দায়ী এবং কেহই আইনসভার সভ্য হইতে পারে না।

Q. 16. *Discuss the merits and demerits of the cabinet form of government.*

উঃ। ক্যাবিনেট (বা মন্ত্রিসভা বা পার্লামেণ্টীয়) শাসনতন্ত্রে শাসনকার্য্য পরিচালনার জন্য একটি মন্ত্রিসভা থাকে। মন্ত্রিগণ তাঁহাদের নীতি ও কার্য্যের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী থাকেন। আইনসভার সদস্যগণ তাঁহাদের বিরুদ্ধে অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব গ্রহণ করিলে মন্ত্রিগণ পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন। আইনসভার যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠ, তাহার প্রধান সদস্যদের লইয়া মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। ইংলণ্ড এবং ভারতবর্ষে এই প্রকারের শাসনব্যবস্থা প্রচলিত আছে।

গুণ ঃ—(১) এই ব্যবস্থায় আইনসভা সর্ব্বদা মন্ত্রিমণ্ডলীর কার্য্য নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। ফলে মন্ত্রীরা স্বেচ্ছাচারী হইতে পারে না।

(২) আইনসভা ও মন্ত্রিসভার মধ্যে সহযোগ গড়িয়া উঠে। দুইটি বিভাগের মধ্যে কোন বিবাদ হইবার সম্ভাবনা থাকে না। শাসনকার্য্য পরিচালনার জন্য কোন আইন প্রণয়নের দরকার হইলে মন্ত্রিসভা সহজে আইনসভার অনুমোদন লাভ করিতে পারে।

দোষ ঃ—(১) মন্ত্রিসভা সাধারণতঃ প্রায় ২০ বা ততোধিক সভ্য লইয়া গঠিত হয়। অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট। অনেক সময়ে বিপজ্জনক পরিস্থিতির উদ্ভব হইলে মন্ত্রিসভার মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হইতে পারে। মতভেদ হইলে মন্ত্রিসভার কার্য্যক্ষমতা কমিয়া যায়।

(২) কি বৈদেশিক, কি আভ্যন্তরীণ যে-কোন বিষয়েই একটি নির্দ্দিষ্ট নীতি অনুসরণের নিশ্চয়তা এই ব্যবস্থায় পাওয়া যায় না। তাহার কারণ আইনসভা বিরুদ্ধ মত প্রদান করিলে যে-কোন সময় মন্ত্রিসভা পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, সঙ্গে সঙ্গে নীতির পরিবর্ত্তন হইবে।

Q. 17. *Discuss the merits and defects of the Presidential form of government.*

উঃ। প্রেসিডেন্সিয়াল বা রাষ্ট্রপতি-শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রের পরিচালনার ভার থাকে একজনের উপর। তাঁহাকে রাষ্ট্রপতি বলা হয়। জনসাধারণ তাঁহাকে নির্ব্বাচন করে এবং তিনি আইনসভার নিকট দায়ী নহেন। তিনি নিজে এবং তাঁহার সহায়ক মন্ত্রিসভার সদস্যগণ আইনসভার সভ্য হইতে পারেন না। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে এই শাসনব্যবস্থা প্রচলিত আছে। যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি জনগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত এবং তিনি পরিচালনা-বিভাগের সর্ব্বাধিনায়ক। কিন্তু তিনি আইনসভা এবং কংগ্রেসের সভ্য নহেন। তাঁহার কোন কার্য্যের জন্য তিনি কংগ্রেসের নিকট দায়ী নহেন।

গুণাবলী ঃ—(১) এই ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠিত সরকার অধিকতর স্থিতিশীল। ইহার কারণ রাষ্ট্রে পরিচালন-বিভাগকে খুশীমত বদল করিবার ক্ষমতা আইনসভার হস্তে দেওয়া নাই। রাষ্ট্রপতি কয়েক বৎসরের জন্য নির্ব্বাচিত হন এবং তাঁহাকে বরখাস্ত করিবার ক্ষমতা আইনসভার নাই। (২) ফলে শাসনতন্ত্র দৃঢ় এবং শক্তিশালী হইয়া গড়িয়া উঠে এবং বিপজ্জনক পরিস্থিতির উদ্ভব হইলে আইনসভা কর্ত্তৃক বাধাপ্রাপ্ত না হইয়া রাষ্ট্রপতি অতি দ্রুত উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারে।

দোষাবলী ঃ—পরিচালন-বিভাগ ও আইনসভা স্ব-স্ব প্রধান হওয়ার ফলে তাঁহাদের মধ্যে অনেক সময়েই বিবাদ হইতে পারে। ফলে সরকারী কার্য্যে বাধা সৃষ্টি হয়।

পঞ্চম অধ্যায়

শাসনক্ষমতা পৃথকীকরণনীতি

Q. 1. *"The business of a modern government divides itself into three main parts—legislative, judicial and executive."—Illustrate.* (C. U. 1937)

What are the principal organs of government and what are their respective functions ? (C. U. 1941 ; U. P 1941)

উঃ। বর্ত্তমান রাষ্ট্রে সরকারের কার্য্যাবলী তিন ভাগে ভাগ করা হইয়াছে—আইন-প্রণয়নবিভাগ, পরিচালনবিভাগ এবং বিচারবিভাগ। আইন-প্রণয়নবিভাগ আইন প্রণয়ন করে। পরিচালনবিভাগ আইনগুলি বহাল রাখে। বিচারবিভাগ আইন-ভঙ্গকারীদের বিচার করে ও যথোচিত শাস্তি দেয়।

এই তিনটি কার্য্যের ভার আইনসভা, পরিচালনবিভাগ এবং বিচারবিভাগ এই তিনটি প্রতিষ্ঠানের উপর ন্যস্ত থাকে।

আইনসভা ঃ—আইনসভার প্রধান কাজ হইতেছে আইন প্রণয়ন করা। দ্বিতীয়তঃ, আইনসভা রাষ্ট্রের আয়-ব্যয়ের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে। আইনসভার আর একটি বিশেষ কাজ আছে। মন্ত্রিমণ্ডলীর কার্য্য তদারক করাও আইনসভার একটি প্রধান কাজ। আইনসভা রাষ্ট্রের সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বিভাগ। ইহা সাধারণতঃ দুইটি পরিষদ লইয়া গঠিত হয়।

পরিচালনবিভাগ ঃ—আইনসভা-প্রণীত আইন-কানুনকে চালু করাই পরিচালনবিভাগের প্রধান কাজ। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে শান্তি এবং শৃঙ্খলা-রক্ষার ভারও এই বিভাগের উপর ন্যস্ত। আবার আইনসভার সঙ্গে ইহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। কারণ, প্রায় সমস্ত দেশেই আইনসভার অধিবেশন আহ্বান করা এবং তাহা ভঙ্গ করিবার অধিকার এই বিভাগের হস্তে আছে। পরিচালনবিভাগ বিচারকদের নিযোগ করে। পরিচালন-বিভাগের অধীনে আবার অনেকগুলি দপ্তর আছে—(১) স্বরাষ্ট্র-বিভাগ (পুলিশব্যবস্থা এবং আইন ও শৃঙ্খলা-রক্ষার জন্য এই বিভাগ দায়ী); (২) রাজস্ববিভাগ (সরকারী আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রস্তুত, সরকারী রাজস্ব-সংগ্রহ এবং ব্যয়ের জন্য এই বিভাগ দায়ী); (৩) যুদ্ধ-দপ্তর (স্থলবিভাগ, নৌ-বিভাগ, এবং বিমান-বিভাগ ইহার নিয়ন্ত্রণাধীন); (৪) বৈদেশিক দপ্তর (বৈদেশিক সম্পর্ক পরিচালনা এই বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন)। ইহা ছাড়া আরও নানাপ্রকার বিভাগ আছে,—যেমন শ্রম এবং কৃষিবিভাগ প্রভৃতি। প্রত্যেক বিভাগের দৈনন্দিন শাসন-কার্য্য পরিচালনার জন্য একদল সরকারী কর্ম্মচারীর উপর ন্যস্ত থাকে। কর্ম্মচারীদের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার দ্বারা নিয়োগ করা হয়। ইহারা সকলেই স্থায়ী সরকারী কর্ম্মচারী। পরিচালনবিভাগের অধিনায়ক কিন্তু অন্য উপায়ে নিযুক্ত হন। কোন কোন দেশে তিনি জনসাধারণ কর্ত্তৃক সরাসরিভাবে নির্ব্বাচিত (যেমন প্রেসিডেন্সিয়াল শাসনব্যবস্থায়); আবার কোথাও বা তিনি আইনসভা কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত এবং তাঁহার নীতি ও কার্য্যকলাপের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী থাকেন (যেমন মন্ত্রিসভাপ্রধান শাসনব্যবস্থায়); আবার কোথাও বা জন্মগত অধিকারে (যেমন রাজতন্ত্র) রাষ্ট্রের অধিনায়ক স্থির করা হয়।

বিচারবিভাগ ঃ—রাষ্ট্রের আইন-কানুনের উপর ভাষ্যপ্রদান, সর্ব্বপ্রকার বিবাদের মীমাংসাসাধন এবং আইন ও শৃঙ্খলা-ভঙ্গকারীদের শাস্তিবিধান

করা বিচারবিভাগের কাজ। বিচারকগণ যাহাতে ন্যায় বিচার করিতে পারেন, সেইজন্য তাঁহাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজ করিবার অধিকার থাকা উচিত। এইজন্য বিচারকদের একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য কর্ম্মে নিযুক্ত করা হয়, এবং গুরুতর ব্যক্তিগত অপরাধ ব্যতীত নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে তাঁহাদের কর্ম্মচ্যুতি করা যায় না। সাধারণতঃ পরিচালনবিভাগ বিচারকদের নিয়োগ করে (যেমন ভারতবর্ষে)। আবার জনসাধারণের ভোটেও তাঁহাদের নির্ব্বাচিত করা হয় (যেমন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে)।

Q. 2. *'The function of the legislature is not merely the making of laws.' What other functions does the legislature in a modern democratic state discharge?* (C. U. 1942)

উঃ। বর্ত্তমান গণতন্ত্রে আইনসভা সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান। ইহার প্রধান কাজ হইতেছে, জনসাধারণের সুশাসনের জন্য আইন প্রণয়ন করা। পুরাতন আইন সংশোধন করা, এবং বর্ত্তমান জীবনধারা উপযোগী নূতন আইনের প্রবর্ত্তন করা এই বিভাগের কাজ। কিন্তু আইন-প্রণয়ন ছাড়াও আইনসভা অন্য কাজ করে। সরকারী আয়-ব্যয়-নির্যন্ত্রণের দায়িত্ব আইনসভার। বিভিন্ন বিভাগের মোট কত ব্যয়-বরাদ্দ করা হইবে, কত রাজস্ব আদায় হইবে, কি হারে কি কর ধার্য্য করা হইবে, এ সমস্তই আইন-সভার অনুমোদনসাপেক্ষ।

মন্ত্রীদের কার্য্য পরিদর্শন করা আইনসভার আর একটি প্রয়োজনীয় কাজ। দায়িত্বশীল সরকারে মন্ত্রিসভা সম্পূর্ণরূপে আইনসভার নিয়ন্ত্রণাধীন। মন্ত্রীদের কার্য্যকলাপ সমালোচনা করিবার এবং তাঁহাদের কার্য্যে আস্থা হারাইলে তাঁহাদের বরখাস্ত করিবার অধিকার আইনসভার আছে।

আরও অনেক ক্ষমতা আইনসভার পরিচালনাধীনে থাকে। নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্বের বিচার করা এবং উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করা আইনসভার কার্য্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত। পরিচালনবিভাগের

করণীয় কার্য্যাবলীতেও অনেক সময় আইনসভা অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে,—যেমন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে উক্ত রাজকর্ম্মচারী নিয়োগ আইনসভার উচ্চপরিষদের অনুমোদনসাপেক্ষ। নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারী নিয়োগের বন্দোবস্ত করা, কোন বিষয় নির্দ্ধারণের জন্য কমিশন নিযোগ করা প্রভৃতিও আইনসভার কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য হয়।

Q. 3. *Discuss the advantages and disadvantages of the bicameral system of legislature.* (U. P. 1938, '40, '41)

Or, Discuss the reasons for the existence of the bicameral system of legislature. (C. U. 1941 ;

Discuss the utility of second chambers in (a) a unitary government and (b) a federal government. (C. U. 1955)

উঃ। যখন দুইটি পরিষদ লইযা আইনসভা গঠিত হয়, তখন তাহাকে দ্বি-পরিষদ আইনসভা বলে। একটি পরিষদকে বলা হয় উচ্চপরিষদ বা দ্বিতীয়-পরিষদ, আর একটিকে বলা হয় নিম্নপরিষদ। নিম্নপরিষদ জনসাধারণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের লইযা গঠিত হয়। সাধারণতঃ, নিম্নপরিষদকে অধিক ক্ষমতা দেওয়া হয় এবং ইহা কর-ধার্য্য ও ব্যয়-বরাদ্দ নিয়ন্ত্রণ করে। দ্বিতীয় পরিষদ নির্ব্বাচন দ্বারা গঠিত হইতে পারে। কিন্তু সাধারণতঃ ইহার ভোটাধিকার নিম্নপরিষদের ন্যায বিস্তৃত থাকে না (যেমন ভারতীয় প্রাক্তন আইনপরিষদে ও প্রাদেশিক আইনসভায় ছিল)। আবার কোথাও বা সরকারী মনোনীত প্রতিনিধিদের লইয়া দ্বিতীয়-পরিষদ গঠিত হয় (যেমন কানাডা দেশে)। আবার অন্য দেশে বংশপরম্পরায় দ্বিতীয়-পরিষদের প্রতিনিধি ঠিক করা হয় (যেমন বিলাতে লর্ড সভা)। নিম্ন-পরিষদের তুলনায় ইহার ক্ষমতা অনেকাংশে কম থাকে। সরকারী ব্যয়-বরাদ্দ অনুমোদনের অধিকার দ্বিতীয়-পরিষদের থাকে না।

এই দ্বি-পরিষদীয় ব্যবস্থার কতকগুলি সুবিধা বা গুণ এবং অসুবিধা বা দোষ আছে :—

গুণাবলী :—(১) মাত্র একটি পরিষদ থাকিলে, তাহা অনেক সময়েই সাময়িক উত্তেজনার বশে এমন আইন প্রণয়ন করিতে পারে, যাহার জন্য পরে তাহাকে অনুশোচনা করিতে হইতে পারে। দ্বিতীয়-পরিষদ থাকিলে আইন পাস করিতে কিছুটা বেশী সময় লাগে ও ইতিমধ্যে জনসাধারণ স্থিরমস্তিষ্কে চিন্তা করিবার সুযোগ পায়।

(২) নিম্নপরিষদ বিশেষ কিছু চিন্তা না করিয়াই অনেক সময় বিল পাস করিতে পারে। কোন আইনের খসড়া সম্বন্ধে সকল দিক বিবেচনা করিয়া মত প্রদানের সময় সাধারণতঃ নিম্নপরিষদের থাকে না। দ্বিতীয়-পরিষদ পুনঃ পরীক্ষার পরিষদরূপে কাজ করে এবং প্রত্যেকটি বিষয় সযত্নে পুনর্বিবেচনা করিয়া দেখে। ফলে উন্নত ধরণের আইন প্রণয়ন হয়।

(৩) দ্বিতীয়-পরিষদে বিভিন্ন শ্রেণী, স্বার্থ অথবা সংখ্যালঘু সম্প্রদায় প্রতিনিধি প্রেরণের সুযোগ পায়।

যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চপরিষদ যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত অঞ্চলগুলির প্রতিনিধি দ্বারা গঠিত হয়।

দোষাবলী :—(১) "দ্বিতীয়-পরিষদ যদি প্রথম-পরিষদের সঙ্গে একমত হয়, তবে সে অপ্রয়োজনীয় এবং অতিরিক্ত হইয়া পড়ে, আর যদি প্রথম-পরিষদের সঙ্গে একমত না হয় তবে তাহার ফল হয় মারাত্মক।"

(২) দ্বিতীয়-পরিষদ মালিকশ্রেণী ও অন্যান্য পুঁজিবাদীর স্বার্থের সহিত মিত্রতাসূত্রে জড়িত থাকে। ফলে, ইহা প্রগতিমূলক আইন-প্রণয়নের পথে বাধা দেয়। ফরাসীদেশে একমাত্র দ্বিতীয়-পরিষদের বাধার ফলে বহুদিন স্ত্রীলোকদের ভোটাধিকার দেওয়া হয় নাই। ভারতবর্ষেও প্রাক্তন আইনপরিষদ সর্ব্বদাই সরকারের অন্যায় প্রস্তাবকে সমর্থন করিত।

(৩) দ্বিতীয়-পরিষদ থাকিলে শুধু কেবল ব্যয় বাড়ে এবং আইন-প্রণয়নের ব্যবস্থা জটিল করিয়া তোলা হয়। এ ছাড়া ইহাতে কোন লাভ নাই।

বর্ত্তমানে বহু লেখক দ্বি-পরিষদ আইনসভার বিরোধী। আমাদের দেশের নূতন শাসনতন্ত্রে, কেন্দ্রে এবং অধিকাংশ রাজ্যে দ্বি-পরিষদ আইনসভা থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

Q. 4. *Discuss the theory of separation of powers. What are its limitations?*

(C. U. 1941, '44, '46, '51, '54, U. P. 1928, '41)

"The strict separation of powers is not only impracticable as a working principle of government, but it is one not to be desired in practice"—Comment on this statement.

(C. U. 1934)

উঃ। এই মতবাদে বলা হয় যে, সরকারের তিনটি বিভাগ,—আইন-প্রণয়নবিভাগ, পরিচালনবিভাগ এবং বিচারবিভাগ—প্রত্যেকে অপর হইতে পৃথক থাকিবে এবং স্বাধীনভাবে কাজ করিবে। প্রত্যেকটি বিভাগের ভার বিভিন্ন ব্যক্তিদের হস্তে ন্যস্ত করা হইবে এবং এক বিভাগ অন্য বিভাগের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না। এই মতবাদের উদ্দেশ্য ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষা করা। পুরাকালে রাজা একাই আইন প্রণয়ন করিতেন এবং আইনের প্রয়োগ করিতেন। আবার তিনিই একমাত্র বিচারক ছিলেন। ফলে, স্বেচ্ছাচারতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অবাধ সুযোগ ছিল। রাষ্ট্রক্ষমতা যখন এককেন্দ্রীভূত থাকে তখন ব্যক্তিস্বাধীনতা থাকে না। আইন-প্রণয়নের এবং আইন-প্রয়োগের অধিকার যদি একই ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টির হস্তে অর্পণ করা হয় তখন স্বাধীনতা বিপন্ন হইয়া পড়ে, কারণ একই শাসক অথবা একই আইনপরিষদ স্বেচ্ছাচারী আইন প্রণয়ন করে, আবার সে-ই আইনের প্রয়োগও করিতে পারে। আবার বিচারবিভাগ যদি আইন-প্রণয়নবিভাগ

ও পরিচালনবিভাগ হইতে বিচ্ছিন্নভাবে কাজ না করিতে পারে, তবে বিচারকদের হস্তে থাকে অত্যাচারীর ক্ষমতা। স্বাধীনতা বিপন্ন হইয়া পড়ে। ফরাসী লেখক মণ্টেস্কু এবং ইংলণ্ডের ব্ল্যাকস্টোন এই মতবাদের ভক্ত ছিলেন। ফরাসী এবং আমেরিকার শাসনতন্ত্রপ্রণয়নে এই মতবাদের বিশিষ্ট প্রভাব ছিল।

সমালোচনা :—(১) রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগের কার্য্য সম্পূর্ণ পৃথক করা সম্ভবপর নয। গভর্ণমেণ্ট এমন যন্ত্র নয, যাহাকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন কতকগুলি প্রকোষ্ঠে ভাগ করা চলে। সরকারী কার্য্যাবলী এমনভাবে মিশ্রিত যে, তাহাদের প্রত্যেককে আলাদা আলাদা করিয়া রাখা সম্ভবপর নয। প্রত্যেক রাষ্ট্রেই পরিচালনবিভাগের হস্তে কিছু না কিছু আইন-প্রণযনের ভার থাকে। আবার আইনসভা পরিচালনবিভাগের নিযন্ত্রণ করে, যেমন ইংলণ্ডে ও ভারতবর্ষে। পরিচালনবিভাগের সদস্যবৃন্দ (অর্থাৎ মন্ত্রিসভা আইনসভার সদস্য এবং তাঁহারা প্রত্যেকেই আইনসভার নিকট দাযী। আইনের ভাষ্য প্রদানের সময়ে বিচারকগণ কার্য্যতঃ নূতন আইনের সৃষ্টি করেন। পরিচালন-বিভাগের কার্য্য বিচারকগণের নিয়ন্ত্রণাধীন।

(২) ক্ষমতার সম্পূর্ণ পৃথকীকরণ শুধু অসম্ভব নয়, তাহা অনিষ্টকর এবং অবাঞ্ছনীয়। সরকারের তিনটি বিভাগ যদি সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে নিজ নিজ কাজ করে, তবে প্রায়ই অচল অবস্থার সৃষ্টি হইবে। প্রত্যেকটি বিভাগের লক্ষ্য হইবে নিজ ক্ষমতা রক্ষা করা, এবং কাহাকেও সাহায্য করিবে না। পরস্পরের সহযোগিতার অভাবে সকল কর্ম্ম পণ্ড হইবে।

(৩) সরকারের তিনটি বিভাগের ক্ষমতা সমান হইতে পারে না, যদিও এই মতবাদ সেই ক্ষমতার সাম্যই দাবী করে। এই তিনের মধ্যে আইনসভা সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী।

(৪) স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ক্ষমতার সম্পূর্ণ পৃথকীকরণের কোন প্রয়োজন হয় না। ইংলণ্ডে এইভাবে রাষ্ট্র-ক্ষমতা পৃথক করা হয় নাই। অথচ ইংলণ্ডের

লোকের ব্যক্তিস্বাধীনতা নাই একথা কেহ বলিতে পারে না। ইংলণ্ডের লোকেরা পূর্ণ ব্যক্তিস্বাধীনতা ভোগ করে। স্বাধীনতা জনসাধারণের আত্ম-শক্তির উপর নির্ভর করে।

কিন্তু তাই বলিয়া মতবাদটি যে একেবারে মূল্যহীন তাহা নহে। এই মতবাদের প্রকৃত তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে, সমস্ত রাষ্ট্র-ক্ষমতা এক ব্যক্তি বা এক প্রতিষ্ঠানের হস্তে থাকা উচিত নয়, এবং ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষার্থে বিচার-বিভাগের স্বাধীনতা নিতান্ত প্রয়োজন।

ভারতবর্ষে এই নীতি কতটা গ্রহণ করা হইয়াছে? ভারতবর্ষের কোথাও রাষ্ট্রক্ষমতা পৃথক করা হয় নাই। পরিচালনবিভাগের কর্তৃত্ব মন্ত্রিসভার হস্তে ন্যস্ত এবং মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দ আইনসভার সদস্য। পরিচালনবিভাগের অধিনায়ক রাষ্ট্রপতি প্রয়োজন মনে করিলে জরুরী আইন প্রণয়ন করিতে পারেন। এই নীতি না মানার প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইতেছে জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট। তিনি একাধারে পুলিশ-ম্যাজিষ্ট্রেট এবং বিচারকের কাজ করেন। মন্টেস্কুএর মতে এইভাবে পুলিশ এবং বিচারকের ক্ষমতার সমন্বয়সাধন স্বেচ্ছাচারিতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

জাতীয়তাবাদ

Q. 1. (*a*) ***Define Nation.***
U. P. 1940. '43)

(*b*) ***Distinguish between :—***

(*i*) ***State and Nation.***

(*ii*) ***Nation and Nationality.*** **(C. U. 1952 ; P. U. 1961)**

উঃ। (ক) "নেশন" বলিতে এমন একটি জনসমষ্টিকে বুঝায়, যাহারা

একই গোষ্ঠীর লোক, একই ধর্ম্মে বিশ্বাসী, একই ভাষা-ভাষী এবং সাহিত্য-সেবী, যাহাদের আচার-ব্যবহার ও সংস্কৃতি একই ধরণের। এই জনসমষ্টি, যখন কোন নির্দ্দিষ্ট ভূখণ্ডে নিজেদের রাষ্ট্রের আওতায় বাস করে, তখন তাহাদের নেশন বলা হয়। সুতরাং নেশন গঠন করিতে হইলে দরকার—(১) কোন নির্দ্দিষ্ট জনসমষ্টি, যাহাদের (২) এক ধর্ম্ম, ভাষা, সভ্যতা প্রভৃতি থাকিবে ও (৩) যাহারা নির্দ্দিষ্ট ভূখণ্ডে, (৪) একটি নিজস্ব স্বাধীন গভর্ণমেণ্টের অধীনে বাস করে।

(খ) (১) কোন জনসমষ্টি যখন একটি নির্দ্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্বাধীনভাবে নিজস্ব গভর্ণমেণ্ট সংগঠন করে, তখন একটি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয়। নেশন-গঠনে এই সবগুলিই অবশ্য প্রয়োজনীয়। কিন্তু ইহা ছাড়াও নেশন বলিয়া গণ্য হইতে গেলে, সেই জনসমষ্টিকে হয় এক ভাষা-ভাষী বা একই ধর্ম্মে অনুরাগী, কিংবা একই সংস্কৃতির অনুগামী অথবা একই গোষ্ঠী হইতে উদ্ভূত হইতে হইবে। ইহার কোনটিই রাষ্ট্রগঠনের পক্ষে প্রয়োজনীয় নয়। রাষ্ট্রগঠনের পক্ষে প্রয়োজনীয় উপাদানগুলির সঙ্গে আরো কিছু যোগ করিলেই নেশন বলা হয়। নেশন বলিতে আমরা গোষ্ঠীর ঐক্য, ভাষার ঐক্য, সংস্কৃতির ঐক্য এবং রাজনৈতিক সংগঠনের ঐক্য, ইহার সব কিছুই ধরিয়া থাকি। রাষ্ট্র বলিতে কিন্তু কেবলমাত্র রাজনৈতিক ঐক্য বুঝায়। একটি রাষ্ট্র সকল সময় একটি নেশন লইয়া গঠিত হয় না। কয়েকটি নেশনের সমন্বয়ে সুইজারল্যাণ্ডে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত আছে।

(২) কোন নির্দ্দিষ্ট জনসমষ্টির, যখন গোষ্ঠী, ভাষা, ধর্ম্ম, সংস্কৃতি ও ইতিহাসের ঐক্য থাকে, তখন তাহারা একটি জাতি বা "**nationality**" গড়িয়া তুলে। জাতি এবং নেশনের মধ্যে পার্থক্য আছে। যখন কোন জাতি নিজস্ব সরকার গঠন করে কিংবা স্বাধীনতা লাভের জন্য সংগ্রাম করে, তখন তাহারা সম্পূর্ণ নেশনরূপে গণ্য হয়। জাতি বলিতে আমরা শুধু ধর্ম্ম, ভাষা, সংস্কৃতি দ্বারা ঐক্যবদ্ধ জনসমষ্টিকে বুঝি। তাহাদের নিজস্ব শাসনতন্ত্র

থাকিতে পারে, নাও থাকিতে পারে। যখন এইরূপ ঐক্যবদ্ধ জনসমষ্টি নিজস্ব শাসনাধীনে বাস করে, তখনই তাহাদের নেশন বলা হয়।

Q. 2. (*a*) *What are the elements of nationality ?* (C. U. 1938, '58)

What are the essential factors that go to create the consciousness of common nationality ? (C. U. 1948)

(*b*) *Is India a nation ?* (C. U. 1930)

উঃ। (ক) জাতীয়তাবোধ হইতেছে এমন একটি মানসিক চিন্তাধারা যাহা একটি জনসমষ্টির মধ্যে ঐক্যবোধ আনিয়া দেয়। নিম্নলিখিত বিষয়গুলির যে-কোন একটি ঐক্যবোধ গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করে, যথা: এক গোষ্ঠী, এক ধর্ম্ম, এক বাসস্থান, এক ভাষা ও সাহিত্য, এক আচার-ব্যবহার ও সংস্কৃতি ইত্যাদি। এই সমস্ত একত্র থাকিলে "এক জাতি, এক প্রাণ" গড়িয়া উঠে।

(১) সকলেই একটি সাধারণ গোষ্ঠী হইতে উদ্ভূত হইলে অতি সহজেই তাহাদের মধ্যে জাতীয় ঐক্যবোধ জাগ্রত হয়। সকলে যদি মনে করে যে, তাহারা একই গোষ্ঠীর লোক, তবে স্বভাবতই তাহাদের ঐক্যবোধ খুব প্রবল হইবে। কিন্তু বৈজ্ঞানিকরা বলেন যে, কোন জনসমষ্টিই একই গোষ্ঠী হইতে উদ্ভূত একথা দাবী করিতে পারে না। সকল জাতির জন্ম বহু গোষ্ঠীর সংমিশ্রণে হইয়াছে। সুতরাং একই গোষ্ঠী হইতে উদ্ভূত না হইয়াও কোন জনসমষ্টি একটি জাতি গঠন করিতে পারে; আমেরিকা ও সুইজারল্যাণ্ডের লোক বহু জাতিগোষ্ঠীর সংমিশ্রণে গঠিত হইয়াছে। (২) সকলের ধর্ম্ম এক হইলে তাহাদের মধ্যে ঐক্যও সহজ হইতে পারে। দেশের লোক বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী হইলে তাহাদের মধ্যে একতা গড়িয়া উঠিতে পারে না। কিন্তু বর্ত্তমানকালে ধর্ম্মের গোঁড়ামি আর নাই। সুতরাং বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী জনসাধারণকে লইয়া একটি জাতি গঠনের দৃষ্টান্ত সর্ব্বত্রই আছে। (৩) একই

তাহার ফলে পারস্পরিক সৌহার্দ্দ্যের স্থলে দেখা দিবে পারস্পরিক ঈর্ষ্যা ও দ্বন্দ্ব। এইজন্য অনেকের মতে মাত্র একটি জাতি লইয়া একটি রাষ্ট্র গঠন করা উচিত। যদি কোন রাষ্ট্র নানা জাতির লোক লইয়া গঠিত থাকে, তবে সেই রাষ্ট্র ভাঙ্গিয়া তাহার স্থলে "একজাতি একরাষ্ট্রে"র ভিত্তিতে কয়েকটি রাষ্ট্র গড়িতে হইবে। এই মতবাদের আর এক নাম "জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার"।

একটি জাতি লইয়া একটি রাষ্ট্র গঠন করিতে পারিলে, অবশ্য কতকগুলি সুবিধা আছে। রাষ্ট্রের সমস্ত লোক একজাতির অন্তর্গত বলিয়া তাহাদের মধ্যে সম্প্রীতি থাকে, পরস্পরের মধ্যে সহজেই ভাবের লেনদেন হয়। প্রত্যেক জাতি নিজ সংস্কৃতি ও ভাবধারার উন্নতিকল্পে সম্পূর্ণ শক্তি নিয়োজিত করিতে পারে।

কিন্তু একটি জাতি লইয়া রাষ্ট্র গঠনের নিয়ম সব সময়ে সন্তোষজনক হয় না। (১) একই রাষ্ট্রের অন্তর্গত বিভিন্ন জাতির অবাধ সংমিশ্রণের মধ্য দিয়া অনেক সময় সমাজের উন্নতি হয়। কয়েকটি জাতির ও কয়েকটি কৃষ্টির মিলনের ফলে সমাজ উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। (২) এই মতবাদ অনুসারে কাজ করিতে গেলে, বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের পত্তন করিতে হইবে। বর্ত্তমানের বৃহদায়তন রাষ্ট্রগুলি ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে। ইহা মোটেই সুবিধাজনক বন্দোবস্ত নহে। অনেক ক্ষেত্রেই এ ব্যবস্থা জনসাধারণের অর্থনৈতিক স্বার্থের বিরুদ্ধে যাইবে। আবার বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের মধ্যে শান্তি রক্ষা করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিবে। (৩) অনেক ক্ষেত্রে একজাতি লইয়া একটি রাষ্ট্র গঠন সম্ভবপর হয় না। ইউরোপের বহু স্থানে বিভিন্ন জাতি এমনভাবে মিশিয়া গিয়াছে যে, প্রত্যেক জাতির জন্য একটি ভিন্ন রাষ্ট্র স্থাপন কিছুতেই কার্য্যক্ষেত্রে সম্ভবপর নয়। সুতরাং ভৌগোলিক কারণেই জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবীকে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

Q. 4. ***Discuss the rights of nationlities*. (C.U. 1943, '4c)**

উঃ। এক সময় ছিল, যখন প্রত্যেক জাতির নিজস্ব রাষ্ট্রগঠনের দাবী অনেকেই উচিত বলিয়া মনে করিতেন। এই অধিকার জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার বলিয়া পরিচিত। কিন্তু এই আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার বর্ত্তমানে আর সর্ব্বজনগ্রাহ্য বলা যায় না। আর কিছু না হউক, কেবলমাত্র ভৌগোলিক কারণেই এই আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রত্যেক জাতিকে দেওয়া যায় না। এই আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার মানিয়া লইলে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের পত্তন অনিবার্য্য হইয়া উঠে। পৃথিবীর শান্তিরক্ষার দিক দিয়া ইহা কোন মতেই কাম্য নহে।

কিন্তু প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিকে নিজস্ব রাষ্ট্র গঠনের অধিকার না দিলেও কতকগুলি অধিকার দেওয়া উচিত। নিজস্ব ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি স্বাধীনভাবে গড়িয়া তুলিবার অধিকার প্রত্যেক জাতির থাকিবে। প্রত্যেক রাষ্ট্রের এইরূপ বন্দোবস্ত করা উচিত; প্রত্যেক জাতি যাহাতে নিজস্ব বিদ্যায়তনের নিজস্ব পদ্ধতিতে সন্তানদের শিক্ষা দিতে পারে এই অধিকার তাহাদিগকে দিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেক জাতিকে নিজের ধর্ম্মমত পালন করিবার অধিকার দিতে হইবে। তৃতীয়তঃ, রাজস্বের একটা ন্যায়সঙ্গত অংশ রাজ্যস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতির উন্নতিকল্পে ব্যয় করিবার ব্যবস্থা রাষ্ট্রকে করিতে হইবে। জাতিগুলির মধ্যে কোন রকম বৈষম্যমূলক ব্যবহার করা চলিবে না।

সপ্তম অধ্যায়

নাগরিক অধিকার

Q. 1. *Define citizenship. What are the characteristics of a citizen ? Distinguish a citizen from an alien.* (C. U. 1928, '29, '30, '54, '58 ; U. P. 1940, '43)

উঃ। 'নাগরিক' শব্দের সাধারণ অর্থ নগরবাসী। কিন্তু বর্ত্তমানকালে নাগরিক বলিতে শুধু নগরের অধিবাসীদের বুঝায় না। রাষ্ট্রের সমস্ত সদস্যকেই নাগরিক আখ্যা দেওয়া হয়। তাহারা রাষ্ট্রের সভ্য এবং রাষ্ট্রের নিকট নানা সুযোগ-সুবিধা লাভ করে।

আর এক উপায়ে নাগরিক কে, তাহা বুঝান যায়। প্রত্যেক রাষ্ট্রে দুই শ্রেণীর লোক বাস করে,—নাগরিক ও বিদেশী। যেমন ভারতীয় রাষ্ট্রে ভারতীয় নাগরিক এবং বিদেশী উভয়েই বাস করে। (১) কিন্তু নাগরিক, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি, অর্থাৎ যে রাষ্ট্রের সে নাগরিক সেই রাষ্ট্রের আনুগত্য মানিয়া চলে। বিদেশী ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে বাস করিলেও তাহার আনুগত্য মানে না। আনুগত্য কথাটি একটি উদাহরণ দিয়া বুঝান যাইতে পারে। ভারত সরকার যে কোন ভারতীয় নাগরিককে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করিতে বাধ্য করিতে পারে। কিন্তু যে বিদেশী সে ভারতে বাস করিলেও তাহাকে ভারতসরকার ভারতীয় বাহিনীতে যোগ দিতে বলিতে পারে না। (২) নাগরিক যখন বিদেশে বাস করে, তখন সে কোন রকম বিপদে পড়িলে সেই দেশে নিজ রাষ্ট্রের সাহায্য দাবী করিতে পারে। কিন্তু ভারতে বাসকারী কোন বিদেশী ভারতবর্ষের বাহিরে ভারতীয় রাষ্ট্রের সাহায্য দাবী করিতে পারে না। (৩) অবশ্য প্রত্যেক বিদেশীকেও সাধারণভাবে সেই রাষ্ট্রের সমস্ত আইন-কানুন মানিতে হয়

এবং কর দিতে হয়। কিন্তু তাহাকে নাগরিকের সম্পূর্ণ রাজনৈতিক অধিকারগুলি ভোগ করিতে দেওয়া হয় না। বিদেশী সেই রাষ্ট্রের কোন নির্ব্বাচনে অংশ গ্রহণ করিবার অধিকার পায় না ও কোন আইনপরিষদে নির্ব্বাচিত হইতে পারে না। ভারতীয় আইনপরিষদে কেবলমাত্র ভারতীয় নাগরিক সভ্য হইতে পারে, বিদেশীকে সভ্য হইতে দেওয়া হয় না।

নাগরিক হইতে গেলে নিম্নলিখিত **বৈশিষ্ট্যগুলি** থাকা প্রয়োজন :— (১) রাষ্ট্রের সদস্য হিসাবে সে সেই রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করে। পরিবর্ত্তে সে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে এবং বাহিরে রাষ্ট্রের সাহায্য লাভ করে। (২) সে সেই রাষ্ট্রে সমস্ত পৌরঅধিকার ও রাজনৈতিক অধিকার লাভ করিতে পারে।

Q. 2. *What are the different ways of acquiring citizenship?* (C. U. 1938, '43, '54, '58)

Distinguish between a natural and a naturalised citizen. (C. U. 1931, '33)

উঃ। রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব দুই প্রকারে হওয়া যায় :—(১) জন্মগতভাবে ও আইনসিদ্ধভাবে।

(১) **জন্মগতভাবে** নাগরিক দুইটি নিয়মে হইয়া থাকে। প্রথম নিয়ম অনুসারে, কোন লোক যদি রাষ্ট্রের অন্তর্গত অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করে, তাহাকে সেই রাষ্ট্রের নাগরিক বলিয়া গণ্য করা হয়। ইহাকে 'জাস্ সোলি' নিয়ম বলা হয়। দ্বিতীয় নিয়ম অনুসারে, পিতা ও মাতা যে রাষ্ট্রের নাগরিক, সন্তানেরাও সেই রাষ্ট্রের নাগরিক বলিয়া গণ্য হয়, তাহারা যেখানেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন। আমেরিকা প্রথম নিয়ম মানে। কোন ভারতীয়ের পুত্র যদি আমেরিকায় জন্মগ্রহণ করে, তবে সেই পুত্রকে আমেরিকার নাগরিক বলিয়া গণ্য করা হয়। আবার ফরাসী দেশের বাহিরে জন্মগ্রহণ করিলেও ফরাসী-নাগরিকের সন্তান ফরাসী দেশের নাগরিক

বলিয়া গণ্য হইবে। ইংলণ্ডে দুইটি নিয়মেরই প্রচলন আছে। বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত কোন ভূখণ্ডে কিংবা বৃটিশ জাহাজে জন্মগ্রহণ করিলে বিদেশী পিতামাতার সন্তানও বৃটিশ নাগরিক হইবে। আবার বিদেশে জন্মগ্রহণ করিলেও বৃটিশ নাগরিকের সন্তানদের বৃটিশ নাগরিক বলিয়া ধরা হয়।

(১) **আইনসিদ্ধ নাগরিক ঃ** প্রায় সব রাষ্ট্রেই বিদেশীকে নাগরিক করিয়া লইবার বন্দোবস্ত আছে। ইহার জন্য বিদেশীকে কতকগুলি সর্ত্ত পালন করিতে হয়। ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রে এই সর্ত্তের ধারা বিভিন্ন। সাধারণতঃ নিম্নলিখিত সর্ত্ত অনুসারে বিদেশীকে নাগরিক অধিকার দেওয়া হয়:— (১) বিবাহ—বিবাহের পর স্ত্রী স্বামীর দেশের নাগরিক অধিকার অর্জ্জন করে। (২) জমিক্রয়—অনেক রাষ্ট্রে জমি ক্রয় করিলে নাগরিক অধিকার পাওয়া যায়। (৩) কেহ রাষ্ট্রের অধীনে কর্ম্মগ্রহণ, এবং (৪) কয়েক বৎসর বাস করিলে অনেক সময় তাহাকে সেই রাষ্ট্রের নাগরিক বলিয়া গণ্য করা হয়।

এই সমস্ত সর্ত্ত পূরণ করিলে সরকার বিদেশীদের আইনসিদ্ধ নাগরিক হইবার অনুমোদনপত্র দান করে। কোন বিদেশী যদি বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত কোন অঞ্চলে ক্রমাগত পাঁচ বৎসর বাস করে, অথবা সেই সময়ের জন্য কোন সরকারী কাজে নিযুক্ত থাকে, এবং তাহার নৈতিক চরিত্র ভাল থাকে, তবে বৃটিশ সরকার তাহাকে আইনসিদ্ধ নাগরিক হইবার অনুমোদনপত্র দান করে। এইভাবে নাগরিক অধিকার অর্জ্জন করিলে তাহাদের আইনসিদ্ধ নাগরিক আখ্যা দেওয়া হয়।

রাষ্ট্রের অন্তর্গত ভূখণ্ডে জন্মগ্রহণের ফলে অথবা পিতার পুত্র বলিয়া যে নাগরিক অধিকার লাভ করে, তাহাকে **জন্মের অধিকারে নাগরিক** বলা হয়। আবার বিবাহ, সম্পত্তিক্রয়, রাষ্ট্রের সেবা এবং বসবাসের ফলে কোন বিদেশী যখন নাগরিক অধিকার অর্জ্জন করে, তখন তাহাকে

আইনসিদ্ধ নাগরিক বলে। এই উভয় প্রকারে অর্জ্জিত নাগরিকদের অধিকার এবং কর্ত্তব্য প্রায় একই ধরণের। কোন কোন রাষ্ট্রে কিন্তু এখনও একটু পার্থক্য করা হয়। আজও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে কোন আইনসিদ্ধ নাগরিক রাষ্ট্রপতি বা উপ-রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী হইতে পারে না।

Q. 3. *(a) Define Right.* (C. U. 1331, '52)

(b) Distinguish between Moral and Legal Right, and Civil and Political Right. (C. U. 1953)

উঃ। (ক) নাগরিক রাষ্ট্রের ও অন্য নাগরিকের নিকট হইতে যে সমস্ত অধিকার দাবী করিতে পারে, তাহাদিগকে 'নাগরিক অধিকার' বলা হয়। সাধারণতঃ রাষ্ট্র এই দাবী-দাওয়াকে সমর্থন করে। উদাহরণ-স্বরূপ দেখা যাক, নাগরিকের সম্পত্তির অধিকার বলিতে আমরা কি বুঝি। আমার নিজের অর্জ্জিত সম্পত্তির উপর আমার সম্পূর্ণ অধিকার থাকিবে, এবং রাষ্ট্রের রাজশক্তি সেই সম্পত্তির উপর অন্যকে হস্তক্ষেপ করিতে দিবে না। আমার এই অধিকারে কেহ হস্তক্ষেপ করিলে রাষ্ট্র তাহাকে উপযুক্ত শাস্তি দিবে।

কোন রাষ্ট্র ভাল কি মন্দ তাহার পরিচয় সে কতখানি নাগরিক অধিকার দান করিয়াছে তাহা পরীক্ষা করিয়া বুঝা যাইবে। এই অধিকারগুলি না থাকিলে কেহই তাহার জীবনের সম্পূর্ণ বিকাশসাধন করিতে পারে না। যেমন কোন মানুষের শিক্ষাই সম্পূর্ণ হইতে পারে না, যদি রাষ্ট্র তাহাকে সব কিছু জানিবার এবং পড়িবার অধিকার দান না করে।

(খ) দুই প্রকারের নাগরিক অধিকার আছে:—নৈতিক এবং আইনগত। দেশের নৈতিক মতবাদ যে সমস্ত অধিকার স্বীকার করে তাহাদিগকে 'নৈতিক অধিকার' (Moral Rights) বলে। কিন্তু নৈতিক-অধিকারভঙ্গকারীকে রাজশক্তি কোন দণ্ড দিবে না। প্রত্যেক পিতামাতার নৈতিক কর্ত্তব্য হইতেছে সাধ্যানুসারে সন্তানের শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

ইহা সন্তান-সন্ততির নৈতিক অধিকার। কিন্তু কোন পিতামাতা যদি সন্তান-সন্ততির প্রতি এই নৈতিক কর্ত্তব্য পালন করিতে অবহেলা করে, রাষ্ট্র এই কর্ত্তব্যপালনে তাহাদিগকে বাধ্য করিবে না।

আইনগত অধিকার **(Legal Rights)** রাষ্ট্র স্বীকার করে এবং দরকার হইলে শাস্তি দিয়া এই অধিকার রক্ষা করে।

এই আইনগত অধিকারকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয় :—পৌর-অধিকার ও রাজনৈতিক অধিকার।

নাগরিকের জীবন এবং সম্পত্তিরক্ষণ-সম্পর্কিত অধিকারগুলিকে **পৌর-অধিকার** (Civil Rights) বলে। সভ্য-জীবন যাপনের জন্য এই সমস্ত অধিকার অবশ্য প্রয়োজনীয় বলিয়া গণ্য হয়। জীবনের অধিকার, সম্পত্তির অধিকার এবং চুক্তি স্বাধীনতা প্রভৃতি অধিকারগুলি এই পৌর-অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। এই সমস্ত পৌর-অধিকারের সংরক্ষণ প্রত্যেক নাগরিকের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয়।

রাজনৈতিক অধিকার (Political Rights) **:** রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের নির্ব্বাচনে অংশগ্রহণের অধিকার এবং রাষ্ট্রের যে-কোন কার্য্যে নিযুক্ত হইবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের আছে। ইহাদের রাজনৈতিক অধিকার বলে।

বিদেশীদের প্রায় সর্ব্বক্ষেত্রেই পৌর-অধিকারগুলি দেওয়া হয়। তাহাদের কিন্তু রাজনৈতিক অধিকার দেওয়া হয় না। নাগরিকদের এই দুই প্রকারের অধিকার দেওয়া হয়।

Q. 4. *What are the rights of a citizen?* (C. U. 1927, '28, '33, '34, '35, '37, '40, '43, '44c; P. U. 1961; U. P. 1936, '42, '43)

What do the citizens of a modern state expect from the government?

উঃ। প্রত্যেক রাষ্ট্রই নাগরিকদের নিম্নলিখিত অধিকারগুলি ভোগ করিতে দেয় :

(১) **জীবনের অধিকার :** আভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক আক্রমণ হইতে নাগরিকের জীবনরক্ষার দায়িত্ব রাষ্ট্রের উপর ন্যস্ত আছে। এই অধিকারের বলে নাগরিক আত্মরক্ষার্থে দরকার হইলে বলপ্রয়োগ, এমন কি আততায়ীর প্রাণহানি পর্য্যন্ত করিতে পারে।

(২) **স্বাধীনভাবে চলাফেরার অধিকার :** ইচ্ছামত যে-কোন স্থানে চলাফেরা এবং নিজ পছন্দমত জীবনযাপনের স্বাধীনতা প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে। গভর্ণমেণ্ট কখনও অবৈধভাবে কোন নাগরিককে কারারুদ্ধ কিংবা অন্য কোন দণ্ডে দণ্ডিত করিতে পারিবে না। ইহাকে ব্যক্তি-স্বাধীনতা বলে। ইংলণ্ডে ও ভারতে কোন নাগরিক যদি মনে করে যে, তাহাকে অবৈধভাবে কারাদণ্ড দেওয়া হইয়াছে, তবে সে বিচারকের নিকট **"হেবিয়াস করপাস রীট"** ইস্যু করিবার দাবী করিতে পারে। বিচারক তখন গভর্ণমেণ্টের নিকট কারাদণ্ডের ন্যায়সঙ্গত কারণ কি, তাহা জানিতে চাহিবেন। গভর্ণমেণ্ট কোন আইনসঙ্গত কারণ না দেখাইতে পারিলে বিচারক সেই কারারুদ্ধ নাগরিককে মুক্তিদানের আদেশ দিতে পারেন। অবশ্য ব্যক্তি-স্বাধীনতা কখনও কখনও সীমাবদ্ধ করা হয়। যেমন, যুদ্ধের সময় দেশরক্ষার তাগিদে অথবা সামরিক উদ্দেশ্যসাধনের জন্য প্রয়োজন হইলে ব্যক্তি-স্বাধীনতা অনেক পরিমাণে ক্ষুণ্ণ করা হয়।

(৩) **সম্পত্তির অধিকার :** নিজ নিজ সম্পত্তির স্বাধীন ব্যবহার এবং উপভোগের অধিকার সকল নাগরিকের আছে।

(৪) **চুক্তির অধিকার :** ব্যবসায় অথবা অন্য কোন বিষয়সংক্রান্ত সর্ব্ব-প্রকারের চুক্তি যাহাতে রক্ষিত হয় রাষ্ট্রের পক্ষে তাহা দেখিবার দায়িত্ব আছে। অবশ্য এই সমস্ত চুক্তি রাষ্ট্রের বিধিনিষেধ অথবা নৈতিক নিয়ম-বিরুদ্ধ হইলে চলিবে না।

(৫) **মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ঃ** প্রত্যেক নাগরিককে নিজস্ব মত-প্রকাশের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হইবে। সরকারের নীতি এবং কার্য্য-কলাপের সমালোচনার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে। অবশ্য প্রয়োজনীয় হইলেও এই মতপ্রকাশের স্বাধীনতা কখনই সীমাহীন হইতে পারে না। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে উত্তেজনামূলক, রাজদ্রোহকর অথবা কোন-প্রকারের অসৌজন্যমূলক মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নাগরিকদের থাকিতে পারে না। মতপ্রকাশের স্বাধীনতার সুযোগ লইয়া সে অপর নাগরিকদের রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোনপ্রকার হিংসামূলক অথবা ধ্বংসাত্মক কার্য্যে উত্তেজিত করিতে পারে না। বর্ত্তমানকালের কোন রাষ্ট্রই নাগরিকদের এতখানি অধিকার দান করে না।

(৬) **সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ঃ** প্রত্যেক নাগরিকের যেমন মত-প্রকাশের স্বাধীনতা আছে, তেমনি তাহার মতামত পুস্তকাকারে কিংবা সংবাদপত্রে প্রচার করিবার অধিকার আছে। কিন্তু যদি এই সমস্ত লিখিত মতবাদ রাজদ্রোহমূলক, মিথ্যাপ্ররোচক অথবা অসৌজন্যমূলক হয়, তবে গভর্ণমেণ্ট অবশ্য তাহার প্রচার বন্ধ করিতে পারে।

(৭) **সভা-সমিতির অধিকার ঃ** এই অধিকার মতপ্রকাশের স্বাধীনতার অন্তর্ভুক্ত। শান্তিপূর্ণভাবে সমবেত হইবার ও সমিতি গঠন করিয়া নিজেদের মতবাদ প্রচার করিবার স্বাধীনতা জনসাধারণের থাকিবে। কিন্তু যদি কোনপ্রকারের বিশৃঙ্খলা বা হিংসাত্মক কার্য্য করা এই সমস্ত সভা-সমিতির উদ্দেশ্য হয়, তবে গভর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে তাহা বন্ধ করিতে পারে।

(৮) **ধর্ম্মাচরণের স্বাধীনতা ঃ** বর্ত্তমানে প্রায় প্রত্যেক রাষ্ট্রই নাগরিকদের নিজ নিজ ধর্ম্মমতের এবং পূজা করিবার স্বাধীনতা দিয়াছে। রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ। প্রত্যেকে নিজ নিজ ধর্ম্মমত এবং ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কর্ত্তব্য পালন করিবার স্বাধীনতা ভোগ করে।

(৯) **ভাষা এবং সংস্কৃতির স্বাধীনতা ঃ** জনসমষ্টির প্রত্যেক অংশের নিজ নিজ ভাষা এবং সংস্কৃতি সংরক্ষণের ব্যবস্থা রাষ্ট্র করিয়া থাকে।

(১০) **আইনের চক্ষে সমতা ঃ**—রাষ্ট্রের অন্তর্গত উচ্চ, নীচ সকল নাগরিকই আইনের চক্ষে সমান বলিয়া গণ্য হয়।

(১১) **নির্ব্বাচনের অংশগ্রহণের অধিকার ঃ** রাজনৈতিক অধিকার বলিতে সর্ব্বপ্রথম নির্ব্বাচনে অংশগ্রহণের অধিকার বুঝায়। প্রত্যেক পূর্ণবয়স্ক নাগরিককে নির্ব্বাচনে অংশগ্রহণের অধিকার দেওয়া যদিও আদর্শ, তবুও বর্ত্তমানকালে অনেক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রই এই আদর্শের পূর্ণ মর্য্যাদা রক্ষা করে না।

(১২) **রাষ্ট্রের যে-কোন কর্ম্মে নিযুক্ত হইবার অধিকার ঃ** বলা বাহুল্য, রাজনৈতিক অধিকারের মধ্যে এটিও অবশ্য প্রয়োজনীয় বলিয়া গণ্য হয়।

(১৩) **রাষ্ট্রের নিকট আবেদনের অধিকার ঃ** ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত অভাব-অভিযোগ দূর করিবার জন্য রাষ্ট্রের নিকট আবেদন করার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের আছে। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং সভা-সমিতি করিবার স্বাধীনতা রাজনৈতিক অধিকারের মধ্যে পরিগণিত হয়।

Q. 5. *What do you mean by*
(a) Freedom of Speech ?
(b) Freedom of Press ?
(c) Right to public meeting ?

উঃ। (ক) জনসাধারণের সমক্ষে নিজের মতবাদকে স্বাধীনভাবে প্রকাশের অধিকারকে **"মতপ্রকাশের স্বাধীনতা"** বলা হয়। গভর্ণমেণ্টের পক্ষে রুচিকর না হইলেও সেই মতপ্রকাশের স্বাধীনতা প্রত্যেক নাগরিককে দেওয়া উচিত। সরকারী নীতি ও কার্য্যকলাপের সমালোচনা করিবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা তাহার থাকিবে। এইরূপ মতবাদ প্রকাশ ও সমালোচনার জন্য গভর্ণমেণ্ট তাহাকে শাস্তি দিতে পারিবে না।

অবশ্য মতপ্রকাশের স্বাধীনতার একটা সীমা আছে। মতপ্রকাশের স্বাধীনতার অর্থ এই নয় যে, প্রত্যেক ব্যক্তি খুসীমত অপরের বিরুদ্ধে অসৌজন্যমূলক অথবা অসম্মানকর উক্তি করিতে পারিবে। কোন নাগরিক এই স্বাধীনতার সুযোগ লইয়া রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ অথবা হিংসাত্মক কার্য্যকলাপের প্ররোচনা দিতে পারিবে না।

(খ) **মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতাও** নাগরিকদের পক্ষে একটি অবশ্য-প্রয়োজনীয় অধিকার। প্রত্যেক নাগরিককে তাহার বক্তব্য ছাপাইয়া প্রকাশ করার স্বাধীনতা দিতে হইবে। সংবাদপত্রগুলিকে সরকারের নীতিব সমালোচনার পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হইবে। কিন্তু মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতাব সীমা আছে। কোন নাগরিককে অন্যের বিরুদ্ধে অসৌজন্যমূলক অথবা অসম্মানজনক কিছু প্রকাশ করিবার স্বাধীনতা দেওয়া হয় না। অথবা কোন মতবাদ-প্রচারের মধ্য দিয়া হিংসাত্মক কার্য্যকলাপের আয়োজন রাষ্ট্র বরদাস্ত করে না।

(গ) **সভা-সমিতির স্বাধানতার** অর্থ হইতেছে এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তির যেমন নিজস্ব মতপ্রকাশের স্বাধীনতা থাকিবে, তেমনি কোন সাধারণ স্থানে শান্তিপূর্ণভাবে সমবেত হইবার অধিকারও থাকিবে। নিজের ভাব-ধারাকে প্রচার করিবার জন্য সমভাবাবলম্বীদের সঙ্গে সমিতি গঠনের অধিকার থাকিবে। কিন্তু অন্য অধিকারগুলির মত এই অধিকারেরও সীমা আছে। সভা-সমিতি করিয়া রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে কোনরূপ বিশৃঙ্খলা অথবা হিংসাত্মক কার্য্যেব প্ররোচনা চলিবে না। তাহা হইলে রাষ্ট্র ইচ্ছা করিলেই এই রকমের কোন সভা বা সমিতির কণ্ঠরোধ করিয়া দিতে পারিবে।

Q. 6. *"Rights imply duties." Explain.* (C. U. 1927, '31, '32, '52 ; U. P. 1940).

"It is in a world of duties that rights have significance." —Discuss and illustrate. (C. U. 1937).

উঃ। অধিকারের ব্যাখ্যা করিতে গেলেই দেখা যাইবে যে, প্রত্যেকটি অধিকার কোন কর্তব্যপালনের সহিত জড়িত। আমার নিজ সম্পত্তিভোগের অধিকার রহিয়াছে সন্দেহ নাই। ইহার অর্থ অন্যেরা আমার এই অধিকারে হস্তক্ষেপ করিবে না। ইহা তাহাদের কর্তব্য। সুতরাং আমি কতটুকু অধিকার ভোগ করিব, তাহা নির্ভর করিবে অন্য সমস্ত নাগরিকের কর্তব্য-পালনের উপর। আমার অধিকারের নিশ্চয়তা নির্ভর করে অপর সকলের কর্তব্যবোধের উপর। ঠিক তেমনিভাবে আমারও কর্তব্য রহিয়াছে অপরের কোন অধিকারে হস্তক্ষেপ না করা। অন্যের সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ না করা আমার কর্তব্য। যেহেতু রাষ্ট্র আমার অধিকার রক্ষা করে, সুতরাং রাষ্ট্রের প্রতি আমারও কর্তব্য আছে। আমার ক্ষমতা সম্পূর্ণ বিকাশের জন্য রাষ্ট্র আমাকে এই অধিকারগুলি দিয়াছে। আমারও কর্তব্য হইতেছে আমার ক্ষমতার সুষ্ঠু বিকাশ করা ও সমাজ-জীবনের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখা। এইভাবে প্রত্যেকটি অধিকারের সহিত কর্তব্য অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। আমার অধিকারের সহিত আমার এবং অন্য সমস্ত নাগরিকের কর্তব্য নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। সকলেই নিজেদের কর্তব্য ঠিকমত পালন করিলে সকলেরই অধিকার রক্ষিত হয়। সুতরাং নাগরিক অধিকার এবং কর্তব্য ইহাদের একটি বাদ দিয়া অপরটির কথা চিন্তা করা যায় না।

Q. 7. *What are the duties and obligations of a citizen?* (C. U. 1928, '29, '34, '35, '39, '40, '50; P. U. 1961).

What are the special responsibilities of a citizen in a self-governing community? (Bom. 1942)

What do the government expect from the citizens?

উঃ। প্রত্যেক নাগরিকের অধিকার তাহার ও অন্যের কর্তব্যবোধের উপর নির্ভর করে। নাগরিকের যেমন কতকগুলি অধিকার আছে, তেমনি অনেক কর্তব্যও রহিয়াছে। যদি সে কর্তব্যপালনে অবহেলা করে, তবে

অচিরেই তাহার অধিকার সঙ্কুচিত হইবে। যে বাষ্ট্রের নাগবিক নিজেব কর্ত্তব্য বিস্মৃত হয়, সে রাষ্ট্র সুশাসিত হইতে পারে না। সুতবাং নাগরিকদের অধিকার আলোচনাপ্রসঙ্গে তাহাদের কর্ত্তব্যেব দিকেও মনোযোগ দিতে হইবে। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি প্রত্যেক নাগবিকেব মৌলিক কর্ত্তব্যের

(ক) **আইনানুগত্য:** নাগরিকের প্রথম কর্ত্তব্য হইতেছে আইন মানিয়া চলা। যদি জনসাধারণ রাষ্ট্রেব নির্দ্দেশ মানিযা না চলে, তবে রাষ্ট্রেব পক্ষে জনস্বার্থের উন্নতিবিধান অসম্ভব হইবে।

(খ) **রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য:** প্রত্যেক নাগবিকেব পববর্ত্তী কর্ত্তব্য হইতেছে বাষ্ট্রেব প্রতি আনুগত্য স্বীকাব কবা। বাষ্ট্রেব প্রতি আনুগত্যেব অর্থ হইতেছে, প্রত্যেক নাগবিককে বৈদেশিক আক্রমণ হইতে দেশবক্ষা করিতে, প্রয়োজন হইলে যুদ্ধ কবিতে এবং জীবন বিসর্জ্জন দিতেও প্রস্তুত থাকিতে হইবে। কর্ত্তব্যনিরত সবকাবী কর্ম্মচাবীদেব কাজ সম্পূর্ণ সমর্থন করিতে হইবে।

(গ) **করদান:** বাষ্ট্রের কর্ত্তব্যপালনেব জন্য অনেক অর্থের প্রযোজন এবং প্রত্যেক নাগরিকেব কর্ত্তব্য হইতেছে সময়মর্ত নির্দ্দিষ্ট কব বাষ্ট্রকে দেওয়া।

(ঘ) **সততার সহিত নির্ব্বাচনে অংশগ্রহণ:** প্রত্যেক নাগবিকেব যেমন নির্ব্বাচনে অংশগ্রহণেব অধিকার আছে, তেমনি তাহাব কর্ত্তব্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে নির্ব্বাচিত কবা। ভোটবিক্রয়, অথবা অন্যায়ভাবে ভোট দেওয়াব অর্থ নাগরিকের কর্ত্তব্যের অবহেলা করা।

(ঙ) প্রত্যেক নাগবিকের কর্ত্তব্য নিজ নিজ সন্তানদেব উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া। দবকার হইলে বাষ্ট্রেব যে-কোন কর্ম্মে নিযুক্ত হওয়া এবং নিজেব কর্ত্তব্য, সততা এবং মনোযোগেব সহিত পালন কবাও প্রত্যেক নাগবিকেব উচিত।

(চ) কোন রাষ্ট্র যদি উন্নত হইতে চায়, তবে নাগরিকদের আলস্য, স্বার্থপরতা এবং উপদলীয় কলহ বর্জ্জন করা কর্ত্তব্য। প্রত্যেক নাগরিকের নিজ দেশ অথবা নগরের জন্য ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। আবার তাহাকে প্রত্যেক মুহূর্ত্ত সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে, যাহাতে গভর্ণমেণ্ট অসৎ বা স্বেচ্ছাচারী না হইয়া উঠে।

Q. 8. *How far do citizens enjoy civic rights in India ?*

উঃ। গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিক সাধারণভাবে যে সমস্ত পৌর এবং রাজনৈতিক অধিকার লাভ করে, ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টের পূর্ব্বে ভারতবর্ষের লোকেব এই সকল অধিকার প্রায়ই ছিল না। বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রে বহু নাগবিক অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। প্রথমতঃ, প্রত্যেককেই আইনের চক্ষে সাম্যতার অধিকার দেওযা হইয়াছে। জাতি-ধর্ম্মসমাজ-নির্ব্বিশেষে প্রত্যেককেই সমান অধিকার দেওযা হইযাছে। অস্পৃশ্যতা সম্পূর্ণ বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করা হইযাছে। প্রত্যেক নাগরিকেরই নিজ ক্ষমতা অনুযায়ী সবকারী কর্ম্মে নিযুক্ত হইবার অধিকাব আছে। দ্বিতীয়তঃ, ব্যক্তি-স্বাধীনতা স্বীকৃত হইযাছে। প্রত্যেক নাগরিকেরই বক্তৃতা দিবার স্বাধীনতা, সভা-সমিতি-গঠনের অধিকার ও দেশের মধ্যে স্বচ্ছন্দভাবে যাতাযাত ও বাস করিবার অধিকাব আছে। তৃতীয়তঃ, সকলেরই ধর্ম্মাচরণের স্বাধীনতা আছে। সংখ্যালঘিষ্ঠ-সম্প্রদায়ের ভাষা ও সংস্কৃতিরক্ষার অধিকার আছে। ক্ষতিপূরণ না দিয়া কাহাবও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা যাইবে না, অর্থাৎ সকলেরই সম্পত্তির অধিকার আছে। প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিককেই নির্ব্বাচনে অংশগ্রহণ করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে।

Q. 9. *What are the qualities of a good citizen ?*

উঃ। উত্তম নাগরিকের লক্ষণ কি কি? কোন্ কোন্ গুণ থাকিলে উত্তম নাগরিক বলা যায়? বিখ্যাত ইংরাজ লেখক ব্রাইসের মতে বুদ্ধি,

আত্মশাসন এবং বিবেক এই তিনটি গুণ না থাকিলে কেহই উত্তম নাগরিক হইতে পারে না।

বুদ্ধি ঃ উপযুক্ত বুদ্ধি না থাকিলে কেহই ঠিকমত নাগরিক কর্ত্তব্যপালন করিতে পারে না। বুদ্ধির সম্যক্ বিকাশের জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করা। ঠিকমত শিক্ষালাভ করিলে সাধারণের স্বার্থ হৃদয়ঙ্গম করার মত অনুভূতি তাহার হইবে। নাগরিককে এমনভাবে শিক্ষিত হইতে হইবে, যাহার ফলে ন্যায়কে অন্যায় হইতে পৃথক্ করিয়া দেখার এবং সকল বিষয়েই নিরপেক্ষভাবে বিচার করিবার ক্ষমতা তাহার জন্মায়।

আত্মশাসন ঃ নাগরিকের আত্মশাসনবোধ থাকা দরকার। নিজের কর্ত্তব্য বুঝিতে হইবে এবং কর্ত্তব্যকর্ম্ম স্বার্থবিরোধী হইলেও তাহা করিবার মত মনের জোর তাহার থাকা উচিত। নিজের ইচ্ছা, মনোবৃত্তি অথবা স্বার্থ-ত্যাগ করিয়া সাধারণের মঙ্গলের জন্য যে কাজ তাহাই করিবার উপযুক্ত শক্তি তাহার থাকিবে। নিজের মতবিরুদ্ধ হইলেও সংখ্যাগরিষ্ঠদের মতকে মানিয়া চলা প্রয়োজন। যখনই দেশের স্বার্থ ও তাহার নিজের স্বার্থের মধ্যে সংঘাত উপস্থিত হয়, তখন আত্মস্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়াও সাধারণের স্বার্থের উন্নতিবিধানকেই আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করার মত শিক্ষা ও আত্মশাসন প্রত্যেক নাগরিককে অর্জ্জন করিতে হইবে।

বিবেক ঃ নাগরিকের কঠোর কর্ত্তব্যবোধ থাকা উচিত। বিশ্বস্ততার সহিত প্রত্যেক কর্ত্তব্য সম্পাদন করা, যথাসময়ে নিয়মিতভাবে কর দেওয়া এবং খুব সততার সহিত ভোট দেওয়া তাহার উচিত। নিজের সর্ব্ব চেষ্টা প্রযোগ করিয়া সরকারকে সাহায্য করার জন্য তাহার প্রস্তুত থাকা উচিত। দোষী ব্যক্তির দণ্ডবিধানের নিমিত্ত রাষ্ট্রের কর্ম্মে নিযুক্ত পুলিশবাহিনীর সহায়তা করা উচিত। রাষ্ট্রের কর্ম্মচারীদের কার্য্যেও সর্ব্বপ্রকার সহায়তা করা প্রত্যেক নাগরিকের কর্ত্তব্য। সর্ব্বসাধারণের মঙ্গলবিধানের জন্য ত্যাগ স্বীকার এবং কষ্টবরণের জন্য তাহাকে প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

"শ্রেষ্ঠ নাগরিক আমরা তাহাকেই বলিব, যাহার জনগণের মঙ্গলাত্মক বিষয়গুলি বিচার করার ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন কর্ম্মে উপযুক্ত লোক নির্ণয় করার মত বুদ্ধি আছে, সংখ্যাগরিষ্ঠের মতবাদ মানিয়া লইবার মত আত্মশাসন আছে, ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত স্বার্থের উর্দ্ধে সাধারণের স্বার্থকে বড় করিয়া দেখিবার সাহস আছে এবং সর্ব্বসাধারণের মঙ্গলার্থে সর্ব্বপ্রকার দুঃখকে বরণ করিয়া লইবার মত জনহিতপ্রবৃত্তি আছে।"

Q. 10. (*a*) *What are the hindrances to good citizenship?* (C. U. 1928, '31, '40, '55 ; U. P. 1938)

উঃ। (a) কি কি দোষ থাকিলে ভাল নাগরিক হওয়া যায় না? এই দোষগুলিকে সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে ফেলা হয়—উদ্যমহীনতা, স্বার্থপরতা এবং দলীয় মনোবৃত্তি।

উদ্যমহীনতা ঃ নাগরিক উদ্যমহীন হইলে তাহার মনে সর্ব্বসাধারণের বিষয়ে উপেক্ষা জন্মে। সর্ব্বসাধারণের যাহা কর্ত্তব্য, প্রত্যেকেই ভাবে অন্যেরা তাহা করিবে। ফলে নাগরিকেরা কর্ত্তব্য পালন করে না, ভোটদানে অবহেলা করে; এবং এমন কি, প্রয়োজনের সময় দেশের জন্য যুদ্ধ করিতেও বিমুখ হয়। বন্ধুবান্ধব অথবা পূজনীয় ব্যক্তিদের মতামতকে অন্ধের মত অনুসরণ করাটাই তাহাদের স্বভাব হয়। রাষ্ট্রের আয়তন যতই বৃদ্ধি পাইতেছে, এই ধরণের উদ্যমহীনতা ততই বাড়িতেছে। প্রত্যেকের মনে একটি ধারণা হইয়াছে যে, বহুর মধ্যে সে একজন মাত্র, এবং তাহার নিজস্ব মতবাদে কিংবা ভোটে কিছু যায় আসে না। এই মনোবৃত্তির আরও একটি কারণ আছে। অনেকেই রাজনীতিতে কোন উৎসাহ পায় না এবং সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান, খেলাধুলা, ব্যবসায় প্রভৃতির আকর্ষণই বেশী বোধ করে। পৌরবিষয়ে এরূপ বহুধাবিস্তৃত অবহেলা থাকিলে সুশাসন অসম্ভব হইয়া উঠে। নাগরিকদের চিত্তে এই পৌরমনোবৃত্তি যখন ঝিমাইয়া পড়ে, শাসনব্যবস্থা তখন বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে ও স্বাধীনতা বিপন্ন হয়।

ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত স্বার্থঃ ইহা জনসাধারণকে অনেক দিক দিয়াই দূষিত করে। স্বার্থপর মনোবৃত্তি দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া খ্যাতি এবং রাজকার্য্যের মোহে নাগরিক অনেক সময় কুকার্য্যে লিপ্ত হয়। ভোটদাতাদের অনেক সময়ই অর্থ দিয়া কিনিয়া লওয়া হয় এবং কর-দান ব্যাপারে রাষ্ট্রকে ফাঁকি দিবার চেষ্টা করা হয। সরকারের উচ্চ পদগুলি কেবলমাত্র নিজেদের সমর্থকদের মধ্যেই বিলি করা হয়, যদিও অনেক সময়ই তাহারা সেই পদের উপযুক্ত হয় না।

দলীয় মনোবৃত্তিঃ গণতান্ত্রিক-রাষ্ট্রে রাজনৈতিক দলগুলি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। কিন্তু এই দলগুলির যখন পতন হয তখন উপকার অপেক্ষা ক্ষতিই বেশী হয়। ইহার ফলে অনেক সময়ই অকথ্য এবং অশোভন দলাদলির সৃষ্টি হয। দলীয় স্বার্থের উন্নতির আশায় জাতীয় স্বার্থকে বিসর্জ্জন দেওয়া হয়।

(*b*) *How are they operative in India?* (C. U. 1955)

উঃ। ভারতবর্ষের নাগরিকদের মধ্যেও উদ্যমহীনতা, স্বার্থপরতা ও দলাদলির মনোবৃত্তি যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যায়। সাধারণ নির্ব্বাচনে যত সংখ্যক ভোটদাতার ভোট দেওয়া উচিত, তাহার চেয়ে অনেক কম ভোট-দাতাই ভোট দেন। অবশ্য শিক্ষার অভাবে অনেক দোষ আসিয়া যায় সন্দেহ নাই। আশা করা যায় যে, দেশের মধ্যে শিক্ষার প্রসার বাড়িলে ক্রমে ক্রমে সাধারণ ব্যাপারসম্বন্ধীয় উদাসীনতা কমিয়া যাইবে। উপযুক্ত শিক্ষা পাইলে বাকী দুইটি দোষও কমা উচিত।

অষ্টম অধ্যায়

আইন, স্বাধীনতা এবং সাম্য

Q. 1. *Define Law.* (C. U. 1928, '39 ; U. P. 1936)

"Law is generally defined as the command of the Sovereign." *Discuss.* (C. U. 1953)

উঃ। জনসাধারণের কার্য্যনিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে এবং তাহাদের অধিকার ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধীয় যে সমস্ত নিয়ম প্রচলিত এবং রাষ্ট্র-কর্তৃক স্বীকৃত আছে, তাহাদের আইন বলা হয়। রাষ্ট্র এই সমস্ত নিয়মের রক্ষক। অর্থাৎ কেহ এই নিয়ম বা আইন ভঙ্গ করিলে রাষ্ট্র তাহাকে শাস্তি দেয়। এই সমস্ত নিয়ম প্রচলিত রীতিনীতি হইতে উদ্ভূত হইতে পারে অথবা আইনসভা কর্তৃক প্রবর্ত্তিত হইতে পারে। সরকার যে নিয়মগুলিকে বলবৎ রাখে তাহাকে আইন বলা হয়। রাষ্ট্রের একটি প্রধান কার্য্য হইল আইনের প্রবর্ত্তন করা এবং বহাল রাখা।

Q. 2. *Discuss the relation between law and morality.*

উঃ। আইন এবং নীতিশাস্ত্রের মধ্যে একটি নিকট সম্পর্ক আছে। নীতিশাস্ত্র যাহা নিষেধ করে, প্রচলিত আইনকানুনও তাহার উপর বিধিনিষেধ আরোপ করে। যে সমস্ত কার্য্য নীতিবিগর্হিত বলিয়া গণ্য হয়, রাষ্ট্র আইন দ্বারা তাহার অনেকগুলিই বন্ধ করিয়া দেয়। চুরি করা যেমন নীতিবিগর্হিত বলিয়া গণ্য হয়, তেমনি আইনের চক্ষেও তাহা অবৈধ। কেহ নিজ ইচ্ছাকৃত চুক্তি ভঙ্গ করিবে, কোন নীতিশাস্ত্রই তাহা অনুমোদন করে না। আবার চুক্তি অবহেলা করাও আইনবিরুদ্ধ কাজ। সেইরূপ ব্যভিচার যেমন নীতিবিগর্হিত, তেমনি অবৈধ। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, নীতিশাস্ত্রে যাহা অন্যায় বলিয়া গণ্য—আইনও তাহা অবৈধ বলিয়া মনে করে। এইজন্য

অনেক সময়ে আইনকে নৈতিক নিয়মাদির প্রতিচ্ছবি বলা হয়। নীতিশাস্ত্রের বাধানিষেধ আইনের বাধানিষেধ হইয়া দাঁড়ায়।

আইন এবং নীতিশাস্ত্রের মধ্যে সাদৃশ্যও যেমন আছে, পার্থক্যও তেমনি অনেক রহিয়াছে। (১) আইন শুধু মানুষের বাহিরের কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু নীতিশাস্ত্র শুধু বাহিরের কাজ নয়, মানুষের চিন্তাধারা এবং অন্তরের অভিপ্রায়ও নিয়ন্ত্রণ করিতে চাহে। মানুষের চিন্তাধারা বাহিরে প্রকাশ না হওয়া পর্য্যন্ত আইনের চক্ষে কোন শাস্তিবিধান করা হয় না। অকৃতজ্ঞতার জন্য আইন কাহাকেও শাস্তি দিবে না, কিন্তু অকৃতজ্ঞতা নীতিশাস্ত্রের মতে দূষণীয় অপরাধ। অনেক বিষয়ে নীতিশাস্ত্রের বারণ থাকিলেও আইনে তাহা বারণ করা হয় নাই। (২) আইনভঙ্গকারীকে রাষ্ট্র শাস্তি দেয়, কিন্তু নৈতিক অনুশাসন ভঙ্গ করিলে তাহাকে কেহ দিবে না। কিন্তু কেহ আইন অগ্রাহ্য করিলে রাষ্ট্র তাহার শাস্তির ব্যবস্থা করিবে। (৩) এমন কতকগুলি কার্য্য আছে যাহা নীতিবিগর্হিত নয়, কিন্তু আইনের চক্ষে তাহা অবৈধ বলিয়া গণ্য। কেহ যদি রাস্তার বাঁদিকে মোটর গাড়ী না চালায়, আইন তাহাকে দণ্ড দিবে। কিন্তু নীতির দিক দিয়া তাহা নিন্দনীয় নহে।

Q. 3. *Explain the term, "Liberty".* (C. U. 1926, 1950, 1951, Burd.

Comment on the statement, "Restraints are necessary for the enjoyment of liberty." (U. P. 1941)

উঃ। অন্যের ক্ষতি না করিয়া নিজের খুসীমত যে কোন কাজ করার অধিকারের নামই হইল স্বাধীনতা। সাধারণ লোকে স্বাধীনতা অর্থে লোকের খুসীমত যে কোন কাজ করার অধিকার বুঝে। কিন্তু সেইরূপ নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা বলিতে কিছু নাই। আমার যদি চলাফেরার নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা থাকে, তাহার অর্থ হইবে আমার খুসীমত আমি যে কোন স্থানে, অথবা যে কোন সময় আমার প্রতিবেশীর বাড়ীর মধ্যে যাইতে পারি। তখন আমার স্বাধীনতার অর্থ

হইবে অপরের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা। সুতরাং সকলে যাহাতে স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারে, সেইজন্য সকলের উপর কিছু বিধিনিষেধ রাখা প্রয়োজন। এইজন্যই স্বাধীনতা বলিতে কেবলমাত্র বিধিনিষেধের অভাবই বুঝায় না। লোকের কার্য্যের উপর প্রয়োজনীয় বিধিনিষেধ আবোপ করিলেই তবে প্রকৃত স্বাধীনতা থাকে। প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার ব্যক্তিত্বের স্ফূর্ত্তি প্রকাশেব জন্য প্রয়োজনীয় অধিকার এবং সুযোগ-সুবিধা দিলেই প্রকৃতই স্বাধীনতা মিলিবে। কোন বিধিনিষেধের অভাব মানেই স্বাধীনতা নয়। স্বাধীনতা বলিতে বুঝায নিজ নিজ গুণের শ্রেষ্ঠ বিকাশের জন্য নাগরিকের যে সমস্ত অধিকারের প্রযোজন তাহার সংরক্ষণ।

Q. 4. *What are the different kinds of liberty? Explain fully civil and political liberty with illustrations.* (C. U. 1927, 1928, 1932, 1942, 1950)

উঃ। স্বাধীনতার বিভিন্ন রূপ বা প্রকাশ রহিযাছে :—যেমন (১) নাগরিক স্বাধীনতা, (২) রাজনৈতিক স্বাধীনতা, এবং (৩) জাতীয় স্বাধীনতা।

(১) **নাগরিক স্বাধীনতা :** অপব ব্যক্তি এবং রাষ্ট্রের অসঙ্গত হস্তক্ষেপেব বিরুদ্ধে যে সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকে, তাহাকে নাগাবক স্বাধীনতা বলে। দৈহিক স্বাধীনতা, সম্পত্তি উপভোগের স্বাধীনতা, চলাফেরার স্বাধীনতা, আইনের চক্ষে সাম্য, বিবেকের স্বাধীনতা প্রভৃতি নাগরিক স্বাধীনতার অন্তর্ভুক্ত। নিজের বিশ্বাসমত ধর্ম্মমত পোষণের স্বাধীনতাও ইহার অন্তর্ভুক্ত। রাষ্ট্রের রাজশক্তি এই সমস্ত অধিকার সংরক্ষণের ভার গ্রহণ করে।

(২) **রাজনৈতিক স্বাধীনতা :** রাজনৈতিক স্বাধীনতার অর্থ হইল দেশের শাসনকার্য্যে প্রত্যেক ব্যক্তির অংশগ্রহণের অধিকাব। অর্থাৎ গণতন্ত্র এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতা এক জিনিষকেই বুঝায়। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা, সংগঠনের স্বাধীনতা এবং সরকারী কর্ম্মে যোগদানের অধিকার প্রভৃতি রাজনৈতিক স্বাধীনতার অন্তর্ভুক্ত।

নাগরিক স্বাধীনতার অর্থ অসঙ্গত হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রশক্তির সংরক্ষণ। আর রাজনৈতিক স্বাধীনতার অর্থ হইল রাষ্ট্রশক্তির পরিচালনায় অংশগ্রহণ। সমস্ত নাগরিকই প্রথমোক্ত স্বাধীনতা উপভোগ করে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে অনেকেরই (যেমন, নাবালক, বিকৃতমস্তিষ্ক ব্যক্তি, কোন কোন রাষ্ট্রে স্ত্রীলোক) রাজনৈতিক স্বাধীনতা নাই।

(৩) **জাতীয় স্বাধীনতা ঃ** অপর জাতির শাসনমুক্ত জাতীয় স্বাতন্ত্র্যের নাম হইল জাতীয় স্বাধীনতা। কোন সম্প্রদায় যখন বৈদেশিক অনুশাসনমুক্ত এবং সার্ব্বভৌমশক্তিসম্পন্ন হয়, তখনই তাহাকে জাতীয় স্বাধীনতার অধিকারী বলা হয়।

Q. 5. *Explain fully the idea contained in the following :*

"The recognition of political authority is the indispensable condition of liberty." (C. U. 1926, 1929, 1951)

Indicate the relation between law and liberty. (C. U. 1953)

"Civil Liberty is not absence of restraints but an opportunity for self-realisation." (C. U. 1949)

"Law is the condition of liberty."—Amplify. (C. U. 1932, '33, '35, '37, '39, '40)

How far is sovereignty consistent with individual liberty ? (C. U. 1952)

উঃ। অনেকের ধারণা যে, নিজের খুসীমত সব কিছু করার অধিকারই স্বাধীনতা। কিন্তু রাষ্ট্র এবং তাহার অনুশাসন অর্থাৎ আইন-কানুন নাগরিক কার্য্যকলাপের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করে। এইজন্য তাহাদের মতে স্বাধীনতা এবং রাজনৈতিক কর্ত্তৃত্বের মধ্যে একটা বিরোধ আছে। রাষ্ট্রের প্রণীত আইন-কানুন অনেক সময়েই কতকগুলি কার্য্যকলাপ নিষিদ্ধ করিয়া

দেয। সমস্ত আইন-কানুন এইভাবে ব্যক্তি-স্বাধীনতার বিধিনিষেধ আরোপ করে। এইজন্য অনেকে মনে করেন যে, রাষ্ট্রের অনুশাসন বা আইন ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে খর্ব্ব করে।

কিন্তু এ মত সত্য নয়। স্বাধীনতা বলিতে সর্ব্বপ্রকার বাধার অভাব বুঝায় না। স্বাধীনতার অর্থ এই নয় যে, লোক নিজের খুসীমত যে কোন কাজ করিতে পারিবে। সমাজে এরূপ নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা থাকিতে পারে না। যদি প্রত্যেকে নিজের ইচ্ছামত কাজ করার অধিকারী হয় তবে ইহার ফল হইবে দুর্ব্বলের উপর সবলের অত্যাচার। সেই দেশে একমাত্র বিত্তশালী এবং বলশালী ব্যক্তিই স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারিবে। দুর্ব্বল এবং দরিদ্রের স্বাধীনতা বলিতে কিছুই থাকিবে না। কার্য্যতঃ এরূপ স্বাধীনতা সকলের জন্য থাকিতেই পারে না। যদি তাহা থাকিত, তবে হত্যাকারী অথবা ডাকাতকে কোনরকম শাস্তি দেওয়া যাইত না।

সুতরাং সকলেই যাহাতে সমান অধিকার লাভ করিতে পারে, সেইজন্য সমাজে এমন একটি প্রতিষ্ঠান থাকা প্রয়োজন যাহার কাজ হইবে ধনী এবং বলশালী ব্যক্তির হস্ত হইতে দরিদ্র এবং দুর্ব্বলকে রক্ষা। এই প্রতিষ্ঠানটি হইল রাষ্ট্র। সুতরাং রাষ্ট্রই সর্ব্বসাধারণের স্বাধীনতার রক্ষাকর্ত্তা। প্রত্যেক নাগরিক যাহাতে স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারে, রাষ্ট্র সেই ব্যবস্থা করে। সুতরাং রাষ্ট্রের অবস্থিতির উপরই সকলের প্রকৃত স্বাধীনতা নির্ভর করে। রাষ্ট্র না থাকিলে স্বাধীনতা রক্ষা অসম্ভব। রাষ্ট্রকে বাদ দিয়া একমাত্র যাহা সম্ভব তাহা হইল অরাজকতা এবং বিশৃঙ্খলা। সুতরাং রাষ্ট্রের অস্তিত্বই হইল স্বাধীনতার অবশ্য-প্রয়োজনীয় সর্ত্ত।

আইন প্রণয়ন করিয়া রাষ্ট্র সকলের জন্য স্বাধীনতা সৃষ্টি করে এবং তাহার সীমা নির্দ্দেশ করে। আইন প্রণয়ন করিয়া রাষ্ট্র অপরের সমরূপ অধিকার ক্ষুণ্ণ না করিয়াও কি উপায়ে প্রত্যেক নাগরিক তাহার অধিকার ভোগ করিবে তাহার বিধান করে, এবং অন্যের স্বাধীনতা লঙ্ঘন করিলে, কি

উপায়ে তাহার শাস্তিবিধান হইবে সকলকে তাহা জানাইয়া দেয়। স্বাধীনতার নির্ভর হইল রাষ্ট্রের আইন-কানুন; আইন ব্যতীত স্বাধীনতা অসম্ভব। স্বাধীনতা ধ্বংস করা দূরে থাকুক, আইনই স্বাধীনতার স্রষ্টা এবং রক্ষক।

Q. 6. ***What are the safeguards to liberty in a modern democratic state? To what extent, if at all, do they exist in India?*** (C. U. 1944 ; Burd. U. 1961)

উঃ। স্বাধীনতাকে সর্ব্বদাই গণতন্ত্রের প্রহরীরূপে গণ্য করা হয়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতা জনগণের হস্তে ন্যস্ত। এইজন্য অন্য যে-কোন শাসনতন্ত্র অপেক্ষা গণতন্ত্র নাগরিকদের অধিক স্বাধীনতা দান করে। কিন্তু যদিও সমস্ত ক্ষমতার মালিক জনগণ, তথাপি কার্য্যতঃ এই ক্ষমতা পরিচালনা করেন অল্পসংখ্যক ব্যক্তি—যাঁহারা গভর্ণমেণ্ট গঠন করেন। এই অল্পসংখ্যক ব্যক্তি জনগণের ন্যস্তবিশ্বাসের অবমাননা করিতে পারেন ও অত্যাচারী হইয়া উঠিতে পারেন। সুতরাং স্বাধীনতা রক্ষার জন্য কয়েকটি বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা আছে।

প্রথমতঃ, এই উদ্দেশ্যে শাসনতন্ত্রে একটি মৌলিক অধিকারের তালিকা অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই তালিকায় নাগরিকদের প্রয়োজনীয় অধিকারের নির্দ্দেশ দেওয়া থাকে। এই সমস্ত অধিকারকে লঙ্ঘন করিলে উপযুক্ত শাস্তি দিবার ব্যবস্থা থাকে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর জার্মান রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রে এইরূপ একটি নাগরিক অধিকারের তালিকা ছিল। কিন্তু হিটলারের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে এই অধিকারগুলি বাতিল করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। শাসনতন্ত্রে মৌলিক অধিকারের তালিকা অন্তর্ভুক্ত করিলেও নাগরিক স্বাধীনতার সুনিশ্চয়তা থাকে না।

দ্বিতীয়তঃ, কোন কোন লেখক মনে করেন যে, সরকারের কার্য্যাবলীর পৃথকসাধন করিয়া বিভিন্ন প্রতিনিধিবৃন্দের হস্তে পৃথক ক্ষমতা অর্পণ করিলে

স্বাধীনতার হানি ঘটিবে না। রাষ্ট্রক্ষমতার এই বিভিন্নকরণ এক সময়ে নাগরিক স্বাধীনতার পক্ষে অবশ্য-প্রয়োজনীয় বলিয়া গণ্য করা হইত। কিন্তু ক্ষমতার এইরূপ সম্পূর্ণ বিচ্ছেদসাধন কার্য্যক্ষেত্রে সম্ভব নয়, আর কাম্যও নয়। আসলে স্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্য এই ব্যবস্থার প্রয়োজন নাই। ইংলণ্ডে এইভাবে রাষ্ট্রক্ষমতার বিভিন্নকরণ হয় নাই, অথচ ইংলণ্ডের জনসাধারণ অন্য যে কোন রাষ্ট্রের জনসাধারণ অপেক্ষা কম স্বাধীনতা ভোগ করে না। স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যাহা প্রয়োজন তাহা হইল বিচার-বিভাগের স্বাধীনতা। ব্যক্তি-স্বাধীনতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রক্ষী হইল একটি স্বাধীন এবং শক্তিশালী বিচারবিভাগ। গভর্ণমেণ্ট অবৈধভাবে নাগরিকের অধিকারে হস্তক্ষেপ করিলে নির্ভীক বিচারপতি তাহার দণ্ডবিধান করিবেন।

তৃতীয়তঃ, স্বাধীনতার আসল রক্ষাকবচ হইতেছে একটি সতর্ক জনমত যাহা নাগরিক স্বাধীনতার উপর কোন হস্তক্ষেপকেই মানিযা লইবে না। ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্রে কোন নাগরিক অধিকারের তালিকা নাই। রাষ্ট্রের ত্রিশক্তিকে পৃথকীকরণ করা হয় নাই। কিন্তু ইংলণ্ডের জনসাধারণ পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে। তাহার কারণ ইংলণ্ডে একটি সদাজাগ্রত জনমত রহিয়াছে। জনমত শুধু জাগ্রত হইলেই চলিবে না, তাহাকে উদারও হইতে হইবে। সর্ব্বপ্রকার মতভেদকে মানিয়া লইবার মত উদারতা নাগরিকদের থাকা উচিত।

চতুর্থতঃ, রাষ্ট্রে একটি স্বাধীন মুদ্রাযন্ত্রের অবস্থান স্বাধীনতার সতর্ক প্রহরীরূপে কাজ করে। এইজন্য প্রত্যেক স্বেচ্ছাচারী শাসক রাষ্ট্রক্ষমতা হস্তে লইয়াই দেশের মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতাকে কঠিন হস্তে দমন করিয়াছেন।

ভারতবর্ষ এখন স্বাধীন হইয়াছে। তাহার শাসনতন্ত্রে স্বাধীনতার সতর্ক প্রহরীরূপে মৌলিক অধিকারের তালিকা প্রভৃতি অনেক ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে।

নবম অধ্যায়

জনমত

Q. 1. *What is meant by Public Opinion?* (C. U. 1929, 1945, 1950, 1952 ; Burd. U. 1961)

উঃ। জনমত বলিতে সাধারণ বিষয় সম্বন্ধে জনগণের মতকে বুঝায়। জনমত শাসন করিতে হইলে প্রত্যেক লোককেই যে একমতাবলম্বী হইতে হইবে তাহা নহে। ইহা কখনও সম্ভব নয়। সাধারণতঃ অধিকাংশ লোকের মতকেই জনমত বলে। দেশের অধিক সংখ্যক লোক যদি কোনও একটি বিষয়ে একটি মত পোষণ করে তবেই সে মতকে জনমত বলা হয়। অবশ্য অপ্রয়োজনীয় অংশগুলিতে মতানৈক্য থাকিতে পারে। আসল বিষয়ে মতের ঐক্য থাকিলেই চলিবে। কিন্তু ইহা বলা প্রয়োজন যে, জনমত বলিতে সব সময়ে অধিকাংশের মতকে বুঝায় না। সমাজের অধিকাংশ লোকের হয়ত একটি বিষয়ে কোন সুস্পষ্ট মত না থাকিতে পারে। এইরূপ অবস্থায় জনসাধারণের সর্ব্বাপেক্ষা প্রভাবশালী লোকসমষ্টির মতই জনমত বলিয়া গণ্য হয়।

Q. 2. *What are the chief agencies which mould public opinion in modern times? Discuss the strength and limitation of these agencies.* (C. U. 1945, 1953, 1954 ; Burd. U. 1961 ; U. P. 1936, 1940)

উঃ। দেশের জনমত গঠনের প্রধান উপাদান হইল (১) মুদ্রাযন্ত্র, (২) সভাসমিতি, (৩) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, (৪) রাজনৈতিক দল, (৫) বেতারবার্ত্তা ও চলচ্চিত্র এবং (৬) আইনসভা।

(১) **মুদ্রাযন্ত্র** ঃ—জনমত-গঠনে মুদ্রাযন্ত্র একটি বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ

করে। সংবাদপত্রগুলি আধুনিক খবর এবং সংবাদাদি সরবরাহ করে, এবং এইরূপে ঐ সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে পাঠকদের মতামত-গঠনে সহায়তা করে। সংবাদপত্রগুলি প্রয়োজনীয় ঘটনা সম্বন্ধে নিজেদের মতামত প্রকাশ করে। এইরূপে তাহারা জনমত সৃষ্টি করিতে এবং উহাকে প্রভাবান্বিত করিতে চেষ্টা করে। সংবাদপত্রের মারফতই নাগরিকগণ সরকারী নীতি সম্বন্ধে নিজেদের মতামত প্রকাশ করিতে পারে। সংবাদপত্রের প্রভাব এত বেশী যে, ইংলণ্ডে তাহাকে রাজ্যের "চতুর্থ শক্তি" আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

মুদ্রাযন্ত্রের দ্বারা যদি আমবা যথাযথভাবে কাজ পাইতে চাই, তবে তাহার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে। সংবাদপত্রগুলি সরকারী নিয়ন্ত্রণমুক্ত থাকিলেই চলিবে না, ধনী ব্যক্তি অথবা শ্রেণীস্বার্থের নিয়ন্ত্রণ হইতেও মুদ্রাযন্ত্রকে মুক্ত রাখিতে হইবে। সরকারী কার্য্যের সমালোচনার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা এবং জনস্বার্থের প্রযোজনীয় যে কোন সত্য এবং ন্যায্য তথ্য সমালোচনা ও প্রকাশ কবিবার সম্পূর্ণ অধিকার মুদ্রাযন্ত্রেব থাকিবে। ধনী মালিকদের প্রভাবে পড়িয়া কেবলমাত্র এক তরফা সংবাদ পরিবেশন করিয়া সংবাদ-পত্রগুলি জনসাধারণকে ভ্রান্তপথে পবিচালিত করিলে কুফল হইবে।

(২) **সভা-সমিতি** ঃ—জনমত-গঠনেব আর একটি উপাদান হইল সভা-সমিতি। শক্তিশালী বক্তাগণ বিশিষ্ট ঘটনাবলীর পক্ষে এবং বিপক্ষে যুক্তির অবতারণা করিয়া বক্তৃতা করেন। এইভাবে সভা-সমিতির মারফত জনসাধারণ শিক্ষালাভ করে। ভারতবর্ষের মত দেশে, যেখানে অধিকাংশ লোক নিরক্ষর এবং সংবাদপত্র পাঠ করিতে পারে না, সেখানে এই পদ্ধতিটি জনমত-গঠনের পক্ষে অধিক উপযোগী।

(৩) **শিক্ষালয়সমূহ** ঃ—স্কুল ও কলেজ প্রভৃতি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই ভবিষ্যৎ নাগরিক ছাত্রদের মনের গঠন হয। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছাত্রদের মানসিক উৎকর্ষ-সাধন করে এবং প্রযোজনীয় সমস্যা সম্বন্ধে নিজস্ব মতামত গঠনের সহায়তা করে। স্কুল এবং কলেজ প্রাঙ্গণে ছাত্রদের মনে যে ধারণা বদ্ধমূল

হয়, তাহার দ্বারাই ভবিষ্যতে তাহাদের জীবন অনেক পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হয়। এইজন্য জার্মানীতে নাৎসীরা নিজেদের হস্তে সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণভার রাখিয়াছিল।

(৪) **রাজনৈতিক দল**ঃ—রাজনৈতিক দলগুলি নিজেদের সপক্ষে জনসাধারণের মধ্যে প্রচারকার্য্য চালায়। ফলে, জনসাধারণ একটি সমস্যার বিভিন্ন দিক জানিতে পারে।

(৫) **বেতারবার্ত্তা ও চলচ্চিত্র**ঃ—জনমত গঠনের পক্ষে এই দুইটি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। ভারতবর্ষ প্রধানতঃ নিরক্ষর দেশ বলিয়া বেতারবার্ত্তা এবং চলচ্চিত্র মারফত বহুসংখ্যক লোককে শিক্ষা দেওয়া যায়।

(৬) **আইনসভা**ঃ—সাধারণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি লইয়া আইনসভা গঠিত। সেইজন্য আইনসভা জনমত-প্রকাশের একটি বিশেষ প্রযোজনীয় উপাদান।

Q. 3. *Discuss the influence of public opinion on the policy of the government and legislature.* (C. U. 1929, 1930, 1952)

What part does public opinion play in a modern state ? (C. U. 1936, 1950)

উঃ। বর্ত্তমানকালে শাসনতন্ত্র বা সরকারের উপর জনমতের প্রভূত প্রভাব রহিয়াছে। সব শ্রেণীর গভর্ণমেণ্টের স্থায়িত্ব ও ক্ষমতা জনমতের উপর নির্ভর করে। এমন কি স্বেচ্ছাচারী শাসককেও জনমত সম্বন্ধে সতর্ক থাকিতে হয়। এইজন্য মুসোলিনী এবং হিট্লারের গভর্ণমেণ্ট নিজ নিজ নীতির সপক্ষে জনমত গঠনের জন্য জনসাধারণের মধ্যে অনবরত প্রচারকার্য্য চালাইত। আধুনিককালের গণতান্ত্রিক সরকার জনসাধারণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা পরিচালিত। সরকারী নীতি স্থির করা এবং আইন-প্রণয়নের পূর্ব্বে প্রতিনিধিগণ দেশের জনমত সম্বন্ধে ভাবিয়া কাজ করে।

প্রত্যেক প্রতিনিধির মনেই পুনরায় নির্ব্বাচিত হইবার ইচ্ছা থাকে। যদি তিনি জনমতের বিপক্ষে কোন কাজ করেন, তবে তাঁহার পুনর্নির্ব্বাচনের আশা খুবই কম। এইজন্য প্রতিনিধিদের জনমত সম্বন্ধে সচেতন থাকিতে হয়। সরকার সর্ব্বদাই দেশের জনমত অনুযায়ী নীতি গ্রহণ করে। জনসাধারণের অধিকাংশই যে আইনের বিরুদ্ধে, সেরূপ কোন আইনের প্রবর্ত্তন করা সম্ভব নয়। সেজন্য জনমত যে নীতির বিরোধিতা করে, সরকার তাহা পরিহার করিয়া চলে।

Q. 4. *"Successful administration in a modern state depends largely upon the way in which public opinion is formed and expressed."—Explain.* (C. U. 1938)

"An alert and intelligent public opinion is the first essential of democracy."—Discuss. (U. P. 1943)

উঃ। গণতান্ত্রিক সরকারের ভিত্তি জনমতের উপর, এবং গণতান্ত্রিক সরকারের সাফল্যের জন্য প্রয়োজন একটি সতর্ক জনমতের। নাগরিকগণ যখন স্বাধীনভাবে চিন্তা করে এবং কেবলমাত্র দেশের স্বার্থের কথা ভাবিয়া মতামত পোষণ করে, কেবলমাত্র তখনই গণতন্ত্র সার্থক হইয়া উঠে। কিন্তু জনসাধারণ যদি দেশের সমস্যা সম্বন্ধে উদাসীন অথবা অজ্ঞ থাকে, যদি তাহারা কেবলমাত্র নিজেদের স্বার্থকে বড় করিয়া দেখে, তবে গণতন্ত্র কিছুতেই সার্থক হইতে পারে না। এইজন্য জনসাধারণের মধ্যে উপযুক্ত পৌরচেতনাবোধ জাগরণের প্রয়োজনীয়তা আছে।

যে সমস্ত সংগঠনের মারফত জনমত গঠিত হয়, তাহারা হয়ত কলুষিত হইতে পারে। মুদ্রাযন্ত্র, সভা-সমিতি এবং অন্যান্য সংগঠনগুলিকে স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক দল নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করিতে পারে। ধনীরা বিখ্যাত সংবাদপত্রগুলি ক্রয় করিয়া নিজেদের সুবিধা অনুযায়ী একতরফা সংবাদ

পরিবেশন করিতে পারে। নিজেদের স্বার্থে আঘাত লাগে এরূপ কোন সংবাদ একেবারে ছাপিতে না দিতে পারে। এইভাবে দেশের জনমত বিপথে চালিত হইবার আশঙ্কা থাকে। উপযুক্ত শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করিয়া এই সমস্ত ত্রুটি দূর করা যায়।

দশম অধ্যায়

দলব্যবস্থা

Q. 1. *Define a party.* (C. U. 1951, C. U. Pre-Univ. 1961; Burd. U. 1961)

Distinguish between a party and a faction. (C. U. 1955; U. P. 1942)

উঃ। দেশের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলি সম্বন্ধে সমমতাবলম্বী একদল নাগরিক যে রাজনৈতিক সমিতি গঠন করে;-তাহাকে রাজনৈতিক দল বলা হয়। গণতন্ত্রেই রাজনৈতিক দল দেখা যায়, এবং দল ব্যতীত গণতান্ত্রিক সরকারের সুষ্ঠু পরিচালনা অসম্ভব হয়।

স্বাভাবিক রাজনৈতিক দল কুচক্রী দল বা উপদল হইতে পৃথক। কুচক্রী দলও একমতাবলম্বী লোক লইয়া গঠিত হয়। কিন্তু তাহারা কেবল নিজেদের স্বার্থ খোঁজে। সুস্থ দল কতকগুলি সাধারণ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তাহার লক্ষ্য থাকে জনসাধারণের মঙ্গল বিধান করা। কুচক্রী দলের কোন সাধারণ মতবাদের বালাই নাই। তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য, নিজস্বার্থ অথবা নেতাদের ব্যক্তিগত স্বার্থের উন্নতি করা।

Q. 2. *Describe the essential functions of political parties in a democracy.*

উঃ। প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের মুখ্য উদ্দেশ্য গভর্ণমেণ্ট গঠন করা, এবং নিজেদের নীতি অনুযায়ী তাহা পরিচালনা করা। এই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক দল এমন নীতি স্থির করে যাহার ফলে জাতীয় স্বার্থের উন্নতি হয়। ইহার জন্য প্রত্যেক দল সপক্ষে নিয়ত প্রচারকার্য চালায়। মুদ্রাযন্ত্র ও সভা-সমিতির মারফত প্রত্যেক দল নিজের দলীয় নীতি ভোটদাতাদের নিকট পেশ করে এবং নিজেদের সপক্ষে জনগণের মতগঠনের চেষ্টা করে; দলের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কার্য হইল নির্ব্বাচনের জন্য দলের প্রতিনিধিদের মনোনয়ন করা এবং তাহারা যাহাতে নির্ব্বাচিত হইতে পারে তাহার জন্য চেষ্টা করা। নির্ব্বাচনদ্বন্দ্বের পরিচালনা করা দলের একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্য্য। ভোটদাতাগণ যাহাতে তাহাদের দলীয় প্রতিনিধিদের সমর্থন করে, তাহার জন্য প্রত্যেক দল আপ্রাণ চেষ্টা করে। নির্ব্বাচনের পর যে দল আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়, তাহারা মন্ত্রিসভা গঠন করে এবং নূতন আইনের প্রবর্ত্তন ও পুরাতন আইনের সংস্কার করিয়া দলীয় নীতি কার্য্যে পরিণত করে। আইনসভার বিরোধী দলের কাজ হইল গভর্ণমেণ্টের কার্য্য ও নীতির ত্রুটি বাহির করা ও তাহা জনসাধারণের সমক্ষে প্রকাশ করা। শক্তিশালী বিরোধী দল থাকিলে কোন গভর্ণমেণ্টই যথেচ্ছাচারী হইতে পারে না।

Q. 3. *What are the merits and defects of the party system?* (C. U. 1924, 1955 ; U. P. 1935, 1942)

উঃ। গুণ—(১) রাজনৈতিক দল না থাকিলে গণতান্ত্রিক গভর্ণমেণ্ট পরিচালনা সম্ভব হইত না। রাজনৈতিক দল ব্যতীত আইনসভার শৃঙ্খলা রক্ষা সম্ভব হইত না। আইনসভার অধিকাংশ সভ্যের সমর্থন সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত না হইতে পারিলে গভর্ণমেণ্ট দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে। কিন্তু যদি অধিকাংশ সভ্য একটি দলের অন্তর্ভুক্ত হয় ও দলের নির্দ্দেশ মানিয়া চলে, তবে গভর্ণমেণ্ট শক্তিশালী হইতে পারে। কারণ, দলের নেতারাই গভর্ণমেণ্ট গঠন করে ও

জানে-যে দলের লোক তাহাদের সমর্থন করিবে। সুতরাং তাহারা এই দিক দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া সরকারী কার্য্য পরিচালনা করিতে পারে।

(২) বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থাকার জন্য জনসাধারণের অনেক সুবিধা হয়। জনসাধারণের সমর্থন লাভ করিবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দল দেশের সমস্যা সম্বন্ধে নিজেদের মতামত প্রকাশ করে। ইহার ফলে নাগরিকগণ সমস্যাগুলির বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে। এইরূপে রাজনৈতিক দলগুলি জনসাধারণের শিক্ষার বাহন হয়।

(৩) দেশে বিরুদ্ধদল থাকার জন্য গভর্ণমেণ্ট স্বেচ্ছাচারী হইতে পারে না। বিরোধী দলের কাজ হইল সরকারী কার্য্যকলাপের সমালোচনা করা এবং সরকারের কাজের ত্রুটি-বিচ্যুতি জনসাধারণের সম্মুখে প্রকাশ করা। ফলে, গভর্ণমেণ্টকে খুবই সাবধান হইয়া কাজ করিতে হয়।

ত্রুটি—(১) দল থাকার জন্য অনেক সময় সাধারণ সভ্যের মতের স্বাধীনতা থাকে না। দলের অধিকাংশ মতামত প্রত্যেকটি সভ্যকে মানিয়া লইতে হয়। কেহই দলীয় নীতির বিরুদ্ধে নিজস্ব কোন মত প্রকাশ করিতে পারে না। ইহার ফলে অনেক সময়ে মতের স্বাধীনতা থাকে না।

(২) অতিরিক্ত দলাদলির ফলে জাতীয় স্বার্থের প্রতি আনুগত্যের পরিবর্ত্তে দলীয় স্বার্থের প্রতি আনুগত্যবোধ বৃদ্ধি পাইতে পারে। নেতারা অনেক সময়ে দলীয় স্বার্থের জন্য প্রয়োজন হইলে দেশের স্বার্থবিরোধী নীতি অবলম্বন করে। অন্য দলের নীতি ও কার্য্যকলাপ, যতই ভাল হউক না কেন তাহাকে উপহাস এবং সমালোচনা করিতে হয়।

(৩) দলের কর্ত্তৃত্ব যদি হিতাহিতজ্ঞানশূন্য ব্যক্তির হস্তে যায়, তবে তাহার ফল হয় বিষময়। নেতারা তখন রাষ্ট্রের স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া নিজ স্বার্থোন্নতির চেষ্টা করে।

(৪) নির্ব্বাচনের সময় দলীয় কলহে বহু তিক্ততার সৃষ্টি করে।

(৫) এই সমস্ত ত্রুটির ফলে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদ পূর্ণ করিবার জন্য দেশের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের সর্ব্বদা পাওয়া যায় না। রাষ্ট্রের উচ্চ পদগুলি কেবলমাত্র দলীয় মত অনুসরণকারী ব্যক্তিদের দেওয়া হয়। সুতরাং নিজের ব্যক্তিত্ব বিসর্জ্জন দিতে অনিচ্ছুক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের কোন উচ্চ পদে নিযুক্ত করা যায় না। ফলে দেশ অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

Q. 4. ***Are political parties inevitable in a democracy?*** (C. U. 1951)

উঃ। বর্ত্তমান যুগের গণতন্ত্রমাত্রেই প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র। দেশের জনসাধারণ ভোট দিয়া একদল প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করে। এই প্রতিনিধিদল আইনসভায় মিলিত হয়। প্রতিনিধিদের মধ্য হইতে এক বা একাধিক দল গভর্ণমেণ্ট গঠন করে ও আইনসভার অধিকাংশের মতানুযায়ী সরকারী কার্য্য পরিচালনা করে। সাধারণতঃ, আইনসভার অধিকাংশ সভ্য যে দলের বা দলসমষ্টির সদস্য, সেই দলের নেতৃবৃন্দ গভর্ণমেণ্ট গঠন করে। যদি কোন রাজনৈতিক দল না থাকিত ও আইনসভার সভ্যেরা নিজেদের খুসীমত ভোট দিত তাহা হইলে গভর্ণমেণ্টের কার্য্য পরিচালনায় নানা বিঘ্ন উপস্থিত হইত। এইরূপ গভর্ণমেণ্ট কখনও শক্তিশালী হইতে পারিত না। রাজনৈতিক দল থাকার জন্য গভর্ণমেণ্ট জানে যে, তাহার দলের লোক তাহাকে সমর্থন করিবে। সুতরাং তাহারা নিশ্চিন্ত হইয়া সরকারী কার্য্য পরিচালনা করিতে পারে। দলের অধিকাংশ সভ্যের কি মত তাহাও গভর্ণমেণ্ট ঠিকমত জানিতে পারে ও সেই অনুযায়ী কাজ করিতে পারে। রাজনৈতিক দল না থাকিলে গণতন্ত্রে গভর্ণমেণ্ট পরিচালনা সুষ্ঠুভাবে করা সম্ভব হইত না। গণতন্ত্র থাকিলেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলও গঠিত হয়। কারণ তখন ব্যক্তি-স্বাধীনতা থাকে বলিয়া জনসাধারণের মধ্যে নানা মতের প্রকাশ হয় ও একমতাবলম্বী ব্যক্তিরা নিজেদের দল গঠন করে।

Q. 5. ***Discuss the relative advantages and disadvantages of (a) multi-party system, (b) two-party system, and (c) single-party system.*** (C. U. 1944)

উঃ। দেশের মধ্যে একটি রাজনৈতিক দল কিংবা তুইটি বা বহু দল থাকিতে পারে। সাধারণতঃ কমিউনিষ্ট বা ডিক্টেটরী রাজত্বেই একটি মাত্র দল থাকে। অন্যান্য দেশে তুইটি অথবা বহু রাজনৈতিক দল থাকিতে পারে। কোন্‌টির কি সুবিধা ও অসুবিধা তাহা বিচার করা প্রয়োজন।

একটি মাত্র রাজনৈতিক দল থাকিলে দলাদলির জন্য দেশের ক্ষতি হইবে না সন্দেহ নাই। কিন্তু একটি দল থাকার অর্থ-ই ডিক্টেটরী শাসন। তাহাব ফলে পরিণামে কি ক্ষতি হয় তাহা সকলেই জানে। ভিন্নমতাবলম্বী লোকের তাহা হইলে দেশে স্থান নাই।

তুই দল থাকিলে অনেক বিষয়ে সুবিধা হয়। কোন দলই যথেচ্ছাচারী হইতে পারে না। কারণ, অন্য দল তাহার কুকর্ম্মগুলি দেশের লোকের সামনে প্রকাশ করিয়া দিবে। যে দলের সভ্যগণ আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সেই দলের নেতাগণ গভর্ণমেণ্ট গঠন করে। অন্য দল বিরোধিতা করে ও গভর্ণমেণ্ট দলের দোষ-ত্রুটি খুঁজিয়া বাহির করিতে চেষ্টা করে। নির্ব্বাচনের সময় মাত্র তুইটি প্রার্থী থাকিলে ভোটদাতার পক্ষে সুবিধা হয়। তুজনের মধ্যে একজনকে বাছিয়া লওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ। কিন্তু বহু লোক প্রতিনিধি প্রার্থী হইলে তাহাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ তাহা বাছিয়া লওয়া সব সময় সম্ভব হয় না। যত দল তত মত। সাধারণ ভোটারের পক্ষে বহু মতের মধ্যে কোন্‌টি ভাল তাহা ঠিক করা মুস্কিল হইয়া পড়ে। তাহার অবস্থা অনেকটা বাঁশ বনে ডোম কানার মত হয়। বহুদল প্রথার ইহাই দোষ। বহু দল থাকিলে আরো একটি বিশেষ ক্ষতি হইতে পারে। এমন হওয়া অসম্ভব নয় যে, নির্ব্বাচনের ফলে আইনসভার কোন একটি দলের সভ্য সংখ্যাগরিষ্ঠ হইল না। ফলে, হয়ত তু-তিনটি দলের সভ্য মিলিয়া গভর্ণমেণ্ট গঠন করিতে হয়। এই

ধরণের গভর্ণমেণ্ট খুব কম সময়েই স্থায়ী বা শক্তিশালী হইতে পারে। দল-গুলির মধ্যে বিবাদ হইতে পারে ও ফলে গভর্ণমেণ্টের পতন হইবে। মাত্র দুইটি দল থাকিলে ইহা সম্ভব নয়। ইংলণ্ডে যেমন নির্ব্বাচনে শ্রমিকদল পরাজিত হইলে সংরক্ষণশীলদল গভর্ণমেণ্ট গঠন করে ও নূতন নির্ব্বাচনকাল পর্য্যন্ত মন্ত্রিত্ব করিতে পারে। ফরাসীদেশে বহু দল থাকার জন্য প্রায়ই গভর্ণমেণ্টের পতন হয়। ফলে, কোন গভর্ণমেণ্টই স্থির ও শক্তভাবে কাজ করিতে পারে না। এইজন্য অনেক লেখক বহু দলপ্রথা অপেক্ষা দুই দল-প্রথা পছন্দ করেন।

একাদশ অধ্যায়

নির্ব্বাচকমণ্ডলী

Q 1. (*a*) *Write a short essay on universal suffrage* (C. U 1949, 1951, 1952, U. P 1932, 1943)

What, in your opinion, should be the true basis of the franchise? (C. U. 1950)

(*b*) *Do you support adult suffrage for India?*

(C U. 1952, '55)

Has it worked satisfactorily in India? (C U. 1955)

উঃ। **(ক)** যদি প্রত্যেক পূর্ণবয়স্ক পুরুষ এবং স্ত্রীলোকের ভোট দিবার ও প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবার অধিকার থাকে, তবে এই ব্যবস্থাকে সার্ব্বজনীন ভোটাধিকার বলে। গণতান্ত্রিক সরকার জনসাধারণ কর্তৃক নির্ব্বাচিত সরকার। সুতরাং গণতান্ত্রিক সরকারে প্রত্যেক পূর্ণবয়স্ক লোকের ভোটাধিকার থাকা উচিত।

সার্ব্বজনীন ভোটাধিকার স্বপক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তির অবতারণা করা হয়:

(১) গণতন্ত্রে সার্ব্বভৌম ক্ষমতা সমস্ত জনগণের হস্তে ন্যস্ত আছে। সুতরাং রাজশক্তির পরিচালনার অংশগ্রহণের অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকা উচিত। ইহার একমাত্র উপায় প্রতিনিধি নির্ব্বাচনে প্রত্যেক নাগরিককে ভোটদানের অধিকার দিতে হইবে।

(২) ধনী অথবা দরিদ্র, শিক্ষিত অথবা অশিক্ষিত, প্রত্যেক নাগরিকের মঙ্গল সরকারের কার্য্যকলাপের উপর নির্ভর করে। সুতরাং সরকারী-নীতি নির্দ্ধারণে অংশগ্রহণের অধিকার প্রত্যেক নাগরিকেরই থাকা উচিত।

(৩) ভোটাধিকার থাকিলেই প্রত্যেক শ্রেণীর লোকের অধিকার সংরক্ষিত হইতে পারে এবং তাহাদের অভাব-অভিযোগের মীমাংসা হইতে পারে। যদি কোন শ্রেণীর লোককে ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করা হয়, তবে তাহারা অসন্তুষ্ট হইবে। তাহাদের স্বার্থরক্ষা সম্ভব হইবে না এবং তাহাদের অভাব-অভিযোগের কোন প্রতিকার হইবে না। কিন্তু ভোটাধিকার থাকিলে রাজনৈতিক দলগুলি নির্ব্বাচনে ভোট সংগ্রহের জন্য তাহাদের সুযোগ-সুবিধার দিকে দৃষ্টি দিবে। বাংলাদেশের ভোটদাতাদের অধিকাংশই কৃষকশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া পুরাতন বাংলা সরকার পল্লী বাংলার জন্য এত দরদ দেখাইত।

সার্ব্বজনীন ভোটাধিকারের বিরুদ্ধে যুক্তিঃ—(১) প্রত্যেকেরই ভোটাধিকার থাকা উচিত একথা ন্যায্য বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই। ভোটাধিকার কেবলমাত্র তাহাদেরই দেওয়া যাইতে পারে, যাহারা শিক্ষা ও বুদ্ধির বলে ইহার সদ্ব্যবহার করিতে পারিবে। জনসাধারণের অধিকাংশেরই যথাযথভাবে ভোটদানের মত উপযুক্ত যোগ্যতা এবং বুদ্ধির অভাব আছে। সুতরাং তাহাদিগকে এই অধিকার দেওয়া যাইতে পারে না।

(২) জনসাধারণ নিরক্ষর এবং অজ্ঞ বলিযা শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের উপযুক্ত বুদ্ধি তাহাদের নাই। দায়িত্বহীন এবং ন্যায়-অন্যায়-বিচারশূন্য ব্যক্তিগণ সহজেই তাহাদের কল্পনাকে আকৃষ্ট করিয়া তাহাদের ভোট পাইবে। ইংরাজ দার্শনিক মিল (Mill)-এর মত ছিল যে, লেখাপড়া-না-জানা কোন লোককে ভোটদানের অধিকার দেওয়া সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। ভোটদানের অধিকার বাছিয়া বাছিয়া উপযুক্ত লোকদের দেওয়া প্রয়োজন। উপযুক্ত শিক্ষা এবং কিছু পরিমাণ সম্পত্তি না থাকিলে কাহাকেও ভোটাধিকার দেওয়া উচিত নয়।

একথা নিঃসন্দেহ যে, যাহারা গণতন্ত্রের সমর্থক তাহাদের পক্ষে সার্ব্বজনীন ভোটাধিকার সমর্থন না করিয়া উপায় নাই। শিক্ষিত না হইলে যদি ভোটাধিকার না দেওয়া ঠিক হয়, তবে রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য হইতেছে প্রত্যেক নাগরিকের শিক্ষার ব্যবস্থা করা। সম্পত্তির অধিকারী না হইলে ভোটদাতা করা হইবে না, এই মত ন্যাযসঙ্গত বলিয়া ধরা যায় না। গরীবেরও মতামতের মূল্য আছে, আবার অনেক অর্থশালী নির্ব্বোধেরও অভাব নাই। সার্ব্বজনীন ভোটাধিকার প্রবর্ত্তন ব্যতীত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অন্য কোন পথ নাই।

(খ) ভারতীয় শাসনতন্ত্রে সার্ব্বজনীন ভোটাধিকার নীতিকে গ্রহণ করা হইয়াছে। শুধু পূর্ব্বোক্ত যুক্তিগুলির জন্যই সার্ব্বজনীন ভোটাধিকার সমর্থন করা হয় নাই। সমস্ত সম্প্রদায়ের উপযুক্ত প্রতিনিধি-নির্ব্বাচনের একমাত্র উপায় হইল এই সার্ব্বজনীন ভোটাধিকার। কিছু সংখ্যক লোক এ অবস্থার বিরুদ্ধতা করেন। তাঁহারা বলেন যে, ভারতবর্ষে শতকরা মাত্র ১৭ জন লোকের অক্ষর-পরিচয় আছে ; নিরক্ষরদের ভোটাধিকার দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে। এই ব্যবস্থায় ভোটদাতার সংখ্যা এত বেশী হইবে যে, কোন নির্ব্বাচন করান শাসনকর্তৃপক্ষের পক্ষে একেবারে দুসাধ্য ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইবে। এইজন্য তাঁহারা ভারতবর্ষে সার্ব্বজনীন ভোটাধিকার প্রচলন করার পক্ষপাতী নন।

কিন্তু ভারতীয় রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য সার্ব্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্ত্তন করিয়া নিরক্ষরতা দূর করা, এবং সার্ব্বজনীন ভোটাধিকার প্রবর্ত্তন করা।

ভারতবর্ষের বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রে সার্ব্বজনীন ভোটাধিকার-ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। স্ত্রী-পুরুষ-নির্ব্বিশেষে ২১ বৎসর বয়স্ক সকলকেই ভোটাধিকার দেওয়া হইয়াছে। ১৯৫১-৫২ সালে এই ব্যবস্থানুযায়ী প্রথম সাধারণ নির্ব্বাচনও হইয়াছে। এই নির্ব্বাচনের অভিজ্ঞতা হইতে মনে হয় যে, দেশের অধিকাংশ লোক নিরক্ষর হইলেও এই ব্যবস্থার ফল যে খারাপ হইয়াছে তাহা বলা চলে না। বরঞ্চ সার্ব্বজনীন ভোটাধিকার ব্যবস্থা থাকার জন্য দেশের লোকের মধ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নীতি সম্বন্ধে আলোচনা করিবার ও শুনিবার আগ্রহ হইয়াছে। এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধমতবাদীরা যে সব দোষের আশঙ্কা করিয়াছিলেন তাহা প্রায়ই অমূলক দেখা যাইতেছে।

Q. 2. *Discuss the arguments for and against women suffrage.* (U. P. 1930, '42)

উঃ। ভারতবর্ষে অল্প কিছু দিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকদের ভোটাধিকার ছিল না। ইহার সপক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তি দেখান হইত :—

(১) যদি মেয়েদের ভোটাধিকার দেওয়া হয়, তবে তাহারা গৃহকর্ম্মে অবহেলা করিবে। ফলে সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। (২) ইহার ফলে গৃহের শান্তি নষ্ট হইবে। ভোটদান বিষয়ে স্ত্রী যদি স্বামীর সঙ্গে একমত না হয়, তবে তাহার ফলে অযথা কলহের সৃষ্টি হইয়া গৃহের শান্তি নষ্ট হইবে।

যাঁহারা মেয়েদের ভোট দেওয়ার পক্ষে, তাঁহারা বলেন, (১) যদি ভোটাধিকারকে নাগরিকের অধিকার বলিয়া ধরা হয়, তবে মেয়েদের সে অধিকার হইতে বঞ্চিত করার কোন যুক্তি থাকিতে পারে না। (২) মেয়েরা পুরুষদের অপেক্ষা দুর্ব্বল বলিয়া তাহাদের পক্ষে ভোটাধিকার বেশী প্রয়োজন। যখন স্ত্রীলোকদের জন্য অন্য সমস্ত অধিকার দেওয়া হইয়াছে, যখন নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরাই পরিচালন করার যোগ্যতা তাহাদের আছে বলিয়া বিবেচিত

হয়, এবং যখন প্রত্যেকটি বৃত্তির জন্য পুরুষদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে তাহাদের দেওয়া হয়, তখন পুরুষদের সঙ্গে স্ত্রীলোকদের সমান রাজনৈতিক অধিকার অর্পণ করার বিপক্ষে কোন যুক্তিই থাকিতে পারে না। (৪) স্ত্রীলোকদের ভোটাধিকার অর্পণ করা হইলে, তাহারা দেশের রাষ্ট্রীয় জীবনে একটি পবিত্র এবং মহৎ প্রভাব বিস্তার করিবে ; ফলে শাসনকার্য্যের উন্নতি হইবে। (৫) স্ত্রীলোকেরা যদি স্বামীর মতেই মত দেয়, তবুও তাহাদের ভোটাধিকার দেওয়া উচিত। দার্শনিক মিল (Mill) বলিয়াছেন, "চলিতে না চাহিলেও মানুষের বন্ধন খুলিয়া দেওয়া যেমন মনুষ্যসমাজের পক্ষে হিতকারক তেমনই স্ত্রীলোকেরা যদি ভোট নাও দেন তবুও তাহাদের ভোটাধিকার দেওয়া প্রয়োজন।"

প্রায় প্রত্যেক দেশেই স্ত্রীলোকদের ভোটাধিকার দেওয়া হইয়াছে। ভারতবর্ষে স্ত্রীলোকদের পুরুষদের মত সমান ভোটাধিকার দেওয়ার বন্দোবস্ত করা হইযাছে।

Q. 3. *Discuss the qualifications of a voter.* (B. U. 1939)

"Universal teaching must precede universal enfranchisement."—Discuss. (C. U. 1936)

উঃ। যদিও গণতন্ত্রের লক্ষ্য প্রত্যেক পূর্ণবয়স্ককে ভোটাধিকার দেওয়া, তথাপি বাস্তবক্ষেত্রে প্রত্যেক রাষ্ট্রেই নাগরিককে ভোটাধিকার পাইতে হইলে কতকগুলি গুণের অধিকারী হইতে হয়।

(১) নাবালক, বিকৃতমস্তিষ্ক ব্যক্তি, দেউলিয়া অথবা রাস্তার ভিক্ষুককে ভোটাধিকার দেওয়া হয় না। কয়েক প্রকারের গুরু অপরাধে দণ্ডিত ব্যক্তিকে ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করা হয়।

(২) **সম্পত্তি** ঃ—কোন কোন রাষ্ট্রে নিয়ম আছে যে, যাহাদের কিছু পরিমাণ সম্পত্তি আছে, অথবা যাহারা কিছু পরিমাণ কর দেয়, কেবল তাহারাই ভোটদাতা হইতে পারে। পূর্ব্বে ভারতবর্ষে এই নিয়ম বহাল ছিল। সরকারী

রাজস্বের অপব্যবহারের বিরুদ্ধে সতর্কতা অবলম্বনের জন্য এই ব্যবস্থা বাঞ্ছনীয় মনে করা হইত। "যাহারা কোন কর দেয় না, অথচ নিজেদের ভোটের দ্বারা অন্যের অর্থব্যয়ের বিধান দেন, তাহাদের পক্ষে সর্ব্বপ্রকারে অমিতব্যয়ী হইবার আশঙ্কা আছে, মিতব্যয়ী হইবার কোন সম্ভাবনা নাই।" কিন্তু বর্ত্তমানকালের প্রগতিশীল ব্যক্তিরা এই মতবাদকে মানেন না।

(৩) **শিক্ষা** ঃ—ভোটদাতাগণ উপযুক্তভাবে শিক্ষিত হইবে—ইহার উপর সর্ব্বদাই বিশেষ জোর দেওয়া হয়। মিল (Mil) বলেন যে, লেখাপড়া অথবা সাধারণ অঙ্কশাস্ত্রের বিদ্যা নাই এমন কোন ব্যক্তিকে ভোটদানের অধিকার দেওয়া উচিত নয়। তাহার মতে **সার্ব্বজনীন ভোটাধিকার ব্যবস্থা-প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে সার্ব্বজনীন শিক্ষার বন্দোবস্ত করা প্রয়োজন।**

ভোটদাতাদের শিক্ষিত হওয়া প্রয়োজন সন্দেহ নাই। কিন্তু কেবলমাত্র অক্ষরজ্ঞান থাকিলেই যে লোকে বুদ্ধিমান হইবে, ইহার কোন অর্থ নাই। এমন অনেক চতুর ব্যবসায়ী আছেন, যাঁহাদের অক্ষরজ্ঞানের পরিচয় না থাকিলেও নিজেদের ব্যবসায়ে তাঁহারা যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছেন। সম্রাট্ আকবর নিরক্ষর ছিলেন। নিরক্ষরতার দোহাই দিয়া ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করা সর্ব্বদা যুক্তিসঙ্গত নয়। নিরক্ষর হইলেই সব সময়েই অজ্ঞ অথবা বোকা হয় না।

আবার অক্ষরজ্ঞানকেই যদি ভোটদাতার প্রয়োজনীয় গুণ বলিয়া ধরা হয়, তবে রাষ্ট্রের দায়িত্ব হইল, প্রত্যেক নাগরিককে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া।

Q. 4. *Discuss the merits and demerits of direct and indirect elections respectively.* (C. U. 1936, '39, '42, '45 ; U. P. 1933)

উঃ। প্রত্যক্ষ-নির্ব্বাচন ঃ—ভোটদাতাগণ যখন নিজেরাই সরাসরি-ভাবে ভোট দিয়া প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করে, তখন তাহাকে প্রত্যক্ষ-নির্ব্বাচন-

ব্যবস্থা বলা হয়। বঙ্গীয় বিধানসভার সভ্যেরা প্রত্যক্ষ-নির্ব্বাচন-ব্যবস্থা দ্বারা নির্ব্বাচিত হন।

এই ব্যবস্থার কতকগুলি গুণ আছে :—(১) এই ব্যবস্থা জনস্বার্থসম্বন্ধীয় বিষয়ে ভোটদাতাদের উৎসাহের উদ্রেক করে। এই ব্যবস্থাকে গণতান্ত্রিক মতবাদ সমর্থন করে। প্রত্যক্ষ-নির্ব্বাচন-ব্যবস্থার কিছু কিছু দোষও আছে :— (১) অশিক্ষিত ভোটদাতা বিভিন্ন প্রার্থীর যোগ্যতার বিচার করিতে অসমর্থ হয়, এবং অজ্ঞতাবশতঃ তাহারা হয়ত অযোগ্য প্রার্থীকে নির্ব্বাচিত করিতে পারে।

পরোক্ষ-নির্ব্বাচন ঃ—যে ব্যবস্থায় সাধারণ ভোটদাতা নিজেরা প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করে না, তখন তাহাকে পরোক্ষ-নির্ব্বাচন-ব্যবস্থা বলা হয়। সমস্ত ভোটদাতা প্রথমতঃ অল্পসংখ্যক ব্যক্তিকে মধ্যবর্ত্তী নির্ব্বাচকরূপে নির্ব্বাচিত করে, তাহাদের 'নির্ব্বাচক সভা' (electoral college) বলা হয়। এই নির্ব্বাচক সভার সভ্যেরা ভোট দিয়া আইনসভার সদস্য নির্ব্বাচন করে। পরোক্ষ-নির্ব্বাচন-ব্যবস্থায় এইভাবে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন হয়। কেন্দ্রীয় রাজ্যসভার নির্ব্বাচনে এই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে।

এই ব্যবস্থার কতকগুলি সুবিধা আছে :—(১) এই ব্যবস্থায় সার্ব্বজনীন ভোটাধিকারের ত্রুটি দূর করা যায়। প্রার্থীদের দোষগুণ বিচার করিতে অসমর্থ ভোটদাতার ভোটে আইনসভার প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হয় না। (২) উচ্চতর যোগ্যতাসম্পন্ন অল্পসংখ্যক নির্ব্বাচক মিলিয়া আইনসভার সভ্য নির্ব্বাচন করে। ফলে যোগ্যতর লোক প্রতিনিধি হিসাবে নির্ব্বাচিত হয়। (৩) এই ব্যবস্থায় দলাদলি এবং কলহের অনেক উপশম হয়।

এই ব্যবস্থার ত্রুটি হইল, (১) ইহা গণতান্ত্রিক আদর্শের বিরোধী। কারণ, প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবার মত যোগ্যতা সাধারণ লোকের নাই, এ কথা গণতন্ত্রবাদীর বলা উচিত নয়। (২) এই ব্যবস্থায় জনস্বার্থসম্বন্ধীয় বিষয়ে, জনসাধারণের উৎসাহের উদ্রেক ত হয়ই না, বরঞ্চ কমিয়া যায়। সাধারণ

ভোটদাতা জনস্বার্থ-সম্পর্কিত বিষয়ে কোনপ্রকার উৎসাহ প্রকাশ করে না, কারণ আইনসভার প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করার অধিকার তাহার নাই। (৩) যেখানে দল-ব্যবস্থা সুদৃঢ় আছে, সেখানে এই ব্যবস্থার কোন মূল্যই থাকে না। কারণ, ভোটদাতাগণ কেবলমাত্র সেই সমস্ত মধ্যবর্ত্তী নির্ব্বাচকদের নির্ব্বাচন করিবে, যাহারা তাহাদের নিজ দলীয় প্রার্থীদেরই সমর্থন করিবে। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে ইহা প্রত্যক্ষ-নির্ব্বাচনেই পরিণত হইবে। (৪) এই ব্যবস্থায় উৎকোচ গ্রহণ এবং কুচক্রী মনোবৃত্তি বৃদ্ধি পায়। অল্পসংখ্যক ব্যক্তিদের দ্বারা 'নির্ব্বাচক সভা' গঠিত হয় বলিয়া এই মধ্যবর্ত্তী নির্ব্বাচকদের অতি সহজেই উৎকোচ বা অন্য উপায়ে বশীভূত করা যায়। কিন্তু বহুসংখ্যক সাধারণ ভোটদাতাদের ক্রয় করা সম্ভব নয়। এইজন্য এই ব্যবস্থাকে ক্রমশঃ পরিত্যাগ করা হইতেছে।

Q. 5. *Discuss whether voting should be secret or public.*

উঃ। খোলাখুলিভাবে অথবা সাধারণ সমক্ষে ভোটদান ব্যবস্থায় প্রত্যেক ভোটদাতা সকলের সম্মুখে মনোনীত প্রার্থীর নাম প্রকাশ করে। মিল (Mill) এই ব্যবস্থার সমর্থক ছিলেন। কারণ, তাঁহার মতে "ভোটদান একটি সাধারণ কর্ত্তব্য। সুতরাং অন্যান্য কর্ত্তব্যকর্ম্মের ন্যায় ভোটদান সকলের চক্ষুর সম্মুখে করা উচিত।" কিন্তু এই ব্যবস্থায় ভোটদাতাগণ পুরোহিত, জমিদার ও মালিকশ্রেণীর ভয়ে অথবা অনুরোধ-উপরোধে পড়িয়া নিজেদের প্রকৃত মত-প্রকাশের সুযোগ নাও পাইতে পারে। এইজন্য বর্ত্তমানকালের ভোটদান-ব্যবস্থা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গুপ্ত অথবা ব্যালট কাগজের মারফত সম্পন্ন হইয়া থাকে। প্রত্যেক ভোটদাতাকে প্রার্থীদের নামসহ একখানি করিয়া কাগজ দেওয়া হয়, ভোটদাতা তখন গোপনে তাঁহার নির্ব্বাচিত নামের পূর্ব্বে একটি চিহ্ন দেয় এবং কাগজটি ভাজ করিয়া ব্যালট বাক্সের মধ্যে ফেলিয়া দেয়। এই ব্যবস্থায় ভোটদাতা প্রভাবশালী ব্যক্তিদের ভয় দেখান, অথবা অনুরোধ-উপরোধের হাত হইতে রক্ষা পায়।

Q. 6. ***What are the essentials of a good electoral system ?***

উঃ। (১) সার্ব্বজনীন ভোটাধিকার থাকা প্রয়োজন। তাহার পূর্ব্বে সার্ব্বজনীন শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করা উচিত।

(২) নির্ব্বাচন-ব্যবস্থা প্রত্যক্ষ হওয়া কর্ত্তব্য।

(৩) গুপ্ত অথবা ব্যালট কাগজের মারফত ভোটদান ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করা দরকার।

(৪) নির্ব্বাচনের পবিত্রতা থাকা দরকার। নির্ব্বাচনে জাল-জুয়াচুরি এবং অন্যান্য দুর্নীতিপূর্ণ ব্যবস্থা অবলম্বন যাহাতে না করা হয় তাহার উপযুক্ত বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

Q. 7. ***Discuss the arguments for and against the representation of minorities.*** (C. U. 1958)

উঃ। গণতন্ত্রে রাষ্ট্রের সার্ব্বভৌম ক্ষমতা জনসাধারণের হস্তে ন্যস্ত থাকে। এইজন্য অনেকের মতে আইনসভায় দেশের প্রত্যেকটি সম্প্রদায়ের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়। আইনসভায় সংখ্যালঘু-সম্প্রদায়ের কোন প্রতিনিধি না থাকিলে সংখ্যাগরিষ্ঠ অতি সহজেই সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার করিতে পারে। অনেক রাষ্ট্রের আইনসভায় সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধি-প্রেরণের জন্য বিশেষ পদ্ধতির প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে।

সংখ্যালঘুদের বিশেষ নির্ব্বাচনব্যবস্থার সপক্ষে বলা হয় যে, "গণতন্ত্রকে যদি প্রকৃত সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়, তাহা হইলে দেশের প্রত্যেকটি সম্প্রদায়ের সমানুপাতিক ভিত্তিতে প্রতিনিধি প্রেরণের সুযোগ থাকা উচিত।" নির্ব্বাচকদের মধ্যে যাহারা সংখ্যালঘু, তাহাদেরও জনসংখ্যার অনুপাতে আইনসভায় প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার দিতে হইবে।

কিন্তু এই ব্যবস্থায় প্রচুর গলদ আছে : (১) সমানুপাতিক প্রতিনিধি-নির্ব্বাচন এবং অন্যান্য ব্যবস্থা বিশেষ জটিলতার সৃষ্টি করে। (২) এই ব্যবস্থায় ছোট ছোট দল বা উপদলের সৃষ্টি হয়, ফলে শাসনব্যবস্থা দুর্ব্বল হয়। সদা-পরিবর্ত্তনশীল ছোট ছোট দল থাকিলে, দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করা সম্ভব নয়। (৩) এই ব্যবস্থার ফলে প্রত্যেক সংখ্যালঘু-সম্প্রদায় নিজ সাম্প্রদায়িক স্বার্থের কথাই ভাবিবে। ইহার ফলে একটি সঙ্কীর্ণ মনোবৃত্তি গড়িয়া উঠে এবং অযথা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ এবং শ্রেণীদ্বন্দ্বের অবতারণা হয়।

Q. 8. *Describe the methods which have been suggested for the representation of minorities in legislatures.* (C. U. 1939, '44, 48 ; U. P. 1939)

উঃ। আইনসভায় সংখ্যালঘুদের নির্ব্বাচনের তিনটি পদ্ধতি আছে,—আনুপাতিক প্রতিনিধিব্যবস্থা, সীমাবদ্ধ ভোটব্যবস্থা এবং একত্রিত ভোট-ব্যবস্থা।

ইহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হইল **আনুপাতিক প্রতিনিধিব্যবস্থা** (Proportional Representation)। এই ব্যবস্থায় সংখ্যালঘু-সম্প্রদায়ের ভোটদাতাগণ জনসাধারণ অথবা ভোটদাতাদের মধ্যে তাহাদের মোট সংখ্যার অনুপাতে আইনসভায় প্রতিনিধি প্রেরণ করে। সাধারণতঃ প্রত্যেক নির্ব্বাচনকেন্দ্র হইতে একাধিক প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করা হয়। প্রত্যেক ভোটদাতাকে যে কয়টি আসন আছে, সেই কয়টি ভোটদানের অধিকার দেওয়া হয়। প্রার্থীদের নামের পার্শ্বে ১, ২, ৩, ৪, প্রভৃতি লিখিয়া প্রত্যেক ভোটদাতাকে প্রার্থীদের সম্বন্ধে নিজের পছন্দ জ্ঞাপন করিতে বলা হয়। তখন এই সমস্ত ভোট গণনা করা হয়, এবং যে সমস্ত প্রার্থী উপযুক্ত-সংখ্যক ভোট লাভ করে (এই উপযুক্ত সংখ্যা মোট প্রদত্ত ভোটের সমষ্টিকে আসন-সংখ্যা দিয়া ভাগ করিয়া ঠিক করা হয়), তাহাদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি বলিয়া ঘোষণা করা হয়।

দ্বিতীয় পদ্ধতির নাম **সীমাবদ্ধ ভোটব্যবস্থা** (Limited Vote System) যদি কোন নির্ব্বাচনকেন্দ্র হইতে তিনজন প্রতিনিধি-নির্ব্বাচনের কথা থাকে, তবে প্রত্যেক ভোটদাতাকে দুইটি করিয়া ভোটদানের অধিকার দেওয়া হয়, তিনটি নয়। এইভাবে সংখ্যাগুরুদল তিনটি আসনের মধ্যে দুইটির বেশী দখল করিতে পারিবে না। সংখ্যালঘু-সম্প্রদায় অন্ততঃপক্ষে একটি প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের আশা করিতে পারে।

আর এক পদ্ধতিকে **একত্রিত ভোটব্যবস্থা** (Cumulative Vote System)। মনে কর, তিনজন প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিতে হইবে, এবং প্রত্যেক ভোটদাতার তিনটি করিয়া ভোট আছে। তিনজন প্রার্থীকে ভোট না দিয়া প্রত্যেক ভোটদাতা তিনটি ভোট একজন প্রার্থীকে দিতে পারে।

ভারতবর্ষে আর একটি পদ্ধতির অনুসরণ করা হইত। আইনসভায় সংখ্যালঘুদের আসন সংরক্ষিত করিয়া দেওয়া হইযাছিল। সমস্ত ভোটদাতার ভোটের দ্বারা যুক্ত-নির্ব্বাচন-ব্যবস্থার মারফত, কিংবা পৃথক্ নির্ব্বাচনব্যবস্থায় কেবল মাত্র নিজ সম্প্রদায়ের ভোটদাতার ভোটের মারফত প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইত।

Q. 9. *Describe the different stages of election in a Parliamentary democracy.* (C. U. 1955)

উঃ। গণতান্ত্রিক দেশে নির্ব্বাচনের সময কতকগুলি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয। যখন নির্ব্বাচনের দিন ঘোষণা করা হয় তখনই মনোনয়নপত্র দাখিল করার দিন ঠিক করিয়া দেওয়া হয়। সেই দিনে প্রার্থীদের একটি নির্ব্বাচন-পত্রে নিজেদের নাম, ঠিকানা, ভোটারলিষ্টের সংখ্যা প্রভৃতি লিখিয়া ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর নিকট তাহা দাখিল করিতে হয়। এই সময়ে প্রত্যেক প্রার্থীকে জামানত হিসাবে কিছু টাকাও জমা দিতে হয়। যদি নির্ব্বাচনে সে অত্যন্ত কম ভোট পায় তবে এই টাকা সরকারে বাজেয়াপ্ত হয়।

মনোনয়নপত্র দাখিল করার কয়েক দিন পরে একদিন ভারপ্রাপ্ত সরকারী কর্ম্মচারী এই পত্রগুলি পরীক্ষা করেন। যদি কোন মনোনয়নপত্রে গুরুতর ভুল থাকে তবে তিনি পত্রটি নাকচ করিতে পারেন। তাহা হইলে সেই প্রার্থী আর নির্ব্বাচনে দাঁড়াইতে পারে না।

ইহার কয়েকটি দিন পর পর্য্যন্ত মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করার সময় দেওয়া হয়। যাহাদের মনোনয়নপত্র ঠিক হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে কেহ ইচ্ছা করিলে এই দিনের মধ্যে তাহার পত্র প্রত্যাহার করিবার দরখাস্ত করিতে পারে। তাহা হইলে তাহাকে জামানত টাকা ফেরত দেওয়া হয়।

কয়েক সপ্তাহ পরে নির্ব্বাচন হয়। সেই দিন বিভিন্ন কেন্দ্রে পোলিং বুথ বা নির্ব্বাচনী কেন্দ্র খোলা হয়। প্রত্যেক কেন্দ্রে একজন সরকারী কর্ম্মচারী পোলিং অফিসারের কাজ করে। ভোটদাতা তাহার নিজের কেন্দ্রে গিয়া এই কর্ম্মচারীর সম্মুখে উপস্থিত হয়। তখন তাহার নাম ভোটদাতার তালিকাভুক্ত আছে কিনা দেখা হয়। ঠিক হইলে তাহাকে একটি ব্যালট পেপার বা ভোটের কাগজ দেওযা হয়। সেই কেন্দ্রের একটি পৃথক্ ঘরে প্রত্যেক প্রার্থীর নামে একটি ব্যালট বাক্স থাকে। ভোটদাতা ব্যালট পেপারে নিজের মনোনীত প্রার্থীর নামে চিহ্ন দিয়া সেই প্রার্থীর ব্যালট বাক্সে সবার অলক্ষ্যে ব্যালট পেপারটি ফেলিযা দেয়। ব্যালট পেপারে ভোটদাতার নাম লিখিতে হয় না। কাজেই কে কাহাকে ভোট দিল তাহা জানিবার উপায় থাকে না।

ভোট দেওয়া শেষ হইলে ব্যালট বাক্সগুলি খুলিয়া বিভিন্ন প্রার্থীর ভোটসংখ্যা গোণা হয়। যে বা যাহারা সবচেয়ে বেশী ভোট পায় তাহাকে বা তাহাদিগকে নির্ব্বাচিত বলিয়া ঘোষণা করা হয়।

দ্বাদশ অধ্যায়

বিবিধ

Q. 1. *Describe the composition and functions of the U. N. O.* (C. U. 1956). *In what way is it superior to the old "League of Nations"?* (C. U. 1951)

উঃ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আরম্ভের মধ্য দিয়া লীগ্-অব্-নেশন্স্-এর সম্পূর্ণ ব্যর্থতা প্রমাণিত হইয়া গেল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শান্তিকামী মানবের মনে আর একটি আন্তর্জ্জাতিক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার প্রয়োজন অনুভূত হইল। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত স্যানফ্রানসিস্কোতে ফ্যাসিষ্ট দেশগুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধরত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রতিনিধি লইয়া একটি সম্মেলন বসে। এই সম্মেলনের ফলে "সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ" (ইউ. এন. ও.)-এর জন্ম হইল। যে সমস্ত রাষ্ট্র এই সম্মেলনে অংশ গ্রহণ এবং সনদে সহি করিয়াছিল তাহারা এবং অন্য সমস্ত শান্তিকামী রাষ্ট্র এই প্রতিষ্ঠানের সভ্য হইতে পারিবে। কার্য্য-পরিচালনার জন্য সমস্ত সভ্য লইয়া একটি সাধারণ-পরিষদ্ এবং একটি নিরাপত্তা-পরিষদ্ আছে। নিরাপত্তা-পরিষদে মাত্র ১১টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি আছেন। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট রাশিয়া, গ্রেট বৃটেন, চীন এবং ফরাসী দেশ নিরাপত্তা-পরিষদের স্থায়ী সভ্য। আর ছয় জন সভ্য সাধারণ-পরিষদ্ কর্তৃক দুই বৎসরের জন্য নির্ব্বাচিত হয়। কিছুদিন পূর্ব্বে ভারতবর্ষ নিরাপত্তা-পরিষদের সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিল। কোন সভ্য তাহার সভ্যপদে ইস্তাফা দিবার অনতিকালের মধ্যেই পুনরায় নির্ব্বাচিত হইতে পারিবে না। কোন রাষ্ট্রের কার্য্যে শান্তি নষ্ট হইয়াছে কিনা, অথবা শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা আছে কিনা, অথবা কোন রাষ্ট্র আক্রমণাত্মক নীতি গ্রহণ করিতেছে কিনা, নিরাপত্তা-পরিষদ্ এ সমস্তের বিচার করিবে। আন্তর্জ্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা-রক্ষণের কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার, নিরাপত্তা-পরিষদ্ তাহার

নির্দ্দেশ দিবে। আন্তর্জ্জাতিক শান্তির বিঘ্নকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শান্তিমূলক ব্যবস্থাস্বরূপ সেই রাষ্ট্রের সহিত সম্পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে অর্থনৈতিক সম্পর্কচ্ছেদ, রেলপথ, সমুদ্রপথ, বিমানপথ, ডাক, টেলিগ্রাম, বেতার এবং অন্য সর্ব্বপ্রকারের সংবাদ আদান-প্রদানের সম্পর্কচ্ছেদ, এবং দরকার হইলে সর্ব্বপ্রকারের কূটনৈতিক সম্পর্কচ্ছেদ করা হইবে। শান্তিরক্ষার সর্ব্বশেষ অস্ত্র হিসাবে নিরাপত্তা-পরিষদ্ বিমানপথে, জলপথে, এবং স্থলপথে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করিয়া যে-কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিবে।

এই প্রতিষ্ঠানের আরও কতকগুলি বিশিষ্ট সমিতি আছে—অর্থনৈতিক-পরিষদ্, সামাজিক-পরিষদ্, এবং ট্রাষ্টি-পরিষদ্ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত ১৮ জন সভ্য লইয়া অর্থনৈতিক-পরিষদ্ গঠিত হইয়াছে। ইহার কাজ হইবে আন্তর্জ্জাতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষানৈতিক, স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় এবং ইহাদের সহিত জড়িত অন্যান্য বিষয় লইয়া আলোচনা করা এবং দরকার হইলে এ সমস্ত সমস্যার সমাধানকল্পে তাহাদের মত প্রকাশ করা। ট্রাষ্টি-পরিষদের কাজ স্বায়ত্তশাসনহীন অঞ্চলগুলির স্বার্থরক্ষণ করা। আবার, একটি আন্তর্জ্জাতিক বিচারালয়-স্থাপনেরও বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

পুরাতন লীগ্-অব্-নেশন্স্-এর সহিত বর্ত্তমানের সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানেরও অনেক বিষয়েই পার্থক্য আছে। প্রথমতঃ, পুরাতন লীগে সাধারণ সভার হাতেই সম্পূর্ণ ক্ষমতা ছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে সাধারণ-পরিষদের কোন কার্য্যনির্ব্বাহক ক্ষমতা নাই। দ্বিতীয়তঃ, পুরাতন লীগের প্রত্যেকটি সভ্যের নাকচ করিবার ক্ষমতা ছিল, যাহার ফলে সমস্ত কাজই পণ্ড হইয়া যাইত। বর্ত্তমান প্রতিষ্ঠানে এই নাকচ করিবার ক্ষমতা কেবলমাত্র বৃহৎ ৫টি জাতির (অর্থাৎ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট রাশিয়া, গ্রেট বৃটেন, ফরাসী এবং চীন দেশ) মধ্যে সীমাবদ্ধ। ফলে, বর্ত্তমান প্রতিষ্ঠানটি পুরাতন লীগ হইতে অনেক বেশী কার্য্যকরী হইতে পারে।

দ্বিতীয় খণ্ড

ধনবিজ্ঞান

প্রথম অধ্যায়

ধনবিজ্ঞানের ব্যাখ্যা-নির্দ্দেশ

Q. 1. *Define Economics.* (U. P. 1919, 1941)

"Economics is the science of wealth." Do you agree with this definition ? Give reasons for your answer. (C. U. 1929 ; U. P. 1935)

উঃ। প্রাচীন লেখকদিগের মতে যে শাস্ত্রে অর্থসম্বন্ধে আলোচনা করা হয়, তাহার নাম ধনবিজ্ঞান। তাঁহাদের মতে ধনের উৎপাদন এবং বণ্টনব্যবস্থা আলোচনা করাই ধনবিজ্ঞানের কাজ। ধনবিজ্ঞানের স্বরূপ-নির্দ্দেশের জন্য তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ একজন কাল্পনিক অর্থলোলুপ, স্বার্থান্বেষী ব্যক্তির কল্পনা করিলেন, যাহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হইল অর্থোপার্জ্জন এবং সঞ্চয়। এইরূপ একজন কাল্পনিক অর্থলোলুপ, ব্যক্তির কার্য্যাবলীর আলোচনাই তাঁহারা ধনবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু বলিয়া মনে করিতেন।

ধনবিজ্ঞানের এইরূপ ব্যাখ্যা কিন্তু অনেকেরই মনঃপূত হয় নাই। বিখ্যাত ইংরাজ লেখক কার্লাইল এবং রাস্কিন এই কারণেই ধনবিজ্ঞানের নিন্দা করেন। তাঁহাদের মতে ধনবিজ্ঞান কুবেরের সুসমাচার, যাহার প্রভাবে মানুষ অন্য সমস্ত চিন্তা ভুলিয়া গিয়া কেবলমাত্র স্বার্থান্বেষীর ন্যায় অর্থোপার্জ্জন

এবং সঞ্চয়কেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া মনে করে। সুতরাং এ শাস্ত্র মন্দ না হইয়া যায় না।

কিন্তু এই সমালোচকের দল ধনবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু ভুল বুঝিয়াছেন। একথা অবশ্য সত্য যে, ধনের উৎপাদন এবং বণ্টনব্যবস্থার আলোচনা করাই ধনবিজ্ঞানের প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু ধনবিজ্ঞানের 'ধন' শব্দটি কেবল সম্পদ্ অথবা টাকাকড়িকে বুঝায় না। ধনবিজ্ঞানের 'ধন' শব্দটি সেই সমস্ত জিনিষকে বুঝায় যাহা মানুষের অভাব মিটাইতে পারে এবং যাহার সরবরাহ অপ্রচুর। অভাবের তৃপ্তিদানকারী অপ্রচুর জিনিষের উৎপাদন এবং বণ্টনব্যবস্থার আলোচনা ধনবিজ্ঞান করে। দ্বিতীয়তঃ, একথা মনে রাখা দরকার যে, আমাদের অভাব মিটাইতে পারে বলিয়াই লোকে টাকাকড়ি চায়। ধন অভাবমোচন করিবার একটি উপায় মাত্র। সুতরাং "আমাদের প্রকৃত আলোচনার বস্তু ধন নয়, মানুষ।" মানুষের অভাববোধের তৃপ্তিদানের জন্যই ধনের প্রয়োজন। এইজন্য আমরা আলোচনা করি, কি করিয়া মানুষ ভিন্ন ভিন্ন জিনিষের উৎপাদন করে, কি করিয়া এই উৎপন্ন জিনিষের বিনিময় এবং বণ্টনব্যবস্থার মধ্য দিয়া মানুষের অভাবের তৃপ্তি-সাধন সম্ভবপর হয়। মানুষের এই অভাববোধই তাহাকে ধনলাভের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কর্ম্মপ্রচেষ্টায় প্রণোদিত করে, এবং এই লব্ধধনের সাহায্যে অভাবের তৃপ্তিসাধন হয়। সুতরাং আমাদের আলোচ্য বস্তু ধন নয়। আমাদের আলোচ্য বস্তু কর্ম্মরত মানুষ—যাহার অভাববোধ আছে ও তৃপ্তিসাধনের জন্য কর্ম্মপ্রচেষ্টা আছে, এবং এই কর্ম্মপ্রচেষ্টার ফলে সে উপার্জ্জিত ধন আয় এবং ব্যয় করে। ধনকে কেন্দ্র করিয়া মানুষের যে কার্য্যবিধি, ধনবিজ্ঞান তাহারই আলোচনা করে। ইংরাজ ধনবৈজ্ঞানিক মার্শাল বলেন, "আমরা একদিকে আলোচনা করি ধনের, অন্য এবং অধিকতর প্রয়োজনীয় দিকে আলোচনা করি কর্ম্মনিরত জীবনের একটি অংশ।"

Q. 2. *Show how economic activities promote economic welfare.* (C. U. 1954)

উঃ। অর্থোপার্জ্জন ও ব্যয়কে কেন্দ্র করিয়া মানুষের যে সমস্ত কাজ তাহাকে সাধারণতঃ অর্থনৈতিক কর্ম্ম বলা হয়। অর্থনৈতিক কর্ম্মের ফলে কি মানুষের মঙ্গল বাড়ে? অবশ্য এমন ধরণের অর্থনৈতিক কর্ম্ম আছে, যাহার ফলে মানুষের মঙ্গল ত দূরের কথা অমঙ্গলই হয় বেশী। যেমন, যাহারা মদ তৈয়ারী করে তাহাদের এই কর্ম্মের ফলে সমাজের অনেক অমঙ্গল হয়। কলকারখানার শ্রমিক যেভাবে বস্তির মধ্যে বাস করে তাহাতে তাহাদের শারীরিক ও নৈতিক অবনতি হয় ও দেশেরও অমঙ্গল ঘটে। অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই ধরণের অমঙ্গলজনক কর্ম্মও কিছু কিছু হয় সন্দেহ নাই। কিন্তু সবদিক বিবেচনা করিলে স্বীকার করিতে হইবে যে, দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি হইলে তাহাতে লোকের মঙ্গলই হয় বেশী, অমঙ্গলের পরিমাণ কম। দারিদ্র্য বহু গুণ নাশ করে। দারিদ্র্য দূর হইলে যে মোটামুটি মঙ্গলই হয় ইহা অনেকেই স্বীকার করিবেন। অর্থনৈতিক কর্ম্ম বাড়িলে দেশের ধনসম্পদ্‌ বৃদ্ধি পায়। ফলে লোকের দারিদ্র্য দূর হয় বা কমে। সুতরাং অর্থনৈতিক উন্নতি হইলে দেশের মঙ্গল হয়।

Q. 3. *What is your idea of the scope of economics?* (C. U. 1933; U. P. 1937)

উঃ। কর্ম্মনিরত মানুষের কাজের আলোচনা করাই ধনবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। কিন্তু মানুষের প্রত্যেক কাজ লইয়া ধনবৈজ্ঞানিক আলোচনা করেন না। মানুষ অর্থোপার্জ্জন ও ব্যয়ের উদ্দেশ্যে যে সকল কর্ম্ম করে, তাহার আলোচনাই ধনবিজ্ঞানে করা হয়। সন্তান লালন-পালনের জন্য মাকে যে সকল কষ্ট করিতে হয় ধনবিজ্ঞানে তাহার আলোচনা করা হয় না। কারণ, এই সকল কর্ম্মপ্রচেষ্টার লক্ষ্য অর্থোপার্জ্জন নহে। একজন ক্রিকেট

খেলোয়াড় কেবলমাত্র তাহার দলের জয়লাভের আশায় সারাদিন পরিশ্রম করিয়া মাঠে খেলা করিতে পারে। কিন্তু যতক্ষণ সে অর্থোপার্জ্জনের জন্য খেলা না করে, ধনবৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে তাহার কর্ম্মপ্রচেষ্টার কোন স্থান নাই। যখন কোন কর্ম্মপ্রচেষ্টার মূল লক্ষ্য হয় অর্থোপার্জ্জন এবং ব্যয়, তখনই তাহা ধনবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত হয়।

ধনবিজ্ঞান একটি সমাজবিজ্ঞান। যে মানুষ একাকী বাস করে তাহার কার্য্যের আলোচনা ইহার অন্তর্ভুক্ত নয়। নির্জ্জন দ্বীপে আবদ্ধকালীন রবিনসন্ ক্রুশোকে অনেক কাজ করিতে হইত। কিন্তু ধনবৈজ্ঞানিক তাহা আলোচনা করিবেন না। সমাজবদ্ধ মানুষের অর্থের উপার্জ্জন এবং ব্যয়জনিত কর্ম্মপ্রচেষ্টার আলোচনা করাই ধনবিজ্ঞানের কাজ। অর্থের কোন নিজস্ব প্রয়োজনীয়তা নাই। অর্থের সহায়তায় আমরা অভাব-পরিতৃপ্তিকারী জিনিষের সংস্থান করিতে পারি বলিয়াই অর্থের প্রয়োজন আছে, এবং এই সমস্ত অভাব-পরিতৃপ্তিকারী অপ্রচুর বস্তুকে ধনবিজ্ঞানে 'ধন' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। ধনকে কেন্দ্র করিয়া মানুষের যে কর্ম্মপ্রচেষ্টা, তাহাই ধনবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু।

উপার্জ্জিত এবং সঞ্চিত ধনের ব্যবহার ও ভোগসাধন, প্রকৃতিপ্রদত্ত সম্পদের পরিপূর্ণ ব্যবহারের মধ্য দিয়া আরও অধিক ধনোৎপাদন, নিজের ধনের অতিরিক্ত অংশের সঙ্গে অপরের অতিরিক্ত ধনের বিনিময়-সাধন ও এইরূপে সকলের অভাবের তৃপ্তিসাধন এবং বিভিন্ন ব্যক্তিসমষ্টির মধ্যে এই উৎপন্ন ধনের বণ্টনব্যবস্থা—এই সমস্ত লইয়া মানুষের যে কর্ম্মপ্রচেষ্টা তাহাই ধনবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু। সমাজে ধনের ব্যবহার, উৎপাদন, বিনিময় এবং বণ্টনব্যবস্থাকে কেন্দ্র করিয়া মানুষের যে কর্ম্মপ্রচেষ্টা গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা লইয়া ধনবৈজ্ঞানিক আলোচনা করেন।

Q. 4. *Discuss the relation of Economics with (a) Socio-*

logy, (*b*) *Ethics*, (*c*) *Politics and* (*d*) *History*. (U. P. 1937, 1940, 1941)

উঃ। ধনবিজ্ঞান একটি সামাজিক বিজ্ঞান। সেইজন্য অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের সঙ্গে ইহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে।

(ক) **সমাজতত্ত্ব** সমাজজীবনের সমস্ত দিক্ আলোচনা করে। নৈতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, প্রত্যেকটি বিষয়ের সঙ্গে সমাজবিজ্ঞানের সম্পর্ক আছে। এইজন্য ধনবিজ্ঞান সমাজতত্ত্বের একটি অংশ এবং সমাজজীবনের কেবলমাত্র অর্থনৈতিক দিকের সঙ্গেই ইহার সম্পর্ক।

(খ) **নীতিবিজ্ঞানের** কাজ নৈতিক ব্যবহারের সঠিক আলোচনা করা। সামাজিক আদর্শ অনুযায়ী কোন্ কর্ম্ম করা উচিত, আর কোন্ কর্ম্ম করা উচিত নয়, তাহার আলোচনাই নীতিবিজ্ঞান। ধনবিজ্ঞানকে অনেকেই নীতিবিজ্ঞানের হাতে-গড়া জিনিস বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। অর্থনৈতিক আলোচনার লক্ষ্য মানুষের স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করা এবং এইজন্য ধনবিজ্ঞানের আলোচনা নৈতিক বিচারের দ্বারা প্রভূত পরিমাণে প্রভাবান্বিত হয়।

(গ) **রাষ্ট্রবিজ্ঞান** এবং ধনবিজ্ঞান অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। রাজনৈতিক পরিবেশ ও রাষ্ট্র অথবা সরকার অনেক সময়ই অর্থনৈতিক কার্য্যাবলীকে প্রভাবান্বিত করে। মন্দ রাজনৈতিক পরিবেশের অর্থ মন্দ অর্থনৈতিক সংগঠন। আবার অর্থনৈতিক পরিবেশও রাষ্ট্র-সংগঠনকে প্রভাবান্বিত করে। অনেক সমস্যা—যেমন করনীতি, জাতীয়করণ ইত্যাদি ধনবিজ্ঞান এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান উভয়ের সঙ্গেই সংযুক্ত। ইহাদিগকে রাষ্ট্রগত অর্থনৈতিক সমস্যা বলা চলে।

(ঘ) **ইতিহাস** এবং ধনবিজ্ঞানের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। স্যার জন সিলী বলেন, ইতিহাস ব্যতীত ধনবিজ্ঞানের কোন মূল্য নাই, এবং ধনবিজ্ঞান ব্যতীত ইতিহাসপাঠের কোন ফল হয় না। ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে ধনবিজ্ঞানের আলোচনা না করিলে, সে আলোচনা কখনও

ফলপ্রদ হয় না এবং অর্থনৈতিক পরিবেশের আলোচনা অবহেলা করিলে কোন ঐতিহাসিকের পক্ষেই দেশের সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক জ্ঞান অর্জ্জন করা সম্ভব হয় না।

Q. 5. *What is an economic law ?* (C. U. 1933)

উঃ। অন্যান্য বিজ্ঞানের মত ধনবিজ্ঞানেরও কতকগুলি নিয়ম আছে। এখানে নিয়ম বলিতে আমরা কি বুঝি? ধনবিজ্ঞানের নিয়ম বলিতে আমরা এই বুঝি যে, কোন একটি কারণ উপস্থিত থাকিলে একটি বিশেষ বা নির্দ্দিষ্ট ঘটনা ঘটিবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরা যাক যে, একটি জিনিষের চাহিদা বাড়িযাছে। অন্য কোন পরিবর্ত্তন না ঘটিলে জিনিষটির দাম বাড়িয়া যাইবে এ কথা বলা চলে। ইহাকে আমরা বলি চাহিদার নিয়ম। কোন ব্যক্তির হস্তে একটি জিনিষের যোগান যদি ক্রমেই বাড়িযা যায়, তবে সেই দ্রব্যের উপযোগ তাহার নিকট ক্রমেই কমিযা যাইবে। ইহাকে বলা হয় উপযোগহ্রাসের নিয়ম।

কিন্তু ধনবিজ্ঞানের নিয়ম ও অন্যান্য জড়বিজ্ঞানের নিয়মের মধ্যে অনেক পার্থক্য রহিয়াছে। জড়বিজ্ঞানের নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না। কিন্তু ধন-বিজ্ঞানে এরূপ কোন সঠিক এবং অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম পাওয়া যায় না। মাধ্যাকর্ষণ নিয়মের ব্যতিক্রম নাই। দুইটি পদার্থ সমান আনুপাতিক হারে একে অন্যকে আকর্ষণ করিবে ইহা চিরন্তন সত্য। কিন্তু কোন জিনিষের চাহিদা বাড়িলে তাহার মূল্যবৃদ্ধি নাও হইতে পারে, যদি জিনিষটির যোগান সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে। এই ব্যতিক্রমের কারণও খুব স্পষ্ট। ধনবিজ্ঞানের কারবার মানুষকে লইয়া। মানুষের কাজ ও অভিপ্রায় লইয়াই ধনবিজ্ঞান আলোচনা করে। মানুষের মন ও ইচ্ছা সদা-পরিবর্ত্তনশীল এবং এই পরিবর্ত্তন সর্ব্বদা নির্দ্দিষ্ট পথে চলে না। কোন জিনিষের দাম বাড়িলে একই লোক একসময়ে জিনিষটি কম কিনিবে, আবার অন্য সময়ে হয়তো বেশী কিনিবে। সেইজন্য ধনবিজ্ঞানের নিয়ম অমোঘ হইতে পারে না। পদার্থবিজ্ঞানের

মাধ্যাকর্ষণ আইন ও ধনবিজ্ঞানের আইনের মধ্যে এইরূপ পার্থক্য আছে। কিন্তু জোয়ার-ভাঁটার নিয়ম বা আইনের সঙ্গে তাহাদের তুলনা করা চলে। কারণ, জোয়ার-ভাঁটার নিয়মও একেবারে ঠিক নয়। এই নিয়ম দ্বারা আমরা জানিতে পারি যে, নদীতে জোয়ার অথবা ভাঁটার টান কোন্ সময় হইবে। কিন্তু সঠিকভাবে এই সময়ের নির্দ্দেশ করা সম্ভব নয়। নানা কারণে জোয়ার-ভাঁটার সময় নির্দ্ধারিত সময় হইতে কিছু তফাত হইতে পারে। ধনবিজ্ঞানের নিয়মগুলিও এমন নহে যাহার সাহায্যে আমরা ঠিক বলিতে পারি যে, এইরূপ ঘটনা ঘটিবেই ঘটিবে। ধনবিজ্ঞানে আমরা কেবল বলিতে পারি যে, কোন একটা নির্দ্দিষ্ট কারণ বর্ত্তমান থাকিলে একটি বিশেষ ফল ফলিবার সম্ভাবনা আছে। ধনবিজ্ঞানের নিয়মে মাত্র এই কথাই বলে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ধন, দ্রব্য এবং উৎপাদন

Q. 1. *Define wealth.* (C. U. 1943)

"*When the word 'wealth' is used in economics, it has a much more restricted sense then it has in ordinary speech.*" *Explain.* (C. U. 1931)

উঃ। দৈনন্দিন কথাবার্ত্তায় 'ধন' বলিতে আমরা সাধারণতঃ টাকা-কড়িকে বুঝি। যাহার অনেক টাকা আছে, তাহাকে আমরা ধনী বলি। কিন্তু ধনবিজ্ঞানে আমরা 'ধন' শব্দটি এই অর্থে ব্যবহার করি না। ইহা

একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। যে সমস্ত দ্রব্য মানুষের অভাব মিটাইতে পারে এবং যাহার সরবরাহ এমন অপ্রচুর যে, তাহা দিয়া সকলের চাহিদা মিটান সম্ভব নয়, সেই সমস্ত অপ্রচুর বস্তু বা দ্রব্যকেই ধনবিজ্ঞানে 'ধন' আখ্যা দেওয়া হয়; সাধারণ কথাবার্তায় 'ধন' শব্দ প্রাচুর্য্যের অর্থে ব্যবহার করা হয়, আর ধনবিজ্ঞানে অপ্রচুর বস্তুকে ধন বলা হয়।

সুতরাং ধন বলিতে এমন সব জিনিষ বুঝি যাহার নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য আছে :—

(ক) **অভাব মিটাইবার ক্ষমতা** :—ধন তাহাকেই বলিব যাহা মানুষের অভাব মিটাইতে পারে। অভাব না মিটাইতে পারিলে চাহিদা থাকিবে না। যাহার চাহিদা নাই, তাহাকে ধন বলা হয় না। একজন এস্কিমোর নিকটে রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি ধন নহে। সে ইহা পড়িতে পারিবে না, সুতরাং উহা তাহার অভাব মিটাইতে পারে না।

(খ) **অপ্রচুর সরবরাহ** :—যাহাকে ধন বলিয়া গণ্য করা হইবে, তাহার যোগান সকলের চাহিদা মিটাইবার পক্ষে যথেষ্ট হইবে না। সাহারা মরুভূমির মধ্যস্থিত বালুকণাকে ধন বলা চলে না। নদীতীরবর্ত্তী জল ধন হইতে পারে না। তাহার কারণ ইহাদের সরবরাহ প্রয়োজনের তুলনায় প্রচুর। কিন্তু কলিকাতায় পানীয় জল ধনের পর্য্যায়ে পড়ে। কারণ, সেখানে জলের সরবরাহ অপ্রচুর এবং প্রত্যেকে স্বচ্ছন্দ পরিমাণে জল পায় না।

(গ) **হস্তান্তরকরণযোগ্য** :—যাহার মালিকানাস্বত্ব এক ব্যক্তি হইতে অপর ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করা চলিবে, কেবল তাহাকেই ধন বলা হয়। যে বস্তুর মালিকানা হস্তান্তরিত করা যায় না, তাহাকে ধন বলা চলিবে না।

(ঘ) **বাহ্যবস্তু** :—বাহ্যবস্তু না হইলে তাহা হস্তান্তর করা যায় না। মানুষের অন্তর্নিহিত গুণও হস্তান্তর করা যায় না। নিপুণ সূত্রধরের কর্ম্ম-

দক্ষতা, সুগায়কের কণ্ঠমাধুর্য্য তাহাদের জন্মলব্ধ নিজস্ব সম্পত্তি; ইহা হস্তান্তর করা যায় না, অন্যকে দেওয়া যায় না, সুতরাং ইহাদের ধন বলা হয় না।

যে দ্রব্য মানুষের অভাব মিটাইতে পারে, যাহার সরবরাহ চাহিদার তুলনায় অপ্রচুর, যাহা হস্তান্তর করা যায় এবং যাহা বাহ্যবস্তুর পর্য্যায়ে পড়ে, ধনবিজ্ঞানে কেবলমাত্র ইহাকেই ধন বলা হয়। এই চারিটি বৈশিষ্ট্য থাকিলে ধন বলিয়া গণ্য করা হইবে।

Q. 2. *Write notes on :—*

(a) Goods, (b) Free goods and Economic goods, (c) Consumption goods and Production goods.

উঃ। (ক) **দ্রব্য** ঃ—যে জিনিষ মানুষের অভাব মোচন করিতে পারে, তাহাকেই দ্রব্য বলা হয়। দ্রব্য বাস্তব এবং অবাস্তব দুই প্রকারের হইতে পারে। যেমন টেবিল, চেয়ার বাস্তব দ্রব্য, আবার পুস্তকের স্বত্বাধিকার একটি অবাস্তব দ্রব্য। ইহাদের দুইটিকেই দ্রব্য বলা হয়। যাহা মানুষের অভাবের তৃপ্তিদান করে, তাহাকেই দ্রব্য বলা হয়।

(খ) **অর্থনৈতিক দ্রব্য** ঃ—যে সমস্ত দ্রব্যের অপর্য্যাপ্ত সরবরাহ থাকে, তাহাকে মূল্যহীন দ্রব্য বলে। যে দ্রব্যের সরবরাহ প্রচুর কেহই তাহা কিনিবার জন্য অর্থব্যয় করিবে না। যে দ্রব্যের যোগান মানুষের অভাব বা চাহিদার অনুপাতে যথেষ্ট নয়, তাহাদের **অর্থনৈতিক দ্রব্য** বলে। সোনা, রূপা, খাদ্যদ্রব্য প্রভৃতি অর্থ নৈতিক দ্রব্য। সাধারণ অবস্থায় বায়ুকে অর্থ নৈতিক দ্রব্য বলা হয় না, কারণ তাহার সরবরাহ প্রচুর। অথচ জলের নীচে ডুবুরীর নিকট এই বায়ুই আবার অর্থ নৈতিক দ্রব্য হইয়া যায়। সেইখানে তাহার প্রয়োজনের তুলনায় সরবরাহ অত্যন্ত কম। নদীতীরে দাম দিয়া কেহই জল কিনিবে না। অথচ কোন সহরে জলের সরবরাহ

অপ্রচুর বলিয়া জলকে অর্থনৈতিক দ্রব্য বলা হয়। **সমস্ত অর্থনৈতিক দ্রব্যকেই ধন বলা হয়।**

(খ) **ভোগ্য দ্রব্য** ঃ—অভাবের প্রত্যক্ষ তৃপ্তিদান যে দ্রব্যে সম্ভব, তাহাকে ভোগ্যবস্তু বলা হয়—যেমন খাদ্যদ্রব্য, পরিধানের বস্ত্র ইত্যাদি। যাহা ভোগ্যবস্তু তাহা দিয়া আমরা আমাদের অভাব মিটাইতে পারি। আবার যে সমস্ত দ্রব্যের সহায়তায় অন্য দ্রব্যের উৎপাদন সম্ভব হয়, তাহাকে **উৎপাদন দ্রব্য** (Production goods) বলা হয—যেমন কলকারখানা, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি।

Q. 3. *What is production ?* (C. U. **1937, 1953**)

উঃ। উৎপাদন বলিতে কোন দ্রব্যকে তৈয়ারী করা বুঝায়। কিন্তু আসলে মানুষ কোন পদার্থের সৃষ্টি করিতে পারে না। পদার্থ প্রকৃতিদত্ত জিনিষ ; মানুষ কেবল তাহার রূপগত এবং আকৃতিগত পরিবর্তন সাধন করিতে পারে। বনেজঙ্গলে গাছ কাটিয়া কাঠ পাওয়া যায়। কাঠ কাটিয়া মানুষ তাহা হইতে চেযার, টেবিল ইত্যাদি তৈয়ারী করে। কয়লার খনিতে কয়লা পাওযা যায়। কয়লা প্রকৃতিদত্ত পদার্থ। কয়লা উৎপাদনের অর্থ হইতেছে যে, আমরা খনি হইতে কয়লা কাটিয়া উপরে তুলিয়া আনি। আমরা কয়লার সৃষ্টি করিতে পারি না। প্রকৃতি খনির মধ্যে যে কযলার সৃষ্টি করিযাছে আমরা তাহা পরিশ্রম করিয়া আমাদের কাজে লাগাই।

ধনবিজ্ঞানে উৎপাদন করার অর্থ হইল প্রয়োজনীয়তা বা উপযোগের সৃষ্টি, অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত কম মূল্যবান দ্রব্যকে অধিকতর মূল্যবান করিয়া তোলা। প্রকৃতিপ্রদত্ত জড়বস্তুর আকৃতি, রূপ প্রভৃতির পরিবর্ত্তন করিয়া আমরা সেই সকল বস্তুর উপযোগ বাড়াই, মূল্য বৃদ্ধি করিয়া থাকি। বনের মধ্যে কাঠের যে মূল্য থাকে, সেই কাঠ কাটিয়া চেয়ার তৈয়ারী করিলে তাহার মূল্য আরও বৃদ্ধি পায়। যে সমস্ত কর্ম্মপ্রচেষ্টার ফলে দ্রব্যের উপযোগ বৃদ্ধি হয় ও মূল্য বৃদ্ধি পায়, তাহাকে উৎপাদনকর্ম্ম বলা হয়। এমন কি কোন

দ্রব্যকে শুধু স্থানান্তর করার কাজকেও উৎপাদনকর্ম্ম বলে, যদি তাহার ফলে দ্রব্যটির মূল্য বৃদ্ধি পায়।

Q. 4. *What are the leading factors of production?* (C. U. 1927)

উঃ। কোন জিনিষের উৎপাদনের জন্য যে দ্রব্য প্রয়োজন, তাহাকে উৎপাদনের উপাদান বলা হয়। মানুষ কোন পদার্থই নূতন করিয়া সৃষ্টি করিতে পারে না, মাত্র পদার্থের রূপ পরিবর্ত্তন করিতে পারে। সমস্ত জড় পদার্থ বা বস্তু প্রকৃতিদত্ত। সুতরাং সমস্ত উৎপাদনকার্য্যের মূলে আছে প্রকৃতিদত্ত পদার্থ। আবার শুধু প্রাকৃতিক সম্পদ্ হইলেই উৎপাদন চলে না। প্রাকৃতিক সম্পদ্ হইতে জিনিষ তৈয়ারী করিতে মানুষের শ্রমশক্তি প্রয়োজন। আবার, শুধু শ্রমশক্তি হইলেই বর্ত্তমানকালে উৎপাদন হয় না, মানুষের শ্রমশক্তির সহায়তার জন্য যন্ত্রপাতি এবং কলকারখানা চাই। আবার বর্ত্তমান সমাজব্যবস্থায় উৎপাদনকার্য্যের সংগঠনের জন্য একদল বিশেষ শ্রেণীর লোক আছে, তাহারা উৎপাদন পরিচালনা করিয়া থাকে।

এইভাবে উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানকে মোটামুটি চারিভাগে ভাগ করা যায় :—জমি (অর্থাৎ প্রকৃতিদত্ত সম্পদ্), শ্রমশক্তি, মূলধন এবং সংগঠনক্ষমতা।

(১) **জমি** :—ধনবিজ্ঞানে জমি বলিতে কেবলমাত্র মাটি বা ভূমিকেই বুঝায় না, প্রকৃতিদত্ত সকল সম্পদকেই বুঝায়। জমি বলিতে আমরা মাটি এবং তাহার বিভিন্ন গুণ, যেমন উর্ব্বরতা প্রভৃতি ; খনিজ সম্পদ্, যেমন কয়লা, সোনার খনি প্রভৃতি। কোন স্থানের জলবায়ু, বায়বীয় শক্তি এবং জলশক্তি প্রভৃতি সমস্ত কিছুকেই বুঝি।

(২) **শ্রমশক্তি** :—শ্রমশক্তি বলিতে কোন ব্যবসায়-পরিচালন এবং সংগঠন কার্য্য ব্যতীত ধনলাভের নিমিত্ত মানুষের সমস্ত দৈহিক এবং মানসিক কর্ম্মপ্রচেষ্টাকে বুঝায়। সর্ব্বপ্রকারের দৈহিক অথবা মানসিক, দক্ষ অথবা অদক্ষ সমস্ত রকমের শ্রমই ইহার অন্তর্ভুক্ত।

(৩) **মূলধন** ঃ—উৎপন্ন ধনের যে অংশ আরও অধিকতর ধনোৎপাদন-কার্য্যে ব্যবহৃত হয় তাহাকেই মূলধন বলা হয়। উৎপাদনের জন্য কলকারখানা, যন্ত্রপাতি, কোঠা-বাড়ী, কাঁচামাল প্রভৃতি দ্রব্যকে মূলধন বলা হয়।

(৪) **সংগঠন** ঃ—উৎপাদনকার্য্যের সংগঠন এবং পরিচালনা ইহার অন্তর্ভুক্ত। শুধু জমি এবং অন্যান্য প্রকৃতিপ্রদত্ত সম্পদ্ থাকিলেই উৎপাদন করা যায় না। কোন দ্রব্য উৎপাদনের পূর্ব্বে যথোপযুক্ত অনুপাতে এই সকল জিনিষের সংযোজনের প্রয়োজন। এই পরিচালন-ক্ষমতা উৎপাদনের একটি বিশেষ উপাদান।

তৃতীয় অধ্যায়

জাতীয় আয়

Q. 1. *Define the national income of a country.* (B. U. 1961).

উঃ। কাহারও সাংসারিক অবস্থা ভাল কি মন্দ ইহা জানিতে হইলে তাহার মোট আয় কত ইহা প্রথমে জানা দরকার হয়। সেইরূপ কোন দেশের আর্থিক অবস্থা উঁচু কি নীচু ইহা ঠিক করিতে হইলে সেই দেশের জাতীয় আয় প্রথমে নির্ণয় করিতে হইবে। সে দেশের লোক সমস্ত বৎসর পরিশ্রম করিয়া যে যে দ্রব্য উৎপাদন করে তাহাদের সমষ্টিকেই দেশের জাতীয় আয় বলা হয়। ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে প্রায় ৪৪ কোটি লোকের বাস। ইহারা সারা বৎসর পরিশ্রম করিয়া খাদ্যদ্রব্য, শস্য, কাপড়জামা, বাড়ীঘর, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি বহু শ্রেণীর দ্রব্য উৎপাদন করে। চাষীরা খেত

হইতে ধান, পাট, গম, তুলা, তৈলবীজ, আখ, তামাক, বার্লি প্রভৃতি বহু প্রকারের শস্য উৎপাদন করে। ছোট-বড়-মাঝারী শিল্পে নানা ধরণের দ্রব্য প্রস্তুত হয়—যেমন, কাপড়-জামা, চেয়ার-টেবিল, দোয়াত-কালি, কলম-পেন্সিল, কাগজ, বই ইত্যাদি। দ্রব্য উৎপাদন ছাড়াও বহু লোক নানা পেশার দ্বারা জীবিকা অর্জন করে,—যেমন, শিক্ষক, বিচারক, চিকিৎসক, হিসাব-পরীক্ষক, ব্যবসায়ী, আড়ৎদার, দালাল, গায়ক, অভিনেতা, সিনেমার তারকা, বাদক, ভৃত্য প্রভৃতি। যত প্রকারের যত পরিমাণ দ্রব্য উৎপন্ন হয় ইহাদের মোট মূল্য ও সর্ব্বপ্রকারের পেশায় নিযুক্ত লোকেদের আয়ের যোগফলকে জাতীয় আয় বলা হয়। ধরা যাক যে, ১৯৫৯ সালে ভারতবর্ষে মোট ৭০ কোটি মণ ধান, ৬০ কোটি বস্তা তুলা, দশ লক্ষ টন লৌহ, দশ কোটি জোড়া জুতা ইত্যাদি উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের যোগফল কি? এত বিভিন্ন প্রকারের জিনিসের পরিমাণ অন্যভাবে যোগ করা সম্ভব নহে বলিয়া ইহাদের মোট মূল্য যোগ দেওয়া হয়। অর্থাৎ ৭০ কোটি মণ ধানের মোট মূল্য, ৬০ কোটি বস্তা তুলার মূল্য ইত্যাদি যোগ দেওয়া হয়। সমস্ত উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্যসমষ্টি ও বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত লোকের আয়সমষ্টির যোগফল হইল জাতীয় আয়।

Q. 2. *What precautions are necessary for determining the national income?*

উঃ। দেশের সমস্ত লোক সারা বৎসর পরিশ্রম করিয়া যত প্রকারের জিনিষ উৎপাদন করে ইহাদের মোট মূল্য ও সবরকম পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের আয় সমষ্টির যোগফলকে জাতীয় আয় বলা হয়। জাতীয় আয় নির্ণয় করিবার সময়ে দুইটি বিষয়ে সাবধান হইতে হইবে।

প্রথম, মোট উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্যের যোগফল হইতে উহাদের ক্ষয়ক্ষতি বাবদ কিছু অংশ বাদ দিতে হইবে। একটি উদাহরণ দিলে জিনিষটি বুঝা যাইবে। ধর, যত জমিতে ধান চাষ হয় তাহা হইতে বর্ত্তমান বৎসরে ৭০

কোটি মণ ধান পাওয়া গেল। এই ধান সমস্তটাই এই বৎসরের আয়ের মধ্যে ধরা ঠিক হইবে না। কারণ আগামী বৎসরে চাষের সময় বীজ ধান লাগিবে। বীজ ধান না লাগাইলে চাষ হইবে না। ধর, বীজ ধান বাবদ এক কোটি মণ ধান সরাইয়া রাখা উচিত হইবে। তাহা হইলে জাতীয় আযের মধ্যে ৬৯ কোটি মণ ধান ধরিতে হইবে। যে-কোন যন্ত্র সারা বৎসর চালাইলে তাহার ক্ষয় হয় এবং হয়ত ক্রমাগত ২০ বৎসর চালাইলে যন্ত্রটি একেবারে অচল হয়। সেইজন্য এই যন্ত্র হইতে প্রতি বৎসর যত দ্রব্য উৎপন্ন হয় তাহা সমস্তই জাতীয় আয়ের মধ্যে ধরা উচিত হইবে না। উৎপন্ন দ্রব্যের কুড়িভাগের অন্ততঃ এক ভাগ প্রতি বৎসর আলাদা করিয়া রাখিতে হইবে। এইভাবে ২০ বৎসর জমান হইলে তখন তাহা দিয়া নূতন আর একটি যন্ত্র কেনা সম্ভব হইবে। ইহা করিলে ২০ বৎসর পরে পুরাতন যন্ত্রটি যখন অকেজো হইবে তখন আর ব্যবসায় চালান যাইবে না। সেইজন্য এই যন্ত্র হইতে উৎপন্ন দ্রব্যের এক কুড়ি অংশ বাদ দিয়া বাকী অংশ জাতীয় আয়ের মধ্যে গণনা করিতে হইবে। সুতরাং মোট উৎপন্ন দ্রব্য হইতে বীজের জন্য বা যন্ত্রের ক্ষযক্ষতির জন্য কিংবা ভবিষ্যতে ঠিকমত উৎপাদন কার্য্য চালাইবার জন্য প্রয়োজনীয় অংশ বাদ দিয়া বাকী অংশ জাতীয় আয়ে ধরা হয।

দ্বিতীয়, জাতীয় আযের হিসাব করিবার সময়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, কোন জিনিষের মূল্য যেন দুইবার গণনা করা না হয়। ধর, ভারতবর্ষে ১৯৫৯ সালে মোট এক কোটি টাকা মূল্যের কাগজ উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৫০ লক্ষ টাকা মূল্যের কাগজ দিয়া বই ছাপান হইয়াছে ও বইগুলির মোট মূল্য ২ কোটি টাকা। জাতীয় আয়েয় মধ্যে যদি কাগজের দাম এক কোটি ও বই-এর দাম দুই কোটি এই তিন কোটি টাকা যোগ দেওয়া হয় তবে ভুল করা হইবে। কারণ যখন বই-এর দাম ধরা হইবে তাহার মধ্যে বই ছাপান কাগজের দাম (৫০ লক্ষ)-ও ধরা আছে। সুতরাং জাতীয়

আয়ের দুই কোটি টাকার বই-এর দাম ধরিলে আর ৫০ লক্ষ টাকার কাগজের দাম ধরা ঠিক হইবে না। যখন কোন জিনিষ অন্য আর একটি জিনিষের উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় তখন শেষ জিনিষটির মূল্যের মধ্যেই ইহার উৎপাদনে ব্যবহৃত জিনিষ বা জিনিষগুলির মূল্যও ধরা থাকে। সেই ক্ষেত্রে কেবলমাত্র শেষ জিনিষটির দামই জাতীয় আয়ে যোগ দেওয়া হইবে।

Q. 3. *What do you mean by per capita income ?*

উঃ। দেশের লোক সারা বৎসর পরিশ্রম করিয়া যত দ্রব্য উৎপাদন করে তাহাদের এবং সকল প্রকার পেশায় নিযুক্ত লোকের মোট আয়ের যোগফলকে জাতীয় আয় বলে। ইহাই হইল দেশের মোট জাতীয় আয়।

মোট জাতীয় আয়কে দেশের মোট লোকসংখ্যা দিয়া ভাগ করিলে গড়পড়তা জাতীয় আয় কত তাহা জানা যায়। ধর, কোন দেশের মোট জাতীয় আয় একশ কোটি টাকা ও সেদেশে এক কোটি লোকের বাস। তাহা হইলে গড়পড়তা জাতীয় আয় একশ টাকা মাত্র। ১৯৫৬-৫৭ সালে ভারতবর্ষের মোট জাতীয় আয় ছিল এগার হাজার দশ কোটি টাকা। এদেশের জনসংখ্যা দিয়া ভাগ করিয়া গড়পড়তা আয় হয় ২৮৪৲ টাকা মাত্র। যে পরিবারের ছয়জন লোক আছে তাহার মোট আয় বৎসরে ১৭০৪৲ টাকা। অর্থাৎ এই পরিবারের গড়পড়তা মাসিক আয় ১৪১৲ টাকা মাত্র।

Q. 4. *How is the national income distributed ?*

উঃ। জাতীয় আয় যদি প্রত্যেককে সমানভাবে ভাগ করিযা দেওয়া হইত তবে প্রত্যেকের ভাগ গড়পড়তা আয়ের সমান হইত। কিন্তু কোন দেশেই সকলের ভাগ্যে জাতীয় আয়ের সমান অংশ পড়ে না। সাধারণতঃ জাতীয় আয়ের বণ্টনব্যবস্থা অসম। অর্থাৎ জাতীয় আয়ের অধিক অংশ কম সংখ্যক লোকে ভোগ করিতেছে। অধিকাংশ লোক কম আয় করিতেছে। কেহ কেহ বৎসরে একলক্ষ কি তাহারও বেশী অর্থ উপার্জ্জন করে। আবার

অধিকাংশ লোকই বৎসরে ৬০০।৭০০৲ টাকা রোজগার করিতে হিমসিম খাইয়া যায়। প্রত্যেক দেশেই ধনীর সংখ্যা কম—গরীবের সংখ্যাই বেশী। জাতীয় আয় বণ্টনব্যবস্থাকে পিরামিডের সঙ্গে তুলনা করা হয়। পিরামিডের নীচের অংশ খুব বড় বা চওডা যত উঁচু তত সরু। জাতীয় আয়ের বণ্টনও সেইরূপ। অধিকাংশ লোকের আয় কম। আয়ের পরিমাণ যত বেশী সেখানে লোকসংখ্যাও তত কম। জাতীয় আয়ের এই অসম বণ্টনব্যবস্থা দূর করিবার জন্য সরকার হইতে নানা ব্যবস্থা অবলম্বন করে। ধনীদের উপর খুব উচ্চ হারে নানা কর বসান হয়। ফলে ধনীদের আয় কমে। আর এই করলব্ধ রাজস্ব গরীবদের উপকারের জন্য নানাভাবে ব্যয় করা হয়। ইহার ফলে গরীবের অবস্থার উন্নতি হয়। এইভাবে ধনী-দরিদ্রের প্রভেদ কমাইবার চেষ্টা করা হয়।

Q. 5. *Write short notes on the standard of living.*

উঃ। জাতীয় আয় ও গড়পড়তা আয়ের কথা জানিলে দেশের জীবনযাত্রার মান সম্বন্ধে কিছু ধারণা করা যায়। গডপডতা আয় বেশী হইলে সাধারণ জীবনযাত্রার মান উচ্চ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। ভারতবর্ষের তুলনায় ইংলণ্ড বা আমেরিকার গড়পডতা আয় অনেক বেশী। ভারতবাসী ও ইংরাজের জীবনযাত্রার মানে যে অনেক তফাৎ ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

জীবনযাত্রার মান বলিতে কি বুঝায়? কোন লোক বা পরিবার থাকা, খাওয়া-পরা-চলাফেরা প্রভৃতি বিষয়ে এমন অভ্যস্ত হইয়া পড়ে যে, তাহার বা তাহাদের ঐই অভ্যাসগত দ্রব্যাদি বা বাসস্থান না পাইলে রীতিমত কষ্ট হয়। এই সমস্ত জিনিষ বা অভ্যাসের সমষ্টিকে তাহার বা সেই পরিবারে জীবনযাত্রার মান বলা হয়। এই জিনিষগুলি না পাইলে বা এইভাবে বাস না করিতে পারিলে তাহাদের অশেষ কষ্ট হয়। প্রায় প্রত্যেক লোকই নিজের জীবনযাত্রার মান বজায় রাখিবার মত আয় করার জন্য আপ্রাণ

চেষ্টা করে। জীবনযাত্রার মান সাধারণতঃ আয় ও জিনিষপত্রের মূল্যের উপর নির্ভর করে। দ্রব্যমূল্য এক থাকিলে আয় বৃদ্ধির ফলে জীবনযাত্রার মান উন্নত হইবার সম্ভাবনাই বেশী। আমাদের দেশের শ্রমিক বা চাষীদের অধিকাংশেরই আয় খুব কম। তাহাদের জীবনযাত্রার মানও নীচু। অর্থাৎ তাহারা ঠিকমত খাদ্যবস্ত্র বা বাসস্থান কিছুই সংগ্রহ করিতে পারে না। ফলে তাহাদের স্বাস্থ্য খারাপ হয়, কর্ম্মক্ষমতাও কমে। আবার কর্ম্মক্ষমতা কম বলিয়া তাহারা মজুরীর হারও কম পায়।

Q. 6. *Write notes on the national income of India.*

উঃ। প্রতি বৎসর ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রকারের দ্রব্য যত পরিমাণ উৎপন্ন হয় তাহাদের মূল্য সমষ্টি ও সকল পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের আয়ের সমষ্টিকে এদেশের জাতীয় আয় বলা হয়। জাতীয় আয়ের পরিমাণ নির্ণয় করিতে হইলে বিভিন্ন প্রকারের দ্রব্য কতটা পরিমাণ উৎপন্ন হইতেছে এসম্বন্ধে সঠিক তথ্য থাকা প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের দেশে এই তথ্য ঠিকমত সংগ্রহ করা হয় না। বড় বড় শিল্পে,—যেমন বস্ত্রশিল্প, পাটশিল্প, লৌহ ও ইস্পাতশিল্প ইত্যাদি—উৎপন্ন দ্রব্যের হিসাব সংগ্রহ করা সহজ বটে। কিন্তু অসংখ্য ক্ষুদ্র ও মাঝারী সাইজের শিল্পের উৎপন্ন দ্রব্য সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কোন খোঁজ রাখি না। ইহা ছাড়া বিভিন্ন পেশায় লিপ্ত লোকেদের আয় সম্বন্ধেও সঠিক তথ্য আমাদের জানা নাই। উকিল, ব্যারিষ্টার, হিসাবপরীক্ষক, গায়ক, বাদক প্রভৃতি নানাবিধ কর্ম্মে নিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে যাহারা আয়কর দেয় তাহাদের মোট আয়ের হিসাব আয়করদপ্তর হইতে পাওয়া যায়। কিন্তু অধিকাংশ লোকই নিজের আয়ের ঠিকমত হিসাব দাখিল করে না,—আসল আয় অপেক্ষা কম আয় বলিয়া দেখায়। কারণ তাহা হইলে তাহাদের কম টাকা আয়কর বাবদ দিতে হইবে। বর্ত্তমানে যাহাদের বাৎসরিক আয় অন্ততঃ তিন হাজার টাকা তাহাদের আয়কর দিতে হয়। কিন্তু নীচের দিকে অর্থাৎ কম আয়ের লোকদের মধ্যে বহু লোক আয়কর ফাঁকি দেয় এবং

দেশের অধিকাংশ লোকেরই আয় তিন হাজার টাকার কম। তাহাদের আয় সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কোন সংবাদ পাই না।

এই সমস্ত অসুবিধার জন্য এদেশের জাতীয় আয় সম্বন্ধে ঠিকমত তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নাই। দেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্ব্বে কোন কোন লেখক এদেশের জাতীয় আয় নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ভারত সরকার এবিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করিবার ও জাতীয় আয় নির্ণয় করিবার জন্য একটি কমিটি গঠন করে। এই কমিটি ১৯৪৮ সাল হইতে ভারতের জাতীয় আয় সম্বন্ধে তথ্য প্রকাশ করিতেছে। এই কমিটির হিসাবে আমাদের জাতীয় ১৯৪৮-৪৯ সালে ৮৬৫০ কোটি টাকা ছিল। জনসংখ্যা দিয়া ভাগ করিয়া গড়পড়তা আয় ২৪৭৲ টাকা ছিল। ১৯৫৬-৫৭ সালে জাতীয় আয় বাড়িয়া ১১,০১০ হাজার কোটি টাকা হইয়াছে। গড়পড়তা জাতীয় আয়ের পরিমাণ ২৮৪৲ টাকায় উঠিয়াছে। অর্থাৎ এই আট বৎসরে এদেশের লোকের পড়পড়তা আয় প্রায় ১৫ ভাগ বাড়িয়াছে।

অবশ্য অন্য দেশের ন্যায় এদেশেও জাতীয় আয়ের বণ্টনব্যবস্থা খুবই অসম। ধনীর সংখ্যা অল্প এবং তাহারাই জাতীয় আয়ের একটি বৃহৎ অংশের মালিক। অধিকাংশ লোকই অতি দরিদ্র ও তাহাদের অনেকেরই বৎসরে ২৮৪৲ টাকাও আয় হয় না।

চতুর্থ অধ্যায়

উৎপাদনের উপাদান

Q. 1. *Define land. What are the peculiarities of land as a factor of production?*

উঃ। সাধারণ কথায় 'জমি' বলিতে আমরা মাটিকে বুঝি। কিন্তু ধনবিজ্ঞানে 'জমি' শব্দের ব্যবহার আরও বিস্তৃত অর্থে করা হয়। প্রকৃতি-

প্রদত্ত সমস্ত পদার্থকেই এক কথায় জমি বলা হয়। জমি বলিতে আমরা বুঝি (১) মাটি এবং তাহার উর্ব্বরতা প্রভৃতি গুণ; (২) খনিজ সম্পদ্ (অর্থাৎ কয়লা, স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি); (৩) জান্তব এবং বনজ সম্পত্তি; (৪) নদী এবং সমুদ্র; (৫) জলবায়ু, জল, উত্তাপ, আলো প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তি।

এই প্রাকৃতিক সম্পদ্ না থাকিলে কোন জিনিষের উৎপাদন সম্ভব নহে। সুতরাং জমিকে উৎপাদনের মূল উপাদান বলা হয়।

জমির প্রধান প্রধান বিশেষত্ব এইগুলি:—প্রথমতঃ, জমির সরবরাহ সীমাবদ্ধ। আমরা যন্ত্রপাতি, কলকব্জা প্রভৃতি অন্যান্য জিনিষের সরবরাহ বৃদ্ধি করিতে পারি। কিন্তু জমির সরবরাহ বাড়াইতে পারি না। দ্বিতীয়তঃ, উৎপাদন-হ্রাসের নিয়ম বিশেষ করিয়া জমিতেই প্রযোজ্য।

Q. 2. *Explain the law of diminishing returns. Does it operate with equal force in industry and in agriculture?* (C. U. 1929, 1951 ; U. P. 1939)

উঃ। জমি চাষ করিয়া ক্রমাগত ফসল বাড়াইতে হইলে যে হারে মূলধন নিয়োগ এবং পরিশ্রম করা যায়, ফসলের উৎপাদন সব সময়ে সেই হারে বাড়ে না। ধনবিজ্ঞানে ইহাকে উৎপাদন-হ্রাসের নিয়ম বলা হয়। যখনই কোন চাষী তাহার জমি হইতে বেশী ফসল তুলিতে চায়, তখন সে জমিতে আরও অধিক পরিমাণে মূলধন এবং লোক লাগায়, অর্থাৎ বেশি লোক ও লাঙ্গল দিয়া জমি চাষ করে। ফলে, অবশ্য মোট উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ে। কিন্তু সাধারণতঃ এই উৎপাদন-বৃদ্ধির অনুপাত মূলধন প্রয়োগ এবং পরিশ্রমের তুলনায় কম হয়। দ্বিগুণ পরিশ্রম করিলে সব সময়ে মোট উৎপাদন দ্বিগুণ বাড়ে না। প্রত্যেক চাষীই এ নিয়ম জানে, এবং চাষীদের অভিজ্ঞতা হইতেই উৎপাদন-হ্রাস নিয়মের প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। ধরা যাক, একজন চাষীর একবিঘা জমি এবং একটিমাত্র লাঙ্গল আছে। সে নিজের জমি

লাঙ্গল দিয়া চাষ করিল। একবিঘা জমি হইতে সে ২০ মণ পাট পাইল। দ্বিতীয়বার চাষী আর একটি লাঙ্গল সমেত একজন কিষাণকে মাহিনা দিয়া দুইজনে জমি চাষ করিল। এইবার সে ৪০ মণ পাট পাইবে না, হয়তো ৩৫ মণ পাট পাইবে। যদিও দুইজন লোক এবং দুইটি লাঙ্গল দ্বারা চাষ হইল (অর্থাৎ মূলধন এবং শ্রমশক্তির পরিমাণ দ্বিগুণ করা হইয়াছে), কিন্তু উৎপাদনের পরিমাণ দ্বিগুণ হইল না। প্রথমবারে সে ২০ মণ পাট পাইয়াছিল। আর একটি শ্রমিক ও লাঙ্গল চালাইয়া চাষী মাত্র ১৫ মণ পাট বেশী পাইল, ২০ মণ নহে। তৃতীয়বার, চাষী দুইজন কিষাণ এবং দুইটি লাঙ্গল নিযুক্ত করিল, অর্থাৎ মোট তিনজন চাষী তিনটি লাঙ্গল দ্বারা জমিটি চাষ করিল। বৎসরান্তে সে জমি হইতে হয়তো মোট ৪৫ মণ পাট পাইবে। অর্থাৎ তৃতীয় লাঙ্গল চালাইয়া সে মাত্র অতিরিক্ত ১০ মণ পাট পাইল। একই জমিতে মূলধন এবং শ্রমশক্তির নিয়োগ যতই বৃদ্ধি করা যায়, উৎপাদন-বৃদ্ধির হার কিন্তু ক্রমশঃ কমিতেই থাকে।

এই নিয়মের দুটি ব্যতিক্রম আছে—প্রথম প্রথম চাষ করিবার পর উৎপাদনবৃদ্ধির হার না কমিয়া বাড়িয়াও যাইতে পারে। জমি হয়তো পূর্ব্বে উপযুক্তভাবে চাষ করা হয় নাই। সেইক্ষেত্রে অধিক পরিমাণে শ্রমশক্তি এবং মূলধন নিয়োগ করিলে উৎপাদন-বৃদ্ধির অনুপাত না কমিয়া বরঞ্চ বাড়িয়া যাইবে। কিন্তু চিরকাল এইভাবে বাড়িবে না। উৎপাদন-হ্রাসের নিয়ম একসময় কার্য্যকরী হইবেই, তাহা দুইদিন আগেই হোক বা দুইদিন পরেই হোক।

দ্বিতীয়তঃ, নূতন বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষের উন্নতির ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে সেই নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে পারে। তাহার ফলে অধিক মূলধন এবং শ্রমশক্তির নিয়োগ করিলেও ফসল বৃদ্ধির হার কমিবে না।

উৎপাদন-হ্রাসের নিয়ম বিশেষ করিয়া কৃষিকার্য্যে প্রযোজ্য এই কারণে যে জমির সরবরাহ প্রচুর নয়। যখনই উৎপাদনের কোন একটি উপাদানের

সরবরাহ অন্যান্য উপাদানের তুলনায় দুষ্প্রাপ্য হয়, তখনই উৎপাদন-হ্রাসের এই নিয়ম কার্য্যকরী হয়। সুতরাং এই নিয়মের কার্য্যকারিতা কেবলমাত্র কৃষিকার্য্যেই প্রযোজ্য নয়, শিল্পক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যখন কোন কারখানায় হঠাৎ উৎপাদন-বৃদ্ধির প্রয়োজন হয়, অথচ এই প্রয়োজনীয় উৎপাদনের জন্য নূতন কলকব্জা বসানো যায় না, পুরাতন কলেই বেশী মজুর লাগাইতে হয়. তখনই উৎপাদন-হ্রাসের নিয়ম কার্য্যকরী হয়। কিন্তু কার্য্যতঃ শিল্পক্ষেত্রে এইরূপ অবস্থা বেশী সময় থাকে না। সুতরাং এই কথা বলা চলে যে, উৎপাদন-হ্রাসের নিয়ম শিল্প অপেক্ষা কৃষিকার্য্যেই অধিক প্রযোজ্য।

Q. 3. *Is the law of diminishing returns applicable to mines and fisheries?* (C. U. 1951)

উঃ। উৎপাদন-হ্রাসের নিযম জমির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ধনবিজ্ঞানে খনি এবং মাছ ধরিবার স্থান জমির অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এই নিযম ঐ ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

খনিতে মূলধন এবং শ্রমশক্তি-নিয়োগের হার যতই বৃদ্ধি করিবে, খনির উৎপাদনবৃদ্ধির হার ততই কমিয়া যাইবে। খনির মালিককে খনিতে আরও গভীর তলদেশে কাজ করিতে হইবে। এইরূপে সমপরিমাণে শ্রমশক্তি এবং মূলধন নিয়োগ উত্তরোত্তর বাড়িযা চলিলেও উৎপাদন-বৃদ্ধির অনুপাত কিন্তু সমপরিমাণে হইবে না।

ধৃত মাছের পরিমাণ বাড়াইতে হইলে নদী অথবা সমুদ্রের গভীর জলে যাইতে হইবে। সমসংখ্যক মাছ ধরিবার জন্য এখন তাহাকে অধিকতর চেষ্টা করিতে হইবে। এইভাবে মোট উৎপাদন-বৃদ্ধির অনুপাত শ্রমশক্তি এবং মূলধন-বৃদ্ধির অনুপাত অপেক্ষা কম হইবে।

Q. 4. *Define Labour.*

উঃ। ধনবিজ্ঞানের শ্রমশক্তি বলিতে আমরা দৈহিক এবং মানসিক সর্ব্বপ্রকার প্রচেষ্টাকেই বুঝি। কেবলমাত্র আমোদ-প্রমোদ অথবা আনন্দের

জন্য যে প্রচেষ্টা, যেমন টেনিস খেলা, তাহাকে ধনবিজ্ঞানে শ্রম আখ্যা দেওয়া হয় না। জমির ন্যায় শ্রমও উৎপাদনের মূল উপাদান।

Q. 5. *Distinguish between productive and unproductive labour.* (C. U. 1931).

"*What is of real importance to us today is—not whether the effort is productive or unproductive—but whether the efforts expended results in the production of a large or smaller amount of wealth.*"—*Explain.* (C. U. 1931)

উঃ। অতি প্রাচীনকাল হইতেই শ্রমশক্তিকে কার্যকরী এবং অকার্য্যকরী এই দুইটি ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। বিখ্যাত গ্রীক-দার্শনিক আরিস্টটল এইরূপ কর্ম্মবিভাগ করিয়াছিলেন। চাষ, খনিজ কাজ প্রভৃতি কার্য্যকলাপকে তিনি নাম দিলেন "স্বাভাবিক" কার্য্যকলাপ, এবং টাকা ধার দেওয়া প্রভৃতি কার্য্যকলাপকে আখ্যা দিলেন "অস্বাভাবিক" কার্য্যকলাপ। অষ্টাদশ শতাব্দীর "ফিজিয়োক্রেট" নামে একদল অর্থনৈতিক লেখক প্রথমে কার্য্যকরী এবং অকার্য্যকরী শ্রমের কথা উল্লেখ করেন। তাঁহাদের মতে কৃষিকার্য্য এবং খনিজকার্য্যে নিযুক্ত শ্রমই একমাত্র কার্য্যকরী, কারণ তাহার ফলে প্রয়োজনাতিরিক্ত উৎপাদন পাওয়া যায়। কিন্তু বণিকশ্রেণী অর্থাৎ ব্যবসায়ীদের শ্রম অকার্য্যকরী, কারণ তাহারা কোন অতিরিক্ত ধন উৎপাদন করে না, কেবল উৎপন্ন ধন লইয়া কেনা-বেচা করে।

আধুনিক ধনবিজ্ঞানের স্রষ্টা এডাম স্মিথ্ কেবলমাত্র সেই সমস্ত শ্রমিককেই কার্য্যকরী পর্য্যায়ভুক্ত করিলেন, যাহারা কোন বাস্তব পদার্থ উৎপাদন করে। আর যাহারা অবাস্তব পদার্থ তৈয়ারী করে, তাহাদের শ্রমকে তিনি অকার্য্যকরী বলিয়া আখ্যা দিলেন। তাঁহার মতে আইন-ব্যবসায়ী, চিকিৎসক, শিক্ষক, গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত ভৃত্য, সঙ্গীতজ্ঞ, এবং আরও অনেকেই অকার্য্যকরী পরিশ্রম করে। ইহার কারণ, তাহারা কোন বাস্তব পদার্থ উৎপাদন করে না। কিন্তু

এই ধরণের শ্রেণীবিভাগের কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নাই। যে শ্রমিক হারমোনিয়াম প্রস্তুত করে, তাহার শ্রমকে কার্য্যকরী বলা হইবে। হারমোনিয়াম যন্ত্রটি প্রস্তুত হয় বাজাইবার জন্য। কিন্তু যে সঙ্গীতজ্ঞ হারমোনিয়াম বাজায়, তাহার শ্রমকে এডাম স্মিথ্ কার্য্যকরী বলিয়া স্বীকার করিলেন না। তবে হারমোনিয়াম নির্ম্মিত হইল কেন? এই ধরণের মত অত্যন্ত অযৌক্তিক।

বর্ত্তমানকালের ধনবৈজ্ঞানিকগণ এই মতবাদকে গ্রহণ করেন না। মানুষ বাস্তব বা অবাস্তব কোন পদার্থই উৎপাদন করিতে পারে না। সমস্ত পদার্থের জননী প্রকৃতি। মানুষ কেবলমাত্র বস্তুর উপযোগিতা বৃদ্ধি করে। সুতরাং যে শ্রম জিনিষের উপযোগ বাড়ায়, তাহাকেই কার্য্যকরী বলা চলে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত কোন শ্রমিক এমন দ্রব্য উৎপাদন করে, যাহা দিয়া মানুষের অভাব মিটিতে পারে, ততক্ষণ তাহার শ্রমকে কার্য্যকরী বলা হইবে। যে সকল বস্তু দিয়া কোন অভাবের তৃপ্তিসাধন হয় না, কেবলমাত্র সেই সকল বস্তুর উৎপাদনকারী শ্রমিকদের শ্রমশক্তিকে অকার্য্যকরী বলা যাইতে পারে।

সুতরাং প্রায় সর্ব্বপ্রকার শ্রমই কার্য্যকরী। আমাদের প্রকৃত প্রশ্ন ইহা নহে যে, কার্য্যকরী বা অকার্য্যকরী শ্রম কোন্‌টি। আমাদের প্রয়োজনীয় প্রশ্ন হইল কোন্ শ্রমটি অধিকতর কার্য্যকরী।

Q. 6. *On what depends the supply of labour?*

(C. U. 1943)

উঃ। শ্রম যাহারা করে, তাহাদের সাধারণতঃ শ্রমিক বলে। শ্রমিকের সংখ্যা দেশের জনসংখ্যার উপর নির্ভর করে। কিন্তু দেশের সব লোকই কাজ করে না, শিশু এবং বৃদ্ধ কাজ করে না। ধনী মহিলারা প্রায়ই কাজ করে না। সুতরাং শ্রমিকের সরবরাহ যুবক ও মধ্যবয়স্ক জনসংখ্যার উপর নির্ভর করে। যাহারা কার্য্যক্ষম তাহারাও সকল দিন এবং সকল সময়ে কাজ করে না।

সুতরাং কাজের দিন ও ঘণ্টার উপরেও শ্রমের সরবরাহ নির্ভর করে। আবার, শ্রমের সরবরাহ শ্রমিকের যোগ্যতার বা কর্ম্মদক্ষতার উপরও নির্ভর করে।

Q. 7. *Discuss the Malthusian theory of population. Is it applicable to India ?* (U. P. 1936)

উঃ। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ম্যালথাস্ নামে একজন ইংরেজ অর্থনীতিবিদ্ জনসংখ্যাবৃদ্ধি সম্বন্ধে একটি নিয়মের উল্লেখ করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে যৌনপ্রবৃত্তির জন্য পৃথিবীতে জনসংখ্যাবৃদ্ধির একটা স্বাভাবিক প্রবণতা আছে। কিন্তু যে অনুপাতে জনসংখ্যা বাড়ে, খাদ্য-সরবরাহ সেই অনুপাতে বাড়ান যায় না। ম্যালথাস্ বলেন, জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় জ্যামিতিক গুণোত্তর হারে, এবং খাদ্য-সরবরাহ বাড়ে আঙ্কিক প্রবাহ অনুযায়ী, অর্থাৎ জনসংখ্যা যদি ১, ২, ৪, ৮ এই হারে বৃদ্ধি পায়, খাদ্য-সরবরাহ ১, ২, ৩, ৪ এই অনুপাতে বাড়ে। সুতরাং কিছুদিন পরে উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্য-সরবরাহের অভাবে দুর্ভিক্ষ, মহামারী, যুদ্ধ প্রভৃতি দেখা দিবে। ফলে, বহু লোকের অকাল মৃত্যু ঘটিবে এবং জনসংখ্যা কমিবে। এই অকালমৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইবার একমাত্র উপায় জন্মনিয়ন্ত্রণ করা। অর্থাৎ জনসাধারণ যদি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন না করে, অথবা অবিবাহিত থাকিয়া জনসংখ্যাবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ না করে, তাহা হইলে প্রকৃতি প্রতিশোধ গ্রহণ করিবে এবং দুর্ভিক্ষ, মহামারীর ফলে বহু লোকের মৃত্যু ঘটিবে। এইরূপে জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার কমিবে। প্রথম প্রকার স্বেচ্ছাপ্রণোদিত নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার তিনি নাম দিলেন **কৃত্রিম নিরোধব্যবস্থা** এবং শেষোক্ত প্রকার নিয়ন্ত্রণকে বলিলেন **প্রাকৃতিক নিরোধব্যবস্থা।** কিন্তু বর্ত্তমানকালে এই মতবাদ অনেকেই গ্রহণ করে না। উনবিংশ শতাব্দীতে জনসংখ্যা যে হারে বৃদ্ধি পাইল, শিল্প এবং কৃষিকার্য্যে উৎপাদনের হার তাহার তুলনায় অনেক বেশী বৃদ্ধি পাইয়াছে। ফলে, জনসাধারণের জীবনধারণের মান পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক উন্নত হইয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষের বর্ত্তমান পরিবেশে ম্যালথাসের এই মতবাদকে সত্য বলিয়া

গ্রহণ করা যাইতে পারে। ভারতবর্ষে জন্ম এবং মৃত্যু উভয়ের হারই খুব বেশী। জনসাধারণের প্রত্যেকের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্য-সরবরাহ নাই। ফলে, জীবনধারণের মান খুবই নিম্ন।

Q. 8. *What are the causes of efficiency of labour?* (C. U. 1926, 1936 ; U. P. 1937). *Do they exist in India?*

উঃ। শ্রমের কার্য্যদক্ষতা দুইটি জিনিষের উপর নির্ভর করে : (১) কাজ করিবার শক্তি, (২) কাজ করিবার ইচ্ছা।

(১) **শ্রমিকের কর্ম্মশক্তি** তাহার দৈহিক সামর্থ্য, শিক্ষা, বুদ্ধি এবং নৈতিক চরিত্রের উপর নির্ভর করে।

(ক) **দৈহিক সামর্থ্য**ঃ—যে শ্রমিক উপযুক্ত খাদ্য এবং বস্ত্র পায় না এবং অস্বাস্থ্যকর গৃহে বাস করে, তাহার স্বাস্থ্য ভাল হইতে পারে না। ফলে তাহার শারীরিক যোগ্যতা কমিয়া যায়। সুতরাং (১) উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্য ও পরিধেয় বস্ত্রের সরবরাহ, আলোবাতাস-পরিপূর্ণ গৃহ এবং নির্দ্দোষ আমোদ-প্রমোদ, এ সমস্তই শ্রমিকের কার্য্যক্ষমতা বাড়ায়। (২) শারীরিক যোগ্যতা আবার দেশের জলবায়ুর উপরও নির্ভর করে। অত্যন্ত উত্তপ্ত অথবা শীতল আবহাওয়ায় অধিক সময় কঠোর পরিশ্রম করা অসম্ভব। নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু কঠোর পরিশ্রমের পক্ষে উপযুক্ত। শারীরিক যোগ্যতা আবার কিছু পরিমাণে জাতীয় বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে। কোন কোন জাতি (যেমন পাঞ্জাবীরা) সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়।

(খ) **শিক্ষা**ঃ—শ্রমিকেরা শিক্ষিত হইলে তাহাদের কলকব্জা সম্বন্ধে জ্ঞান হইবে এবং কার্য্যদক্ষতা বাড়িবে। সাধারণ শিক্ষা ও যান্ত্রিক শিক্ষা শ্রমিকের যোগ্যতা বৃদ্ধি করে। যান্ত্রিক শিক্ষাদানের উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা শ্রমিকের কার্য্যক্ষমতা বাড়ায়

(গ) **বুদ্ধি**ঃ—যে শ্রমিক বুদ্ধিমান্ তাহার কর্ম্মদক্ষতা অন্যাপেক্ষা বেশী হইবে। এই বুদ্ধিমত্তা সাধারণ শিক্ষার উপর নির্ভর করে। শিক্ষায় বুদ্ধির দীপ্তি বৃদ্ধি পায়, এবং শ্রমিকের মানসিক ও দৈহিক উন্নতি হয়।

(ঘ) **নৈতিক চরিত্র**ঃ—ইহার অর্থ শ্রমিকদের সৎ এবং পরিশ্রমী হওয়া। তাহাদের প্রবৃত্তি সংযত এবং আত্মসম্মান ও আত্মপ্রত্যয়বোধ তীক্ষ্ণ হইবে। তাহা হইলে তাহারা উচ্চশ্রেণীর দক্ষ শ্রমিক হইতে পারিবে।

(২) **কাজ করিবার ইচ্ছা**ঃ—শ্রমিকদের নৈতিক ও মানসিক গুণ এবং তাহাদের চাকুরীর অবস্থার উপর এই জিনিষটি নির্ভর করে।

(ক) শ্রমিক যদি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়, তবে নিশ্চয়ই সে নিজেকে জগতে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য কঠোর পরিশ্রম করিতে কুণ্ঠিত হইবে না।

(খ) চাকুরীর পরিবেশের উপর শ্রমিকের কর্ম্মের ইচ্ছা অনেকটা নির্ভর করে। অদূর ভবিষ্যতে চাকুরীর উন্নতির সম্ভাবনা থাকিলে শ্রমিক নিশ্চয়ই অধিকতর পরিশ্রম করিবে। পুরস্কারের সম্ভাবনা যত নিকটবর্ত্তী হইবে শ্রমিকের কর্ম্মদক্ষতা ততই বৃদ্ধি পাইবে।

ভবিষ্যতে উন্নতির আশা, স্বাধীনতা এবং পরিবর্ত্তনেও শ্রমিকের কর্ম্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায়। যে শ্রমিক স্বাধীনভাবে কার্য করিতে পারে, যাহার উন্নতির সম্ভাবনা রহিয়াছে, নিশ্চয়ই তাহার কর্ম্মদক্ষতা একজন দাস-শ্রমিকের কর্ম্মদক্ষতা অপেক্ষা অনেক বেশী হইবে। কর্ম্মের পরিবর্ত্তন এবং নানারূপ দৃশ্য কর্ম্মের একঘেয়েমি দূর করে ও শ্রমিকের মনের উদাসীন ভাবকে দূর করিবার সহায়তা করে।

শ্রমিকের কর্ম্মদক্ষতা অনেকে পরিমাণে মালিকের সংগঠনশক্তির উপর নির্ভর করে। মালিক যদি এমন ব্যবস্থা রাখে যে, প্রত্যেক শ্রমিক উৎকৃষ্ট যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল লইয়া উপযুক্ত পরিবেশের মধ্যে কাজ করিতে পারে, তবে শ্রমিকের কর্ম্মদক্ষতা বৃদ্ধি পাইবে।

শ্রমিকের কর্ম্মদক্ষতা যে সমস্ত গুণের উপর নির্ভর করে, তাহাদের অধিকাংশই ভারতবর্ষে নাই বলিলেও চলে। ভারতীয় শ্রমিকেরা উপযুক্ত পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্য ও পরিধেয় বস্ত্র পায় না। তাহারা অন্ধকারাচ্ছন্ন অস্বাস্থ্যকর বস্তিতে বাস করে। ভারতের অত্যুষ্ণ জলবায়ুও কঠোর পরিশ্রমের পক্ষে মোটেই উপযোগী নয়। শ্রমিকদের না আছে সাধারণ শিক্ষা, না আছে কোন যান্ত্রিক শিক্ষা। তাহাদের জীবনের দৃষ্টিভঙ্গী অদৃষ্টবাদী। কারখানার পরিবেশও সুবিধাজনক নয়। ফলে ভারতীয় শ্রমিকদের কর্ম্মদক্ষতা খুব বেশী নহে।

Q. 9. *Define Capital.* (C. U. 1931, 1954, 1956 ; P. U. 1961 ; U. P. 1936, 1943)

উঃ। উৎপন্ন ধনের যে অংশ পুনরায় উৎপাদনকার্য্যে ব্যবহৃত হয়, তাহাকে মূলধন বলে। সুতরাং কোন বস্তুকে মূলধন বলিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে তাহা ধনের পর্য্যায়ে পড়ে কিনা দেখিতে হইবে। তাহার কারণ মূলধন ধনের অংশমাত্র। কিন্তু ধন মাত্রই মূলধন নয়।

মূলধন হইলে দ্রব্যটি 'মনুষ্য-উৎপাদিত' হইবে। অর্থাৎ জমি এবং অন্যান্য প্রকৃতিপ্রদত্ত বস্তুকে মূলধন বলা হয় না। কারণ, তাহাদের উৎপাদনে মানুষের চেষ্টার প্রয়োজন হয় নাই।

আবার উৎপন্ন ধনমাত্রেই মূলধন হয় না। উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে যেগুলিকে ব্যবহার বা ভোগ না করিয়া পুনরায় উৎপাদনকার্য্যে নিযুক্ত করা হয়, তাহাদিগকে মূলধন বলা হয়। সংক্ষেপে উৎপাদনের সহায়ক "উৎপন্ন দ্রব্যকে" মূলধন বলা হয়।

সকল প্রকারের যন্ত্রপাতি, কলকারখানা, দালান প্রভৃতি যাহা কিছু বড় বা ছোট কারখানায় ব্যবহৃত হয়, তাহাদের সবই মূলধনের পর্য্যায়ভুক্ত। আবার উৎপাদনকার্য্যে ব্যবহৃত কাঁচামাল, শ্রমিকদিগের জীবনধারণোপযোগী খাদ্য প্রভৃতিকেও মূলধনের পর্য্যায়ভুক্ত করা হয়।

Q. 10. *Distinguish between Wealth and Capital.* (C. U. 1938, 1944 ; U. P. 1937, 1938)

উঃ। মূলধন ধনেরই অংশ। যে দ্রব্য ধন নহে, তাহাকে মূলধন বলা হয় না। কিন্তু সব ধনই মূলধন নয়। মূলধন বলিয়া গণ্য হইতে গেলে ধনের দুইটি বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন। প্রথমতঃ, যে ধন উৎপাদন করিতে মানুষকে পরিশ্রম করিতে হয় না, তাহাকে মূলধন বলা হয় না। প্রকৃতিদত্ত সম্পদকে ধন বলা চলে, কিন্তু তাহাদের মূলধন বলা হয় না। দ্বিতীয়তঃ, ধনের যে অংশ উৎপাদনকার্য্যে ব্যবহৃত হয়, কেবলমাত্র সেই অংশকেই মূলধন বলা হয়। আর ধনের যে অংশ অবিলম্বে ভোগের জন্য ব্যবহৃত হয়, তাহাদের মূলধন বলা যায় না।

সুতরাং কোন বস্তু মূলধন পর্য্যায়ভুক্ত হইবে কিনা, তাহা নির্ভর করে ধনের ব্যবহারের উপর। আমাদের রান্নাঘরের উনুনে যে কয়লা পোড়ে, তাহাকে ধন বলা চলে, কিন্তু মূলধন বলা চলে না। কিন্তু রেলগাড়ী বা কারখানার ইঞ্জিনে যে কয়লার ব্যবহার হয়, তাহাকে নিশ্চয়ই মূলধন বলিব।

যদি কেবলমাত্র খাওয়ার আনন্দের জন্যই আমি আহার করি, তবে সে খাদ্যকে মূলধন বলা হইবে না। কিন্তু যদি আমি সমস্ত দিনের কর্ম্মক্ষমতা অটুট রাখার জন্য খাই, তবে খাদ্যকে মূলধন বলিয়া গণ্য করা যাইবে।

সুতরাং ধন এবং মূলধনের পার্থক্য নির্ভর করে জিনিষের ব্যবহারের উপর।

Q. 11. *Distinguish between fixed and circulating capital.* (C. U. 1931, 1940, 1943, 1954 ; U. P. 1937, 1942, 1949)

উঃ। যে সকল দীর্ঘস্থায়ী বস্তু উৎপাদনকার্য্যে মাত্র একবার ব্যবহৃত হইয়া নিঃশেষ হয় না, এবং বহুদিন ধরিয়া বহুবার উৎপাদনকার্য্যে ব্যবহৃত

হয়, তাহাদের **স্থিরাকৃত মূলধন** (fixed capital) বলা হয়। যথা-কারখানার যন্ত্রপাতি, দালান-কোঠা প্রভৃতি এই শ্রেণীভুক্ত।

যে সকল মূলধন একবার মাত্র উৎপাদনকার্যে ব্যবহৃত হইয়া নিঃশেষ হয়, তাহাদের **চলমান মূলধন** (circulating capital) বলা হয়। কাঁচামাল, শ্রমিকদিগের জীবনধারণের উপযোগী দ্রব্য প্রভৃতি চলমান মূলধনের পর্য্যায়ভুক্ত। তুলা হইতে সুতা তৈয়ারী করিবার পর তাহা আর তুলা থাকে না। কিন্তু সুতাকাটা কল একবার ব্যবহারের পরও কলই থাকে। সুতাকাটা কল স্থিরীকৃত মূলধন ও তুলা চলমান মূলধন।

Q. 12. *Is money capital ?*

উঃ। সাধারণতঃ অর্থের পরিমাপেই মূলধনের পরিমাণ নির্ণয় করা হয়। যদি কোন ব্যবসায়ীকে জিজ্ঞাসা করা হয় তাহার ব্যবসায়ের মূলধন কি, তাহা হইলে সে উত্তর দিবে যে, তাহার মূলধন (ধর) ১ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ, সে বলিতে চায় যে, তাহার যে সমস্ত দালান-কোঠা যন্ত্রপাতি আছে তাহাদের বাজার দর ১ লক্ষ টাকা। কিন্তু আসলে মূলধন মানে অর্থ নয়। কোন দেশে অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি হইলেই সেই দেশের মূলধন বৃদ্ধি হয় না। গত যুদ্ধে আমাদের দেশে অর্থ প্রচুর বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু মূলধন বাড়ে নাই। আসলে মূলধন বলিতে আমরা কারখানা, যন্ত্রপাতি, দালান-কোঠা, কাঁচামাল প্রভৃতি দ্রব্য বুঝি।

Q. 13. *Indicate the part played by capital in production.* (C. U. 1926, 1936, 1943, 1954 ; U. P. 1935)

উঃ। মূলধনের প্রধান কাজ শ্রমিকের কার্য্যক্ষমতা এবং উৎপাদনশক্তি বৃদ্ধি করা। কারখানা ও যন্ত্রপাতির সহায়তায় শ্রমিক অনেক বেশী পরিমাণে এবং অনেক ভাল জিনিষ তৈয়ারী করিতে পারে। মূলধনের সহায়তা ব্যতীত উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির কোন সম্ভাবনা থাকে না। কলকারখানার সংখ্যা যত বৃদ্ধি পায়, ভাল ভাল যন্ত্রপাতির যত ব্যবহার হয়, উৎপাদনের

পরিমাণ এবং গুণও তত বৃদ্ধি পায়। মূলধনের সহায়তায় কেবল যে অধিক সংখ্যক জিনিষ উৎপন্ন হয় তাহা নয়, উৎপাদনের ব্যয়ও বহু পরিমাণে কমিয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ, চলমান মূলধনরূপে ইহা উৎপাদনকার্য্যের জন্য কাঁচামাল এবং উৎপাদনরত শ্রমিকদের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য ও অন্যান্য বস্তু সরবরাহ করে।

মূলধনের সহায়তায় উৎপাদনকার্য্যকে পরোক্ষ উৎপাদন বলা হয়। নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তের সহায়তার এই বিষয়টি পরিষ্কার করিয়া বোঝা যাইবে। আদিম সমাজে শিকারীর নিকট বর্শা, তীর, ধনুক প্রভৃতি কোন মূলধনই ছিল না, যাহার সাহায্যে সে শিকার করিতে পারিত। ফলে খুব কম খাদ্যই তাহার ভাগ্যে জুটিত। এখন ধরা যাউক, সে একদিন পরিশ্রম করিয়া পাথরের বর্শা, অথবা তীর-ধনুক নির্ম্মাণ করিল। অর্থাৎ, প্রথমে সে মূলধন উৎপাদন করে, যাহার (অর্থাৎ তীর, ধনুক ও বর্শার) সহায়তায় সে অধিক সংখ্যক শিকার করিতে পারিবে। এইভাবে আমরা দেখি যে, মূলধনবিহীন উৎপাদনব্যবস্থায় সোজাসুজি ভোগ্যবস্তুর উৎপাদন করা হয়। আর মূলধন-সমেত উৎপাদনব্যবস্থায় প্রথমে ভোগ্যবস্তুর উৎপাদন না করিয়া মূলধন (কলকারখানা, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি) উৎপাদন করা হয়; এবং পরে এই মূলধনের সহায়তায় ভোগ্যবস্তু উৎপাদন করা হয়। মূলধন উৎপাদনকালে, অর্থাৎ কলকারখানা ও যন্ত্রপাতি উৎপাদনের প্রারম্ভ হইতে ভোগ্যবস্তুর উৎপাদন শেষ হওয়া পর্য্যন্ত যে মধ্যবর্ত্তী সময়, তখন শ্রমিক এবং মালিক উভয়কেই বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। এই মধ্যবর্ত্তী সময়ে তাহাদের ভরণপোষণ মূলধন দ্বারাই সম্ভব হয়। মূলধন তাহাদের কাঁচামাল যোগান দেয় এবং খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয়ের সরবরাহ করে। সুতরাং মূলধনের প্রধান কাজ উৎপাদনক্ষমতা বহুলাংশে বৃদ্ধি করা।

Q. 14. *What are the main causes which influence the accumulation of wealth in a country? How far are these*

causes present in India? (C. U. 1928, 1940, 1956; U. P. 1935, 1938)

What are the factors upon which the accumulation of capital depends? (C. U. P. U. 1961)

উঃ। সঞ্চয় হইতেই মূলধনের সৃষ্টি হয়। যে দিন আনে দিন খায় তাহার পক্ষে যেমন সঞ্চয় সম্ভব নয়, তাহার মূলধনও থাকিতে পারে না। আদিম শিকারীর যদি কোন সঞ্চয় না থাকে তবে সে ধনুক, তীর বা বর্শা তৈয়ারীতে সময় দিতে পারে না। আদিম শিকারীকে তীর বা বর্শা উৎপাদন-কালে নিজের ভরণপোষণের জন্য কিছু সঞ্চয় পূর্ব্ব হইতেই করিয়া রাখিতে হইয়াছিল। আবার এই সঞ্চয় সম্ভব হয়, আমাদের প্রয়োজনীয় অভাব মোচন করিয়া উদ্বৃত্ত আয় থাকিলে তবেই। অর্থাৎ সঞ্চয়ের ক্ষমতার উপর সঞ্চয়ের পরিমাণ নির্ভর করে। আবার উদ্বৃত্ত আয় থাকিলেও তাহা সঞ্চিত হইবে কিনা, ইহা নির্ভর করে সঞ্চয়ের প্রবৃত্তির উপর।

(ক) **সঞ্চয়ের ক্ষমতা:** মানুষের আয় যদি এইরূপ হয় যে, প্রয়োজনীয় ব্যয় করিয়া কিছু উদ্বৃত্ত থাকে তবেই সঞ্চয় সম্ভবপর হয়। সুতরাং সঞ্চয়ের ক্ষমতা নির্ভর করে আয়ের পরিমাণের উপর। যাহার আয় অত্যন্ত কম তাহার সঞ্চয় সম্ভব হয় না।

(খ) **সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি:** সঞ্চয় করিবার ক্ষমতা থাকিলেই যে সঞ্চয় হইবে ইহা সব সময় বলা চলে না। সঙ্গে সঙ্গে সঞ্চয়ের ইচ্ছাও থাকা প্রয়োজন। যদি সঞ্চয় করিবার ইচ্ছা না থাকে তবে সঞ্চয় হওয়া কঠিন। যদি সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি থাকে, তবে আয় কম হইলেও লোকে সামান্য কিছু সঞ্চয় করিবার চেষ্টা করে। এই সঞ্চয়প্রবৃত্তির পিছনে আছে, বিভিন্ন প্রকার উদ্দেশ্য ও মতিগতি। কতকগুলি কারণে লোকের সঞ্চয় করিবার স্বাভাবিক প্রবণতা আছে: (১) **পরিবারের প্রতি স্নেহ**। প্রত্যেক লোকে তাহার স্ত্রী ও সন্তানের জন্য কিছু সংস্থান রাখিতে চায়। পরিবারের প্রতি

পরিমাণ এবং গুণও তত বৃদ্ধি পায়। মূলধনের সহায়তায় কেবল যে অধিক সংখ্যক জিনিষ উৎপন্ন হয় তাহা নয়, উৎপাদনের ব্যয়ও বহু পরিমাণে কমিয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ, চলমান মূলধনরূপে ইহা উৎপাদনকার্য্যের জন্য কাঁচামাল এবং উৎপাদনরত শ্রমিকদের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য ও অন্যান্য বস্তু সরবরাহ করে।

মূলধনের সহায়তায় উৎপাদনকার্য্যকে পরোক্ষ উৎপাদন বলা হয়। নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তের সহায়তার এই বিষয়টি পরিষ্কার করিয়া বোঝা যাইবে। আদিম সমাজে শিকারীর নিকট বর্শা, তীর, ধনুক প্রভৃতি কোন মূলধনই ছিল না, যাহার সাহায্যে সে শিকার করিতে পারিত। ফলে খুব কম খাদ্যই তাহার ভাগ্যে জুটিত। এখন ধরা যাউক, সে একদিন পরিশ্রম করিয়া পাথরের বর্শা, অথবা তীর-ধনুক নির্ম্মাণ করিল। অর্থাৎ, প্রথমে সে মূলধন উৎপাদন করে, যাহার (অর্থাৎ তীর, ধনুক ও বর্শার) সহায়তায় সে অধিক সংখ্যক শিকার করিতে পারিবে। এইভাবে আমরা দেখি যে, মূলধনবিহীন উৎপাদনব্যবস্থায় সোজাসুজি ভোগ্যবস্তুর উৎপাদন করা হয়। আর মূলধন-সমেত উৎপাদনব্যবস্থায় প্রথমে ভোগ্যবস্তুর উৎপাদন না করিয়া মূলধন (কলকারখানা, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি) উৎপাদন করা হয়; এবং পরে এই মূলধনের সহায়তায় ভোগ্যবস্তু উৎপাদন করা হয়। মূলধন উৎপাদনকালে, অর্থাৎ কলকারখানা ও যন্ত্রপাতি উৎপাদনের প্রারম্ভ হইতে ভোগ্যবস্তুর উৎপাদন শেষ হওয়া পর্য্যন্ত যে মধ্যবর্ত্তী সময়, তখন শ্রমিক এবং মালিক উভয়কেই বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। এই মধ্যবর্ত্তী সময়ে তাহাদের ভরণপোষণ মূলধন দ্বারাই সম্ভব হয়। মূলধন তাহাদের কাঁচামাল যোগান দেয় এবং খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয়ের সরবরাহ করে। সুতরাং মূলধনের প্রধান কাজ উৎপাদনক্ষমতা বহুলাংশে বৃদ্ধি করা।

Q. 14. *What are the main causes which influence the accumulation of wealth in a country? How far are these*

causes present in India? (C. U. 1928, 1940, 1956; U. P. 1935, 1938)

What are the factors upon which the accumulation of capital depends? (C. U. P. U. 1961)

উঃ। সঞ্চয় হইতেই মূলধনের সৃষ্টি হয়। যে দিন আনে দিন খায় তাহার পক্ষে যেমন সঞ্চয় সম্ভব নয়, তাহার মূলধনও থাকিতে পারে না। আদিম শিকারীর যদি কোন সঞ্চয় না থাকে তবে সে ধনুক, তীর বা বর্শা তৈয়ারীতে সময় দিতে পারে না। আদিম শিকারীকে তীর বা বর্শা উৎপাদন-কালে নিজের ভরণপোষণের জন্য কিছু সঞ্চয় পূর্ব্ব হইতেই করিয়া রাখিতে হইয়াছিল। আবার এই সঞ্চয় সম্ভব হয়, আমাদের প্রয়োজনীয় অভাব মোচন করিয়া উদ্বৃত্ত আয় থাকিলে তবেই। অর্থাৎ সঞ্চয়ের ক্ষমতার উপর সঞ্চয়ের পরিমাণ নির্ভর করে। আবার উদ্বৃত্ত আয় থাকিলেও তাহা সঞ্চিত হইবে কিনা, ইহা নির্ভর করে সঞ্চয়ের প্রবৃত্তির উপর।

(ক) **সঞ্চয়ের ক্ষমতা :** মানুষের আয় যদি এইরূপ হয় যে, প্রয়োজনীয় ব্যয় করিয়া কিছু উদ্বৃত্ত থাকে তবেই সঞ্চয় সম্ভবপর হয়। সুতরাং সঞ্চয়ের ক্ষমতা নির্ভর করে আয়ের পরিমাণের উপর। যাহার আয় অত্যন্ত কম তাহার সঞ্চয় সম্ভব হয় না।

(খ) **সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি :** সঞ্চয় করিবার ক্ষমতা থাকিলেই যে সঞ্চয় হইবে ইহা সব সময় বলা চলে না। সঙ্গে সঙ্গে সঞ্চয়ের ইচ্ছাও থাকা প্রয়োজন। যদি সঞ্চয় করিবার ইচ্ছা না থাকে তবে সঞ্চয় হওয়া কঠিন। যদি সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি থাকে, তবে আয় কম হইলেও লোকে সামান্য কিছু সঞ্চয় করিবার চেষ্টা করে। এই সঞ্চয়প্রবৃত্তির পিছনে আছে, বিভিন্ন প্রকার উদ্দেশ্য ও মতিগতি। কতকগুলি কারণে লোকের সঞ্চয় করিবার স্বাভাবিক প্রবণতা আছে: (১) **পরিবারের প্রতি স্নেহ**। প্রত্যেক লোকে তাহার স্ত্রী ও সন্তানের জন্য কিছু সংস্থান রাখিতে চায়। পরিবারের প্রতি

স্নেহ তাহাকে যথাসাধ্য সঞ্চয় করিবার প্রবৃত্তি দেয়। সঞ্চয়ের প্রবৃত্তির পিছনে এইটিই হইল সবচেয়ে বড শক্তি। (২) আর একটি কারণ, **সামাজিক যশ ও পদমর্য্যাদা-লাভের ইচ্ছা**। যাহার ধন বেশী তাহার ক্ষমতা ও মর্য্যাদাও বেশী। ধনী হইবার আকাঙ্ক্ষা এবং মর্য্যাদা-লাভের আকর্ষণ অনেকের মধ্যে সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি দেয়। (৩) **দূরদর্শিতা**। যে ব্যক্তি দূরদর্শী দুঃসময়ের জন্য তিনি সংস্থান করিয়া থাকেন। সুতরাং সঞ্চয় বেশী হইবে।

সঞ্চয়প্রবৃত্তি আবার কতকগুলি বাহিরের বিষয় দ্বারাও প্রভাবান্বিত হয়। যেমন জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা, সঞ্চিত ধনরক্ষার জন্য উপযুক্ত বিশ্বাসী প্রতিষ্ঠান, সুদের হার ইত্যাদি। (১) কোন দেশের অবস্থা যদি এমন হয় যে, জীবন এবং সম্পত্তির নিরাপত্তা সম্বন্ধে কোনরূপ নিশ্চয়তা নাই, তবে কেহই তাহার সঞ্চয়ের ফলভোগ সম্বন্ধে নিশ্চিত হইতে পারিবে না। তাহা হইলে কেহ কিছু সঞ্চয় করিতে চাহিবে না। (২) যদি সঞ্চিত অর্থ সংরক্ষণের জন্য বড় ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী প্রভৃতির ন্যায় বিশ্বাসী প্রতিষ্ঠান থাকে, তবে সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। (৩) আবার সুদের হারের উপর সঞ্চয়ের পরিমাণ নির্ভর করে; সাধারণতঃ সুদের হার যত বাড়িবে অর্থাৎ সঞ্চয়ের পুরস্কার যত বেশী হইবে, সঞ্চয়ের পরিমাণও তত বৃদ্ধি পাইবে। আবার সুদের হার হ্রাস পাইলে ইহার বিপরীত হইবে, অর্থাৎ সঞ্চয়ের পরিমাণ কমিয়া যাইবে।

ভারতবাসীর সঞ্চয়প্রবৃত্তি অন্যান্য দেশবাসীর মতই প্রবল। কিন্তু দেশের মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ খুবই সামান্য। ইহার কারণ খুঁজিতে খুব বেশী দূর যাইবার প্রয়োজন নাই। মুসলমান শাসনের শেষের দিকে এবং বৃটিশ শাসনের প্রারম্ভে দেশে জনসাধারণের জীবন এবং সম্পত্তির নিরাপত্তা ছিল না। কিন্তু বৃটিশ শাসনে জীবন এবং সম্পত্তি সম্পূর্ণ নিরাপদ হইয়াছিল। সুতরাং সামান্য সঞ্চয়ের এই কারণ বর্তমানে দূর হইয়া গিয়াছে। আর

একটি কারণ আমাদের দেশে বৃহৎ এবং বিশ্বাসী ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের অভাব। কিন্তু সর্ব্বপ্রধান কারণ এই যে, ভারতবর্ষের লোকেরা দরিদ্র। জনসাধারণের অধিকাংশ কৃষক। তাহাদের আয় এত সামান্য যে, তাহাদের নিজেদের দিন কাটান কষ্টকর। ফলে ভারতবর্ষের লোকের ব্যয়ের উদ্বৃত্ত আয় খুবই সামান্য। এইজন্য ভারতবর্ষের সঞ্চিত ধনের পরিমাণ খুবই অল্প।

Q. 15. *Who is an entrepreneur? What function does he perform in modern industrial organisation?* (C. U. 1928, 1933, 1949)

উঃ। জমি, শ্রম ও মূলধন এই তিনের ঠিকমত সংযোগ ব্যতীত উৎপাদনকার্য্য ভালভাবে চলিতে পারে না। যিনি উৎপাদনকার্য্যে এই সংযোগের কাজ করেন, তাঁহাকে বলা হয় উৎপাদনের কর্ম্মকর্ত্তা। উৎপাদনকার্য্যের প্রাথমিক অবস্থায়ও কিছু পরিমাণ সংযোগ-নৈপুণ্যের প্রয়োজন হইত। বর্ত্তমানকালে উৎপাদন ক্রমশই জটিল আকার ধারণ করিয়াছে, সুতরাং সংযোগ-নৈপুণ্যের প্রযোজনও বৃদ্ধি পাইয়াছে।

কর্ম্মকর্ত্তার কাজ হইল এই সংযোগসাধন; উৎপাদনের সার্থকতা অথবা ব্যর্থতা বহুলাংশে তাঁহার সামর্থ্যের উপর নির্ভর করে। এইজন্য তাঁহাকে "শিল্পের পরিচালক" বলা হয়।

বর্ত্তমানকালে কর্ম্মকর্ত্তা নিম্নলিখিত কাজগুলি করিয়া থাকেন:—

(ক) **উৎপাদন সংযোগসাধন**:—এই সংযোগসাধনের কার্য্যকে আবার দুইভাগে বিভক্ত করা যায়: (১) পরিচালনকার্য্য এবং (২) বণ্টনব্যবস্থা।

(১) উৎপাদনের প্রকৃতি, গুণ এবং পরিমাণ নির্ণয় করাও কর্ম্মকর্ত্তার কাজ। কর্ম্মকর্ত্তা জমি এবং শ্রম ভাড়া করেন; যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল ক্রয়

করেন, এবং এই সকল বস্তুর এইরূপভাবে সংযোগসাধন করেন যাহার ফলে উৎপাদনব্যয় যতদূর সম্ভব হ্রাস হয়। উৎপাদন শেষ হইয়া গেলে উৎপন্ন জিনিষ বাজারে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করাও কর্ম্মকর্ত্তার কাজ।

(২) উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানের প্রাপ্য তাঁহাকে শোধ করিয়া দিতে হয়। জমির মালিককে খাজনা, মূলধনের মালিককে সুদ এবং শ্রমিককে বেতন দেওয়ার দায়িত্ব কর্ম্মকর্ত্তার উপর ন্যস্ত। তাঁহার নিজের পুরস্কারস্বরূপ তাঁহার ভাগে লভ্যাংশ পড়ে এবং উৎপাদন পরিচালনায় তিনি কতখানি সার্থকতা লাভ করিলেন তাহার উপর তাঁহার লাভের পরিমাণ নির্ভর করে।

(খ) **উৎপাদনের ঝুঁকি বহন করা** : কর্ম্মকর্ত্তার সকল প্রচেষ্টা সত্ত্বেও দেখা যায়, তাঁহার উৎপন্ন মালের চাহিদা নাই এবং উৎপন্ন মাল বাজারে বিক্রয় করা গেল না। অথবা হয়তো মূল্য এত কমিয়া গেল যে, তাঁহাকে লোকসান দিতে হইল। এই সকল ঝুঁকি এবং অনিশ্চয়তা কর্ম্মকর্ত্তাকে বহন করিতে হয়। প্রথমে তাঁহাকে উৎপাদনের একটি পরিকল্পনা করিয়া লইতে হয়, তারপর মাসের পর মাস এবং বৎসরের পর বৎসর কাজ করিয়া দ্রব্যনির্ম্মাণ শেষ হয়। ইতিমধ্যে লোকের রুচির পরিবর্ত্তন হইতে পারে, অথবা তাহাদের চাহিদা কমিয়া যাইতে পারে, অথবা ব্যবসায়ে মন্দা পড়িতে পারে। এই সকল ঘটনা তাঁহার পরিকল্পনা ওলটপালট করিয়া দিতে পারে। ফলে, তাঁহাকে হয়তো লোকসান দিতে হইবে। ব্যবসায়ে এই ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা বহন করা কর্ম্মকর্ত্তার কাজ।

পঞ্চম অধ্যায়

শ্রমবিভাগ

Q. 1. *(a) What do you mean by "division of labour?"* (C. U. 1927 ; U. P. 1938, 1942)

(b) Mention the different forms of division of labour.

উঃ। (ক) উৎপাদন-পদ্ধতিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করার নাম হইল শ্রমবিভাগ। শ্রমবিভাগের অর্থ হইল উৎপাদনকার্য্যকে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করা। প্রত্যেক অংশের ভার ভিন্ন লোকের হাতে দেওয়া হয়। বর্ত্তমান যুগে কোন লোকই তাহার প্রয়োজনীয় জিনিষের প্রত্যেকটি নিজ হাতে প্রস্তুত করে না। সে নিজে মাত্র একটি বিশিষ্ট কাজেই আত্মনিয়োগ করে এবং অন্যান্য দ্রব্যের জন্য অপরের উপর নির্ভর করে। প্রত্যেকে প্রত্যেকটি কাজ না করিয়া একজন মাত্র একটি বিশেষ কাজেই নিজেকে নিয়োগ করে। তাঁতী কেবলমাত্র তাঁত বোনে, মুচী কেবল জুতা তৈয়ারী করে। উৎপাদনের এই বিশেষত্ব কেবলমাত্র ব্যক্তিতেই সীমাবদ্ধ নয়। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান বিভিন্ন বস্তুর উৎপাদনে নিযুক্ত থাকে। যেমন বাংলাদেশ পাট উৎপাদন করে, আমেরিকা গম এবং তুলা উৎপাদন করে।

শ্রমবিভাগকে সফল করিতে হইলে বিভিন্ন লোক ও দেশের মধ্যে সহযোগিতা করা প্রয়োজন। নিজেদের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য প্রত্যেক লোককে অন্য লোকের সহযোগিতা করিতে হইবে। যে তাঁতী কেবল তাঁত বয়ন করে, তাহাকে অপরাপর দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় বস্তুর জন্য অন্যের সহযোগিতার উপর নির্ভর করিতে হয়। এতদ্ব্যতীত, প্রত্যেক বস্তুর উৎ-পাদনকে অসংখ্য ক্ষুদ্র পদ্ধতিতে বিভক্ত করা হইয়াছে। ইহাদের প্রত্যেকে অপরের সঙ্গে সহযোগিতা না করিলে সম্পূর্ণ বস্তুর উৎপাদন সম্ভব হইবে না।

শ্রমবিভাগ করিলে বিনিময়-ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়। তাঁতী তাহার উৎপন্ন বস্ত্রকে অন্যের উৎপন্ন জিনিষের সঙ্গে বিনিময় না করিলে নিজে চাল পাইবে না এবং চাষী কাপড় পাইবে না।

(খ) শ্রমবিভাগের চারিটি বিভিন্ন রূপ আছে: (১) ব্যবসায় বা বৃত্তির বিভাগ; (২) একটি সম্পূর্ণ পদ্ধতিতে শ্রমবিভাগ; (৩) অসম্পূর্ণ পদ্ধতিতে উৎপাদন-বিভাগ; (৪) শ্রমের স্থানগত বিভাগ।

(১) **ব্যবসায় বা বৃত্তির বিভাগে** শ্রমবিভাগের আদিম প্রকাশ হইয়াছিল। চাষীর কাজ ছিল মাত্র জমি চাষ করা, সূত্রধর কেবল কাঠের কাজ লইয়া থাকিত, জেলে মাছ ধরিত। সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য একটি সম্পূর্ণ কাজ বা বৃত্তি ঠিক করা ছিল।

(২) **উৎপাদনকার্য্যের সম্পূর্ণ পদ্ধতিমূলক শ্রমবিভাগ**:—কিন্তু শ্রমবিভাগ আরও অধিকদূর অগ্রসর হইয়াছে। কার্য্যতঃ বর্ত্তমানে কোন ব্যক্তিই নিজ হাতে সম্পূর্ণ কোন একটি বস্তু নির্ম্মাণ করে না। প্রত্যেকটি বৃত্তি অথবা কাজকে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র পদ্ধতিতে বিভক্ত করা হয়; মুচী আজ আর সম্পূর্ণ জুতা নিজ হস্তে প্রস্তুত করে না। তাহাদের মধ্যে একদল কেবল চামড়া তৈয়ারী করে এবং এই চামড়া কিনিয়া লইয়া আর একদল জুতা সেলাই করে। এইভাবে বহুলোকের চেষ্টা ও সহযোগিতার ফলে একটা সম্পূর্ণ জিনিষ নির্ম্মিত হয়।

(৩) **অসম্পূর্ণ পদ্ধতিতে উৎপাদন-বিভাগ**:—যন্ত্রের প্রয়োগ এবং কারখানা ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইবার পর হইতে শ্রমবিভাগের আরও বিস্তার-সাধন হইয়াছে। চামড়া আজ আর একজন লোকে প্রস্তুত করে না। মুচী নিজ হাতে সম্পূর্ণ জুতা সেলাই করে না। এইভাবে প্রত্যেক সম্পূর্ণ পদ্ধতিকে ভাগ করিয়া অনেকগুলি অসম্পূর্ণ পদ্ধতিতে বিভক্ত করা হইয়াছে; এবং ইহাদের সকলের সমবেত প্রচেষ্টার ফলে একটি সম্পূর্ণ দ্রব্য প্রস্তুত হয়।

(৪) **শ্রমের স্থানগত বিভাগ** ঃ—বর্ত্তমানে কেবলমাত্র শ্রমিকই নয়, বিভিন্ন স্থান বিভিন্ন বস্তুর উৎপাদনে নিযুক্ত আছে। যেমন, কোন লোক তাহার নিজ পছন্দমত বৃত্তি বাছিয়া লয়, সেইরূপ বিভিন্ন অঞ্চল তাহার বিশেষ সুযোগ-সুবিধা অনুরূপ বিভিন্ন বস্তু উৎপাদন করে। পাট এবং চা উৎপাদনে বাংলাদেশের বিশেষ সুবিধা আছে; এইজন্য এই দুইটি দ্রব্যের উৎপাদনে বাংলাদেশ বৈশিষ্ট্য অর্জ্জন করিয়াছে। শ্রমবিভাগের এইরূপ আঞ্চলিক প্রকাশকে স্থানগত শ্রমবিভাগ বলা হয়।

Q. 2. *Explain the advantages and disadvantages of division of labour.* (C. U. 1926, 1931, 1933, 1938, 1944, 1946, 1955 ; Pre-Univ. 1961)

উঃ। শ্রমবিভাগের ফলে নিম্নলিখিত **সুবিধাগুলি** পাওয়া যায় :—

(ক) **শ্রমবিভাগ শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধি করে** ঃ—বর্ত্তমানে প্রত্যেক শ্রমিক সারাজীবন ধরিয়া কেবলমাত্র একটি কাজে নিযুক্ত থাকে। ফলে সেই কাজে তাহার বিশেষ দক্ষতা জন্মায। যে লোক সারাজীবন ধরিয়া টাইপ করে, সে দ্রুত টাইপ করিতে পারিবে। ক্রমাগত অভ্যাসে লোকের দক্ষতা বৃদ্ধি পায।

(খ) **শ্রমবিভাগের ফলে প্রত্যেকেই নিজ সামর্থ্য বা গুণ অনুযায়ী কাজ করিতে পারে** ঃ—প্রত্যেক লোক নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ বাছিয়া লইতে পারে বলিযা এই ব্যবস্থায অনেক সুবিধা হয। অনেকে এক একটি বিশেষ গুণ লইয়া জন্মগ্রহণ করে। কেহ হযতো যন্ত্রপাতির কাজ ভাল পারে, কাহারো বা সঙ্গীতে রুচি আছে, আবার কেহ বা চিত্রকলায় পারদর্শী। উৎপাদনকার্য্য যখন ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হয, তখন প্রত্যেককেই নিজ সামর্থ্য বা গুণ অনুযাযী কাজ দেওযা যায। যাহাদের শুধু গায়ের জোর আছে, তাহাদের মাটি খোঁড়া, কয়লা কাটা প্রভৃতি কঠোর পরিশ্রমের কাজ দেওয়া হইবে। আবার যাহারা বুদ্ধিমান্ এবং অতি উচ্চশ্রেণীর দক্ষতাসম্পন্ন,

তাহাদিগকে দেওয়া হইবে এইরূপ কাজ যেখানে বুদ্ধি ও দক্ষতার প্রয়োজন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিশ্চয়ই রন্ধন করিতে দেওয়া উচিত হইত না। রন্ধনকার্য্যে নিপুণ এক ব্যক্তি তাঁহার জন্য রন্ধন করিত এবং তিনি কবিতা লিখিয়া সমস্ত পৃথিবীকে আনন্দ দান করিয়াছেন।

(গ) **শ্রমবিভাগের ফলে অধিকসংখ্যক যন্ত্রপাতি ব্যবহার হইতে পারে**ঃ—যখন কোন কার্য্যকে বিভক্ত এবং উপবিভক্ত করা হয়, তখন প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র অংশ খুব সহজ এবং একধরণের হইয়া যায়। এই সকল সহজ কাজ করিবার জন্য তখন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা সম্ভব হয়। যন্ত্রপাতির ব্যবহারে উৎপাদন বৃদ্ধি পায় অথচ ব্যয় কমিয়া যায়।

(ঘ) **শ্রমবিভাগের ফলে অনেক যন্ত্রের আবিষ্কার সম্ভব হইয়াছে**ঃ—এই পদ্ধতিতে ক্ষুদ্র অংশগুলি খুব সহজ এবং প্রায় একধরণের হইয়া পড়ে। ইহা দেখিয়া হয়তো কোন বুদ্ধিমান্ লোক এই কাজের জন্য একটি যন্ত্র আবিষ্কার করিতে পারে। এইভাবে দৈনন্দিন কাজ দেখিয়া অনেক যন্ত্রের আবিষ্কার সম্ভবপর হইয়াছে।

(ঙ) **শ্রমবিভাগের ফলে ব্যবসায় অথবা বৃত্তিশিক্ষার সময় সংক্ষিপ্ত হইয়াছে**ঃ—শ্রমিককে এখন আর জুতা প্রস্তুত করিবার সম্পূর্ণ পদ্ধতি শিখিয়া লইতে হয় না। জুতা তৈয়ারীর কাজকে অনেক ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে এবং ইহার একটি অংশ মাত্র শিখিয়া লইতে পারিলেই তাহার চলে।

(চ) **শ্রমবিভাগের ফলে উৎপাদনের সময় কম লাগে**:—যে শ্রমিককে অনেক কাজ করিতে হয় তাহাকে ভিন্ন জায়গায় যাইয়া হয়তো সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিতে হয়। এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় যাইতে, কিংবা একধরণের যন্ত্র ছাড়িয়া অন্য যন্ত্র লইতে অনেক সময় নষ্ট হয়। কিন্তু বর্ত্তমান শ্রমবিভাগে শ্রমিকগণ সর্ব্বদা একস্থানেই থাকে

এবং একধরণের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে। ফলে, তাহাদের সময় কম নষ্ট হয় এবং যন্ত্রপাতিও কম লাগে।

(ছ) **শ্রমবিভাগের ফলে উৎপাদনের ব্যয় হ্রাস পায়ঃ—** স্থানগত শ্রমবিভাগের কতকগুলি সুবিধা আছে। বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন বস্তুর উৎপাদনের জন্য বিশেষ বিশেষ সুবিধা আছে। বাংলাদেশে পাট উৎপাদন করা যায় সর্ব্বাপেক্ষা কম খরচে, তাহার কারণ বাংলাদেশের জলবায়ু এবং মাটি পাট-উৎপাদনের পক্ষে সবচেয়ে বেশী উপযোগী। এইভাবে স্থানগত শ্রমবিভাগের ফলে সর্ব্বাপেক্ষা কম ব্যয়ে উৎপাদন সম্ভবপর হয়।

এই সকল সুবিধার ফলে একদিকে যেমন উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, অন্য দিকে উৎপাদনেব ব্যয় অনেক পরিমাণে হ্রাস পায়। বর্ত্তমানকালে এইজন্যই আমরা অল্প মূল্যে বহুবস্তুর ব্যবহার করিতে পারিতেছি।

দোষাবলী ঃ—(ক) শ্রমবিভাগের ফলে একজন শ্রমিককে সারাজীবন কেবল একধরণের কাজ লইয়া থাকিতে হয়। ফলে, কাজে চরম একঘেয়েমি আসে। জীবন এবং কর্ম্ম উভয়ই নীরস হইয়া পড়ে।

(খ) এইরূপ কাজের একঘেযেমির ফলে শ্রমিক তাহার কাজে উৎসাহহীন হইয়া পড়ে। পূর্ব্বে মুচী নিজেই সম্পূর্ণ জুতা তৈযার করিত। সে তাহার কাজে আনন্দ অনুভব করিত, এবং ভাল জুতা তৈয়ারী করিতে পারে বলিয়া গর্ব্ব অনুভব করিত। কিন্তু বর্ত্তমানে শ্রমবিভাগের ফলে সে হয়তো জুতায় কেবল বোতাম লাগায়। এই অবস্থায় খুব অল্পসংখ্যক শ্রমিকই নিজের কাজে কোন উৎসাহবোধ করে।

(গ) এইরূপ একঘেয়ে কাজ শ্রমিকের মানসিক সুকুমার বৃত্তিগুলি নষ্ট করিয়া দেয়। ফলে, পরবর্ত্তী কালে তাহাদের কার্য্যক্ষমতার অভাব দেখা যায়।

(ঘ) শ্রমবিভাগের ফলে কারখানার প্রবর্ত্তন হইয়াছে এবং এই কারখানা ব্যবস্থার সঙ্গে সমাজে নানাপ্রকারের দোষ-ত্রুটি আসিয়াছে। জনবহুল সহর এবং অস্বাস্থ্যকর বস্তি—এই দুই-এর জন্য কারখানাই দায়ী।

তবে ইহা সুনিশ্চিত যে, শ্রমবিভাগের ফলে মানুষের অনেক সুবিধা হইয়াছে। উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িয়া গিয়াছে; উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য কমিয়াছে। শ্রমিকশ্রেণীর জীবনধারণের মান উন্নত হইয়াছে; এবং তাহাদের প্রপিতামহগণ স্বপ্নেও যাহা ভাবিতে পারে নাই এইরূপ বস্তু বর্ত্তমানকালের শ্রমিকরা ভোগ করিতে পারিতেছে।

Q. 3 *Discuss the advantages and disadvantages of large-scale production.* (C. U. 1929, 1930, 1933, 1935, 1952, 1958 ; P. U. 1962)

উঃ। বৃহদায়তন-উৎপাদন শ্রমবিভাগের একটি ফল। একটি কারিগরকে এখন আর কুটিরে বসিয়া মামুলি যন্ত্রপাতির সাহায্যে একাকী কোন দ্রব্য প্রস্তুত করিতে হয় না। কুটিরশিল্পের স্থানে আজ বড় বড় কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সেখানে হাজার হাজার শ্রমিক বহু টন মাল প্রস্তুত করে।

বৃহদায়তন-উৎপাদনে নিম্নলিখিত **সুবিধাগুলি** পাওয়া যায় :—

(ক) বৃহদায়তন-উৎপাদনে শ্রমবিভাগের সম্পূর্ণ ফল পাওয়া যায় :— এই কারখানার মালিক যতদূর সম্ভব শ্রমবিভাগ করিতে পারেন। যে শ্রমিক যে কাজে দক্ষ তাহাকে সেই কাজ দিতে পারেন, এবং বহু যন্ত্রের ব্যবহার করিতে পারেন। ফলে, তিনি অল্পব্যয়ে অধিক উৎপাদন করিতে পারেন।

(খ) বহু পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের সুবিধা :—যে ক্রেতা একসঙ্গে অধিক পরিমাণ কাঁচামাল ক্রয় করেন, তিনি একজন ক্ষুদ্র ক্রেতা অপেক্ষা কিছু কম দামে মাল পান। আবার, যে বিক্রেতা একসঙ্গে অধিকসংখ্যক জিনিষ বিক্রয় করেন, তাঁহার জিনিষ-প্রতি বিক্রয়ের ব্যয়ও কম পড়ে।

(গ) যন্ত্র-ব্যবহারের সুবিধা :—কেবলমাত্র বৃহৎ ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান-

গুলিতেই বর্ত্তমানকালের বিরাট ও উৎকৃষ্ট যন্ত্রের ব্যবহার করা সম্ভব হয়। ফলে অল্পব্যয়ে অধিক উৎপাদন করা যায়।

(ঘ) দক্ষতার সুবিধা :—যিনি বড় কারখানার মালিক, তাঁহার মূলধনও প্রচুর। তিনি অনায়াসে অতি দক্ষ ও বিচক্ষণ শ্রমিক নিয়োগ করিতে পারেন। সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত লোককে নিয়োগ করিলে উৎপাদনের পরিমাণও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হয়।

(ঙ) আনুষঙ্গিক দ্রব্য ব্যবহারের সুবিধা :—ব্যবসায়ের আয়তন যত বৃহৎ হইবে তত কম জিনিষই নষ্ট হইবে। ছোট ব্যবসায়ী অনেক আনুষঙ্গিক দ্রব্য (By-Product) ব্যবহার করিতে সমর্থ হয় না, এবং সেইগুলি নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু বড় ব্যবসায়ে কোন জিনিষ নষ্ট হয় না। আমেরিকায় মাংস-ব্যবসায়ে, মৃত জন্তুর চুল এবং রক্ত দ্বারা বিভিন্ন জিনিষ প্রস্তুত হয়। কিন্তু কোন ছোট ব্যবসায-প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এইরূপ করা সম্ভবপর হইত না।

(চ) বড় কারখানার মালিক পরীক্ষা এবং গবেষণাকার্য্যের জন্য অনেক বেশী অর্থ ব্যয় করিতে পারে। গবেষণার ফলে নূতন নূতন উৎপাদনপদ্ধতির আবিষ্কার হইলে তাহার বেশী লাভ হয। তাহার পক্ষে বৈজ্ঞানিক উন্নতির সঙ্গে তাল রাখিযা চলা সম্ভবপর হয়।

(ছ) একজন বড় ব্যবসায়ী ব্যবসায়ের প্রচারকার্য্য ও বিজ্ঞাপনের জন্য অধিক অর্থ ব্যয করিতে পারে। বর্ত্তমানকালে ব্যবসায়ে বিজ্ঞাপন দেওয়া সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বিষয়। যে ব্যবসাযের প্রচার যত বেশী, তাহার বিক্রয়ের পরিমাণ তত বেশী।

(জ) বৃহদায়তন-উৎপাদনের অর্থ হইল অল্পব্যয়ে অধিকতর উৎপাদন। ফলে ক্রেতা হিসাবে সকলেরই লাভ হয়। বৃহদায়তন কারখানায় নির্ম্মিত হয় বলিয়াই সব জিনিষ সস্তায় পাওয়া যায়।

বৃহদায়তন-উৎপাদনের নিম্নলিখিত **অসুবিধাগুলি** আছে :—

(ক) বড় কারখানায় বহু শ্রমিক নিযুক্ত থাকে। সুতরাং কারখানার চারিপার্শ্বে ছোট-বড় সহর গড়িয়া উঠে। এই সব সহর হঠাৎ অযত্নে গড়িয়া উঠে বলিয়া প্রায়ই অস্বাস্থ্যকর হয়। ইহার জন্য শ্রমিককে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়।

(খ) বৃহদাযতন-উৎপাদনের অর্থ বড় বড় কারখানা। তাহার ফলে শ্রমিকের স্বাধীনতা নষ্ট হইযাছে। শ্রমিক আজ একটি বৃহৎ যন্ত্রের অংশ মাত্র। বিত্তশালী মালিকের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ না হইলে শ্রমিকগণ একেবারেই অসহায়।

(গ) বৃহদাযতন-উৎপাদনের প্রবর্ত্তনের সঙ্গে মালিক এবং শ্রমিকের মুল্য্য সর্ব্বপ্রকার ব্যক্তিগত সম্পর্কের বিচ্ছেদ হইয়াছে।

Q. 4. *Discuss the limits to large-scale production.* (U. P. 1935)

উঃ। বৃহদায়তন-উৎপাদনে বেশী দ্রব্য নির্ম্মিত হয়, গড়পড়তা ব্যয়ও কম পড়ে। সুতরাং আমরা আশা করিতে পারি যে, প্রত্যেক ব্যবসায-প্রতিষ্ঠান বৃহদাকারে সংগঠিত হইবে। আসলে কিন্তু ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান মাত্রই বৃহদাকার ধারণ করে না। সর্ব্বত্রই দেখা যায় বড় কারখানার পাশে ক্ষুদ্রকায় কারখানাও থাকে। ইহার কারণ কি? কেন সকল ব্যবসায়ী বড় বড় কারখানাও স্থাপন করে না? কেন ছোট কারখানা আছে? ইহার তিনটি কারণ আছে :—

(ক) কতকগুলি ব্যবসায় আছে যাহা ক্ষুদ্র আয়তনে না করিয়া উপায় নাই। অনেক লোক আছে যাহারা বাজারের প্রস্তুত জামা বা জুতা লইয়া সন্তুষ্ট হয় না। হয় এইগুলি তাহাদের রুচিবোধকে তৃপ্তি দেয় না, অথবা তাহাদের পক্ষে ঠিকমত উপযোগী হয় না। এইজন্য বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র দর্জ্জি-প্রতিষ্ঠান এবং জুতার কারখানা আছে। আবার সৌখিন শিল্পজাত

দ্রব্যগুলি বৃহদায়তন কারখানায় প্রস্তুত করা যায় না। অলঙ্কার, মণিমুক্তার জিনিষ, বেনারসী শাড়ী প্রভৃতি কেবলমাত্র ক্ষুদ্রায়তন প্রতিষ্ঠানেই প্রস্তুত করা সম্ভব। কারণ, একই প্যাটার্ণের গহনা অথবা একই রং বা পাড়যুক্ত শাড়ী মহিলাদিগের পছন্দ হয় না। তাঁহারা প্রত্যেকে ভিন্ন প্যাটার্ণের শাড়ী বা গহনা পছন্দ করেন। ফলে এই সকল জিনিষ বড় কারখানায় প্রস্তুত করা সম্ভব নহে।

(খ) উৎপাদনের আয়তন বৃদ্ধি করিলে প্রথম প্রথম উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িবে ও গড়পড়তা ব্যয় কম হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু কারখানা বড় হইতে হইতে এমন একদিন আসিবে, যখন উৎপাদনের ব্যয় না কমিয়া বাড়িয়া যাইবে। যে পরিচালনা করিবে, তাহার ক্ষমতার সীমা আছে। কারখানার আয়তন খুব বেশী বড় হইলে মালিকের ক্ষমতার সীমা অতিক্রম করে। সে সকল দিকে সমান নজর দিতে পারে না বলিয়া উৎপাদনের ব্যয় বৃদ্ধি পাইবে। ফোর্ড বা টাটার মত যাঁহারা বড় কারখানা পরিচালনার যোগ্যতা রাখেন, এমন মালিক খুব কম আছেন। কারখানার আয়তন যতই বাড়ে, তাহার পরিচালনাও ততই শক্ত হয়। সাধারণতঃ মালিকের পক্ষে তখন আর প্রত্যেক অংশের পরিচালনা এবং পরিদর্শন করা সম্ভব হয় না। শ্রমিকগণ তখন হয়তো কাজে ফাঁকি দিবে। ফলে উৎপাদনের ব্যয় বৃদ্ধি হইবে। এইজন্য উৎপাদনের আয়তনবৃদ্ধির একটি সীমা আছে। উৎপাদনের আয়তন সেই সীমা লঙ্ঘন করিলে, লাভ অপেক্ষা লোকসান দেখা দিবে।

(গ) শ্রমবিভাগ এবং বৃহদায়তন-উৎপাদন বাজারের আয়তনের উপর নির্ভর করে (Division of labour is limited by the extent of the market)। যখন কোন দ্রব্যের বাজার ক্ষুদ্র, চাহিদা কম, তখন কেবলমাত্র অল্পসংখ্যক দ্রব্যই বিক্রয় করা সম্ভব। যে জিনিষের বিক্রয় কম, তাহা বেশী হারে উৎপাদন করিয়া লাভ নাই। যখন বেশী মাল কাটে,

কেবলমাত্র তখনই বৃহদায়তন-উৎপাদন লাভজনক হয়। অনেক জিনিষের চাহিদা এত অল্প থাকে যে, তাহাদের বৃহদায়তনে উৎপাদন করায় লাভ নাই।

ইহা হইতে বোঝা যায়, কেন বৃহদায়তন-উৎপাদনের এত সুবিধা থাকা সত্ত্বেও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও তাহার কারখানা টিকিয়া আছে।

Q. 5. *Discuss the advantages of the small producer.* (C. U. 1930, 1935, 1952; P. U. 1962)

Can a small producer hold his own in the presence of large-scale manufacture in modern times? (C. U. 1938)

উঃ। অনেক ক্ষেত্রেই আমরা দেখি, ছোট ব্যবসায়ী বড় ব্যবসায়ীর পাশে টিকিয়া আছে। ইহা খুবই অসঙ্গত মনে হইবে। কারণ আমরা জানি যে, বৃহদায়তন-উৎপাদনে অল্প ব্যয়ে অধিক উৎপাদন সম্ভব হয়। ফলে, বড ব্যবসায়ী তাহার উৎপন্ন দ্রব্য বাজারে কম দামে বিক্রয় করিয়া অতি সহজেই ছোট ব্যবসায়ীকে বাজার হইতে হটাইয়া দিতে পারে। ইহা সত্ত্বেও যখন ছোট ব্যবসায়ী টিকিয়া থাকে তখন বুঝিতে হইবে যে, ইহার সঙ্গত কারণ আছে। ছোট ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের কতকগুলি বিশেষ সুবিধা আছে, যাহার জন্য ইহা আজও বাঁচিয়া আছে:

(ক) ছোট ব্যবসায়ী তাহার কারখানায় সকল দিকে মনোযোগ দিতে পারে যাহা একজন বড ব্যবসায়ীর পক্ষে অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না। ছোট প্রতিষ্ঠানে মালিক সর্ব্বত্র দৃষ্টি রাখিতে পারে। শ্রমিকগণ তাহার চোখের সম্মুখে কাজ করে, ফলে, তাহারা কাজে ফাঁকি দিতে পারে না। মালিক প্রত্যেক কর্ম্মচারীকে জানে ও তাহার সঙ্গে হৃদ্যতা রাখিতে পারে। বড় মালিকের পক্ষে তাহা সম্ভব নহে।

(খ) ব্যবসায়ী ক্রেতাদিগের প্রতি অধিক নজর দিতে পারে। প্রত্যেক ক্রেতার ভিন্ন রুচিমত জিনিষ প্রস্তুত করিতে পারে। বড় কারখানার

যন্ত্রনির্মিত জিনিষ সাধারণতঃ একই ধরণের হয়। সুতরাং এইদিকে ছোট প্রতিষ্ঠানের বিশেষ সুবিধা আছে। এইজন্য আমরা ছোট দর্জ্জির দোকান, জুতার কারখানা দেখিতে পাই।

(গ) সৌখিন ও বিচিত্র জিনিষ একমাত্র ছোট প্রতিষ্ঠানেই করা সম্ভব। কারণ, আমরা জানি যে, বড় প্রতিষ্ঠানে উৎপন্ন দ্রব্য একই ধরণের হইতে বাধ্য। সৌখিন জিনিষ (যেমন, হস্তিদন্তনির্মিত বিশেষ কারুকার্য্যখচিত জিনিষ) কেবলমাত্র ছোট প্রতিষ্ঠানে দক্ষ কারিগর দ্বারাই নির্মিত হয়।

(ঘ) কোন কোন শিল্পে বেশী দূর পর্য্যন্ত শ্রমবিভাগ করা সম্ভবপর নয়। তাহাদের উৎপন্ন দ্রব্য একধরণের করিলে চলে না। প্রথম শ্রেণীর ক্ষুর কলে তৈয়ারী করা যায় না, কেবলমাত্র দক্ষ কারিগর দ্বারাই তাহার উৎপাদন সম্ভব।

Q. 6. *What do you mean by localisation of industries? Examine the causes leading to the lacalisation of industries in particular areas.* (C. U. 1927, 1941, 1950, 1956)

উঃ। একই জিনিষের উৎপাদক অথবা বিক্রেতা-প্রতিষ্ঠানগুলি যখন একটি নির্দ্দিষ্ট অঞ্চলে স্থাপিত হয়, তখন ইহাকে শিল্পের 'একদেশতা' বলা হয়। হুগলী নদীর তীরে এবং নারায়ণগঞ্জের আশে-পাশে পাটশিল্পের 'একদেশতা' হইয়াছে। রাণীগঞ্জ ও ঝরিয়ার কয়লা-শিল্পের 'একদেশতা' আছে।

একদেশতার কারণ :—বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে কয়েকটি করিয়া শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিলে কতকগুলি বিশেষ সুবিধা পাওয়া যায়। প্রত্যেক অঞ্চল সেই সেই দ্রব্যের উৎপাদন অথবা বিক্রয়ে আত্মনিয়োগ করে যাহাতে তাহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুবিধা আছে। নিম্নলিখিত কারণের জন্য শিল্পের একদেশতা হয় :—

(ক) **কাঁচামালের নিকটবর্ত্তিতা** ঃ—অনেক শিল্পপ্রতিষ্ঠান সেই সমস্ত অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয়, যেখানে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে এবং

অতি সুলভে পাওয়া যায়। খনিজ শিল্পের পত্তন হয় খনি অঞ্চলেই (যেমন কয়লার খনি, সোনার খনি প্রভৃতি)। টাটার লৌহ এবং ইস্পাতশিল্প জামসেদপুরে স্থাপিত হইয়াছে, তাহার কারণ লৌহশিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল (লোহার খনি, কয়লা প্রভৃতি) নিকটবর্ত্তী অঞ্চলেই পাওয়া যায়। নারায়ণগঞ্জে পাটশিল্পের প্রতিষ্ঠা হওয়ার কারণ পূর্ব্ববঙ্গে অপর্য্যাপ্ত পাট জন্মে। চা-শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে সেই সকল অঞ্চলে (যেমন দার্জ্জিলিং, আসাম প্রভৃতি) যেখানে অতি সহজেই চা চাষ করা যায়।

(খ) **শক্তির নিকটবর্ত্তিতা** :—কারখানায় ইঞ্জিন চালাইতে হইলে কয়লা, পেট্রোল বা বৈদ্যুতিক শক্তির প্রয়োজন। সুতরাং যে সকল অঞ্চলে কয়লা, পেট্রোল অথবা বিদ্যুৎশক্তি সহজপ্রাপ্য, অনেক সময়ে সেই সমস্ত অঞ্চলেই শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি গড়িয়া উঠে। বর্ত্তমানকালে কয়লার খনি অথবা জলবিদ্যুৎশক্তির নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে কারখানাগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়।

(গ) **বাজারের নিকটবর্ত্তিতা** :—মালিকেরা অনেক সময়েই তাহাদের কারখানা বাজারের আশে-পাশে স্থাপন করে। এইজন্য বড় সহরের নিকটবর্ত্তী অঞ্চলেই কারখানা গড়িয়া উঠে। কারণ, বড় সহরেই অধিকাংশ উৎপন্ন দ্রব্যের উপযুক্ত বাজার পাওযা যায়। হুগলী নদীর তীরে পাটের কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কারণ, কলিকাতা বন্দর হইতে অতি সহজেই বিদেশের বাজারে পাটের জিনিষ চালান করা যায়।

(ঘ) **জলবায়ু এবং স্থানীয় অবস্থা** :—কোন কোন অঞ্চলে বিশেষ বিশেষ শিল্প গড়িয়া ওঠার উপযোগী জলবায়ু আছে। ল্যাঙ্কাশায়ারের জলীয় আবহাওয়া সূতাকাটার পক্ষে উপযোগী। এইজন্য ল্যাঙ্কাশায়ার অঞ্চলে সূক্ষ্ম বস্ত্রশিল্পের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

(ঙ) **সরকারেব আমন্ত্রণ অথবা সহায়তা** :—সেকালের রাজারা অনেক সময় তাঁহাদের রাজসভার নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে, শিল্প প্রতিষ্ঠা করিবার

জন্য বিখ্যাত কারিগরদিগকে আমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যাইতেন। এইজন্ত ঢাকায় মস্‌লিন শিল্পের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল।

(চ) **শিল্পের একদেশতা**ঃ—প্রথমে কয়েকটি শিল্পপ্রতিষ্ঠান এক জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হইলে সেই জাতীয় অন্ত প্রতিষ্ঠানও সেইখানেই স্থাপিত হয়। কলেজ স্কোয়ারের পাশে বই-এর দোকান আছে বলিয়া অনেক সময় যাহারা নূতন দোকান খোলা ঠিক করে তাহারা সেইখানেই দোকান খুলিবার চেষ্টা করে। শিল্পের একদেশতাই আরও অধিকতর একদেশতার কারণ হয়।

Q. 7. *What are the advantages and drawbacks of localisation of industries?* (C. U. 1941)

উঃ। শিল্পের একদেশতার কতকগুলি **সুবিধা** আছে: (ক) যখন অনেকগুলি কারখানা একটি বিশেষ অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন এই শিল্পকার্য্যে নিপুণ শ্রমিকগণ সেই অঞ্চলে চাকুরীর আশায় উপস্থিত হয়। ফলে, দক্ষ শ্রমিক পাইতে মালিকদের কোন অসুবিধা হয় না। (খ) শ্রমিক-দিগের পুত্রকন্যাগণ অতি সহজেই তাহাদের বাপঠাকুর্দ্দার ব্যবসায়ে দক্ষতা লাভ করে। তাহার কারণ ছোটবেলা হইতে তাহারা সর্ব্বদা সেই শিল্প-সম্বন্ধীয় আলোচনা এবং কথাবার্ত্তার পরিবেশের মধ্যে বড হইয়া উঠে। (গ) ঐ শিল্পের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহের জন্য সেই অঞ্চলে অনেক আনুষঙ্গিক শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয়। (ঘ) সেই অঞ্চলের চলাচল ব্যবস্থাও শিল্পের উপযোগী হইয়া প্রস্তুত হয়। রেলকর্ত্তৃপক্ষ ঐ অঞ্চলে অবস্থিত শিল্পের উপযোগী রেল লাইন এবং বিশেষ গাড়ীর বন্দোবস্ত করে।

শিল্পের একদেশতার আবার **দোষও** আছে: (ক) যখন কোন শিল্প একটি বিশেষ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ হয়, তখন সেই অঞ্চলের অধিবাসিগণ তাহাদের জীবনধারণের জন্য প্রধানতঃ ঐ শিল্পের উপর নির্ভর করে। যদি কখনও চাহিদা কমিয়া সেই শিল্পে মন্দা দেখা দেয়, তখন অধিবাসীদিগের কষ্টের আর সীমা থাকে না। কারণ, তাহাদের অন্য কোন কাজ পাইবার সম্ভাবনা

থাকে না। এই শিল্পের উপর অতিরিক্ত পরিমাণে নির্ভরতা মোটেই যুক্তিযুক্ত নহে। (খ) যদি কোন অঞ্চলে একটি শিল্পই প্রতিষ্ঠিত থাকে, তখন নানাধরণের কাজের অভাব হয়। ফলে, শ্রমিকের স্ত্রী ও পরিবারের অন্যান্য কেহ কাজ পায় না। সুতরাং সেই শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে শ্রমিকদের অপেক্ষাকৃত উচ্চহারে বেতন দিতে হয়। কারণ, তাহা না হইলে শ্রমিকগণ এই অঞ্চলে যাইয়া বাস করিতে চাহিবে না।

Q. 8. *What are the various types of business organisation?* (C. U. 1955)

উঃ। পাঁচ রকমের শিল্পপ্রতিষ্ঠান আছে : (ক) এক-মালিকী কারবার, (খ) অংশীদারী কারবার, (গ) যৌথ-মূলধনী কারবার, (ঘ) সমবায়ী কারবার এবং (ঙ) সরকারী কারবার।

(ক) এক-মালিকী কারবার :—এই ধরণের কারবার সম্পূর্ণরূপে একজনের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে, এবং তিনি একাই সম্পূর্ণ ঝুঁকি বহন করেন। ইহাকে ব্যবসায়ের আদিমতম প্রতিষ্ঠান বলা যাইতে পারে।

ব্যবসায়ের একজন মাত্র মালিক হইলে অনেক সুবিধা হয়। মালিক নিজের স্বার্থে যত কম ব্যয়ে সম্ভব জিনিষ প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করিবে। কারখানার সব দিকে কড়া নজর রাখিবে। কিন্তু একজন লোকের পক্ষে বেশী মূলধন যোগান সম্ভব নহে। অথচ বর্ত্তমান যুগের শিল্পে বেশী পরিমাণে মূলধন বিনিয়োগ করিতে হয়। সুতরাং বর্ত্তমানে এই ধরণের কারবারের সংখ্যা কমিয়া যাইতেছে।

(খ) অংশীদারী কারবার :—দুই বা ততোধিক লোক মিলিয়া অংশীদারী কারবার করিতে পারে। প্রত্যেকেই কিছু মূলধন দেয় এবং ঝুঁকি বহন করে। ব্যবসায়ে লোকসান হইলে পাওনাদার প্রত্যেক অংশীদারের সকল সম্পত্তি দাবী করিতে পারে। অর্থাৎ এই ধরণের ব্যবসায়ে প্রত্যেক অংশীদারের দায়িত্ব অসীম (unlimited liability) থাকে।

এই ধরণের কারবারের অনেক সুবিধা আছে। একজন লোক বেশী মূলধন যোগাড় করিতে পারে না। কিন্তু কয়েকজন মিলিয়া বেশী মূলধন ব্যবসায়ে খাটাইতে পারে। মালিক বৃদ্ধবয়সে তাহারই কোন যোগ্য যুবক-কর্মচারীকে কারবারের অংশীদার করিয়া লইতে পারে এবং এইভাবে কারবারের স্থায়িত্ব বজায় রাখিতে পারে। কোন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান মূল-প্রতিষ্ঠাতার মৃত্যু অথবা অবসর গ্রহণের পরও পূর্ণ যোগ্যতার সঙ্গে পরিচালিত হইতে পারে।

কিন্তু ইহার প্রধান ক্রটি হইল অংশীদারের অসীম দায়িত্ব। সেইজন্য ধনিগণ অনেকেই এইরূপ ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের অংশীদার হইতে চাহে না।

(গ) **যৌথ-মূলধনী কারবার**ঃ—যৌথ-মূলধনী কারবারের বহুসংখ্যক অংশীদার মিলিযা শেয়ার কিনিয়া মূলধন সংগ্রহ করে। ব্যবসায়ের সকল ঝুঁকি এই অংশীদারদিগের স্কন্ধে থাকে। অংশীদারগণ নিজেদের মধ্য হইতে কয়েকজন লোক লইয়া একটি পরিচালকসভা গঠন করে। এই পরিচালকসভা কারবার চালায। অংশীদারদিগের প্রত্যেকের দাযিত্ব সীমাবদ্ধ। কোম্পানী ফেল হইলে অংশীদারগণ যে যত টাকার শেয়ার কিনিয়াছে, তাহার তত টাকাই খোয়া যাইবে। ইহার বেশী কাহাকেও লোকসান দিতে হয় না। এইজন্য এইরূপ যৌথ-কারবারে নামের পূর্ব্বে 'সীমাবদ্ধ' বা 'লিমিটেড' এই কথাটি লেখা থাকে।

(ঘ) **সমবায়ী কারবার**ঃ—এই ব্যবস্থায় শ্রমিকগণ নিজেরাই কারবারের মূলধন যোগায়, কারবার পরিচালনা করে, এবং সমস্ত ঝুঁকি বহন করে। কারবারের লভ্যাংশও সেইজন্য শ্রমিকদের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়।

(ঙ) **সরকারী কারবার**ঃ—এই ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের মূলধন সরবরাহ করে সরকার, নতুবা কোন পৌরসভা বা অন্য কোন স্থানীয় প্রতিষ্ঠান। সরকারী কারবারের ঝুঁকি করদাতাগণ সকলে মিলিয়া বহন করে।

Q. 9. *Describe the salient features of a public joint-stock company.* **(C. U. 1951, 1952)**

উঃ। যৌথ-মূলধনী কারবার বহুসংখ্যক ব্যক্তি মিলিয়া গঠন করে। এই ব্যক্তিগণকে অংশীদার বলা হয়। কারণ, তাহারা প্রত্যেকে কম-বেশী টাকার শেয়ার ক্রয় করে। এই শেয়ার-বিক্রয়লব্ধ অর্থই কোম্পানীর মূলধন। যাহারা শেয়ার কিনিয়াছে তাহারাই কোম্পানীর মালিক। তাহারা প্রতি বৎসর ভোট দিয়া কয়েকজন লোককে নির্ব্বাচন করে। এই ব্যক্তিরা পরিচালকসভা গঠন করে। পরিচালকসভার অধীনে বেতনভোগী কর্ম্মচারীদের দ্বারা কোম্পানীর কার্য্য পরিচালিত হয়।

যৌথ-মূলধনী কারবারের বৈশিষ্ট্য হইতেছে যে, ইহাতে প্রত্যেক অংশীদারের আর্থিক দায়িত্ব সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ কোম্পানী যদি ফেল হয় তবে অংশীদারগণ যে টাকার শেয়ার কিনিয়াছে শুধু সেই টাকাগুলিই খোয়া যাইবে। একজন অংশীদার কোম্পানীতে হয়তো এক হাজার টাকার শেয়ার কিনিয়াছে। কোম্পানী ফেল হইলে তাহার বড় জোর হাজার টাকা লোকসান যাইবে। কোম্পানীর দেনাদার তাহার অন্য কোন সম্পত্তিতে হাত দিতে পারে না। এইজন্য সাধারণ কথায় এই শ্রেণীর কারবারকে 'লিমিটেড কোম্পানী' বলে।

বৎসরান্তে কোম্পানীর যাহা নীট্ লাভ হয় তাহা অংশীদারদের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়।

Q. 10. *What are the various ways by which a typical joint-stock company raises its capital ?*

উঃ। যখন অনেক লোকের মূলধনে কোন কারবার গড়িয়া উঠে, তখন সেই কারবারকে যৌথ-মূলধনী কারবার বলে। যাহারা মূলধন সরবরাহ করে, তাহারা শেয়ার ক্রয় করে ও কারবারের সব ঝুঁকি বহন করে। লাভ-লোকসান হইলে তাহাদেরই হয়। পরিচালনকার্য্যের জন্য অংশীদারদের

নির্ব্বাচিত একটি পরিচালক-সভা থাকে। প্রত্যেক অংশীদারের দায়িত্বের পরিমাণ তাহার ক্রীত শেয়ারের মূল্যের সমান।

এই কারবারের মূলধন অংশীদারগণই সরবরাহ করে। অংশ বা শেয়ার সাধারণতঃ দুইভাগে বিভক্ত থাকে: (ক) সাধারণ শেয়ার এবং (খ) প্রেফারেন্স বা বিশেষ সুবিধার শেয়ার।

(ক) **সাধারণ শেয়ার**ঃ—কারবারের সাধারণ শেযার বা অংশ যাহারা ক্রয় করে, বৎসরের শেষে কারবারে লাভ হইলে তাহারা মুনাফার অংশ বা ডিভিডেণ্ড পায়। এই ডিভিডেণ্ডের হার বাৎসরিক মুনাফার পরিমাণের উপর নির্ভর করে। এই হার শূন্যতেও দাঁড়াইতে পারে, আবার এমন কি শতকরা ২০০ ভাগ বা ৩০০ ভাগও উঠিতে পারে।

(খ) **বিশেষ শেয়ার**ঃ—যাহারা প্রেফারেন্স শেয়ার ক্রয় করে তাহারা দুইটি বিষয়ে সাধারণ অংশীদার অপেক্ষা বিশেষ সুবিধা ভোগ করে। প্রথমতঃ, কারবারে লাভ হইলে আগে তাহাদের পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট হারে মুনাফার অংশ দিতে হইবে। তাহাদের মধ্যে বণ্টন করিয়া কিছু থাকিলে তবে সাধারণ অংশীদারদের পালা আসিবে। অবশ্য কারবারে কোন লাভ না হইলে এই বিশেষ অংশীদারদিগের কোন লভ্যাংশই দেওয়া হইবে না। সুতরাং তাহাদেরও কিছুটা ঝুঁকি বহন করিতে হয়। কিন্তু তাহাদের একমাত্র সুবিধা হইল এই যে, তাহাদের লভ্যাংশের হারের কোনরূপ ব্যতিক্রম করা হইবে না। বরাবর একই হারে দিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, ব্যবসায় ফেল হইলে, সকল সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া দেনা শোধ দিয়া যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তবে প্রথমে তাহা প্রেফারেন্স শেয়ারের মালিকদের মধ্যে ভাগ করিতে হইবে। তাহাদের দাবী মিটাইয়া কিছু বাকী থাকিলে সাধারণ অংশীদারগণ টাকা পাইবে।

ডিবেঞ্চারঃ—উপরি-উক্ত উপায়ে প্রাপ্ত মূলধন হয়তো প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নাও হইতে পারে। কোম্পানী তখন জনসাধারণের নিকট

বণ্ড বা ডিবেঞ্চার বিক্রয় করিয়া মূলধন সংগ্রহ করে। যাহারা বণ্ড বা ডিবেঞ্চার ক্রয় করে তাহারা কোম্পানীর পাওনাদার, এবং তাহাদের প্রত্যেক বৎসর নির্দ্দিষ্ট হারে সুদ দেওয়া হয়। তাহারা কোম্পানীর লাভের উপর কোনরূপ দাবী করিতে পারে না। কোম্পানীর কাজও তাহারা নিয়ন্ত্রণ করে না। একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য এই ডিবেঞ্চার চালু থাকে এবং এই নির্দ্দিষ্ট সময় অন্তে ডিবেঞ্চার-ক্রয়কারীদের পাওনাগণ্ডা সম্পূর্ণ মিটাইয়া দেওয়া হয়।

Q. 11. *Comment on the advantages and limitations of production by joint-stock companies.* (C. U. 1939, 1950, 1955)

উঃ। যৌথ-মূলধনী কারবারের প্রবর্ত্তন না হইলে বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতে পারিত না। এই কারবারে নিম্নলিখিত সুবিধা আছে :—
(ক) বড় বড় কারখানায় প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন। একজন বা অল্প কয়েকজন ব্যক্তির পক্ষে এত মূলধন সরবরাহ করা সম্ভবপর হয় না। এমন কি, কাহারও এই মূলধন সরবরাহের ক্ষমতা থাকিলেও তাহার পক্ষে এতটা ঝুঁকি গ্রহণ করা বিবেচকের মত কাজ হইবে না। কারণ কারবার ফেল হইলে সে তাহার সমস্ত অর্থ হারাইবে। যৌথ-মূলধন কারবারের মোট মূলধনের পরিমাণ যত প্রচুরই হউক না কেন প্রত্যেক অংশীদার সামান্য মূল্যের শেয়ার কেনে। কারবার উঠিয়া গেলে কোন অংশীদারই তাহার সকল অর্থ হারাইবে না। সেইজন্য যৌথ-মূলধনী কারবার ব্যক্তিগত কারবার অথবা অংশীদারী কারবার অপেক্ষা ভাল।

(খ) অংশীদারী কারবারে একজন অংশীদারের মৃত্যু হইলে ব্যবসা বন্ধ হইয়া যায়। একজন অংশীদারের মৃত্যুর সঙ্গে সমস্ত কারবারকে মৃত বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। কিন্তু যৌথ-মূলধনী কারবারে এরূপ হয় না। এমন কি,

সমস্ত অংশীদারের মৃত্যু হইলেও কারবার ঠিক থাকে। প্রত্যেক অংশীদারের মৃত্যুর সঙ্গে কারবার বন্ধ করিয়া দেওয়ার প্রয়োজন হয় না।

(গ) যৌথ-মূলধনী কারবারে অর্থের সঞ্চয় এবং বিনিয়োগ প্রবৃত্তি বাড়িয়া যায়। এইরূপ অনেক লোক আছে যাহাদের মূলধন আছে, অথচ ব্যবসায়-বুদ্ধি বা সামর্থ্য নাই। তাহারা এইরূপ কোন কারবারের শেয়ার কিনিতে পারে এবং এইভাবে কিছু আয়ের বন্দোবস্ত করিতে পারে। আবার যাহাদের ব্যবসায়বুদ্ধি আছে অথচ মূলধন নাই, তাহারা ঐ কারবারে কাজ লইয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারে। যাহাদের মূলধন আছে, অথচ যাহারা কোনপ্রকার ব্যবসায়ের ঝুঁকি গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক, তাহারা কোম্পানীর ডিবেঞ্চার কিনিয়া কিছু আয় করিতে পারে। এইরূপ আয়ের সম্ভাবনা থাকিলে সঞ্চয়ও বাড়িয়া যায়।

(ঘ) যৌথ-মূলধনী কারবারে প্রচুর মূলধন থাকে বলিয়া দক্ষ ব্যক্তিদিগের উচ্চ-বেতন দিয়া কার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারে। ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

কিন্তু যৌথ-মূলধনী কারবারে অনেক দোষ-ত্রুটি আছে। প্রথমতঃ, কারবার পরিচালন করে একজন বেতনভোগী কর্ম্মচারী। নিজের ব্যবসায় হইলে লোকে যেরূপ পরিশ্রম করে, বেতনভুক্ কর্ম্মচারীর নিকট তাহা আশা করা যায় না। ফলে, কোম্পানীর কাজ ঠিকভাবে পরিচালিত নাও হইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, পরিচালকসভায় অসৎ ব্যক্তি ঢুকিতে পারে এবং তাহারা অংশীদারদিগকেও ফাঁকি দিতে পারে। কোম্পানীর স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া তাহারা নিজেদের পকেট ভারী করিতে পারে।

এই দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও এই কথা বলা যায় যে, যৌথ-মূলধনী কারবার অন্যান্য শ্রেণীর ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান হইতে শ্রেষ্ঠ।

———

ষষ্ঠ অধ্যায়

মূল্য-নিরূপণ নীতি

Q. 1. *Define Markets.* (U. P. 1936, 1939)

What are the conditions that govern the extent of a market ? (C. U. 1940)

উঃ। সাধারণভাবে বাজার বলিতে আমরা যেখানে জিনিষ কেনা-বেচা হয় এমন স্থানকে বুঝি। ধনবিজ্ঞানে কিন্তু বাজার বলিতে কোন একটি স্থানকে বুঝায় না; বুঝায় এমন একটি বা কয়েকটি জিনিষ, যাহার কেনা-বেচা পূর্ণ প্রতিযোগিতার সঙ্গে চলে। সাধারণভাবে আমরা বলি কলেজ ষ্ট্রীটের বাজার। কিন্তু ধনবিজ্ঞানে বলি-সূতার বাজার, পাটের বাজার, শেয়ার বাজার প্রভৃতি। অর্থাৎ কোন জায়গার বাজার নয়, কোন জিনিষের বাজার। ধনবিজ্ঞানে বাজার বলিতে দুইটি বৈশিষ্ট্য বুঝা যায়। প্রথমতঃ, সেই জিনিষের ক্রেতা এবং বিক্রেতাদিগের মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকিবে। দ্বিতীয়তঃ, প্রতিযোগিতার ফলে বাজারে সেই জিনিষ এক দামে বিক্রয় হইবে। প্রতিযোগিতা থাকিলে কোন জিনিষ একই সময়ে দুই দামে বিক্রয় হইতে পারে না। যদি তাহা হয়, তবে একটি দাম কম হইবে। প্রত্যেক খরিদ্দার সর্ব্বাপেক্ষা কম দামে জিনিষটি কিনিতে চাহিবে; আর বিক্রেতা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী দামে বিক্রয় করিবার চেষ্টা করিবে। দুই দলের মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকিলে, শেষ পর্য্যন্ত বাজারে একই জিনিসের দুইটি মূল্য থাকিতে পারিবে না।

কোন জিনিষের বাজারের আয়তন ছোট কিংবা বড় হইতে পারে। দুধের বাজার ছোট; আবার সোনার বাজার বড়, এমন কি পৃথিবীব্যাপী

বলা যায়। বাজার ছোট কি বড় হইবে, তাহা নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর নির্ভর করে :—

(ক) **বিস্তৃত চাহিদা** :—যে জিনিষের চাহিদা বেশী ও বহু দেশের লোক যাহা চায় তাহার বাজার বিস্তৃত হইবার সম্ভাবনা আছে। পৃথিবীর সব দেশের লোকই সোনা-রূপা চাহে। সেইজন্য সোনা-রূপার বাজার পৃথিবীব্যাপী।

(খ) **সুবহনীয়তা** (Portability) :—যে সকল জিনিষ সহজেই একস্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাওয়া যায়, এবং লইয়া যাওয়ার ব্যয়ও খুব বেশী হয় না, তাহাদের বাজার বিস্তৃত হইতে পারে। আবার যে জিনিষ সহজে লইয়া যাওয়া যায় না, লইয়া যাওয়ার খরচও বেশী, তাহার বাজার ছোট হইবে। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র বাড়ী প্রস্তুত করিবার জন্য ইটের চাহিদা আছে। কিন্তু ইট দূরে লইয়া যাওয়া এত অসুবিধাজনক ও এত বেশী ব্যয় হয় যে, সর্ব্বত্র ইহার চাহিদা থাকা সত্ত্বেও ইহার বাজার ছোটই থাকে। সোনা-রূপা লইয়া যাওয়া সহজ বলিয়া তাহাদের বাজার বিরাট বিস্তৃত। দুধ ও তরিতরকারী প্রভৃতি জিনিষ যাহা সহজেই নষ্ট হইয়া যায়, তাহার বাজারও অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ না হইয়া পারে না। কারণ, অধিক দূরে চালান পাঠাইতে হইলে এই সকল জিনিস নষ্ট হইয়া যাইবে।

(গ) **প্রকৃতিনির্ণয়-ক্ষমতা** :—যে দ্রব্যের প্রকৃতি সহজে নির্ণয় করা যায়, তাহার বাজারও স্বভাবতঃ বিস্তৃত হয়। খরিদ্দার অনেক সময়ে জিনিষ নিজের চোখে না দেখিয়া ক্রয় করিতে চাহে না। যদি কোন জিনিষ নিজে দেখিয়া কিনিবার জন্য দূরে যাইতে হয় তবে খুব অসুবিধা হয়। কিন্তু ধর, যদি জিনিষগুলির নমুনা পাঠান যায়, তবে দূরের খরিদ্দার শুধু নমুনা দেখিয়া জিনিষ কিনিতে পারে। তাহাকে আর দূরে যাইতে হয় না। সুতরাং সেই জিনিষের বাজারও বড় হইতে পারে। এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য থাকিলে জিনিষের বাজার বড় বিস্তৃত হইতে পারে।

Q. 2. ***Write notes on—(i) Utility ; (ii) Value-in-use and Value-in-exchange*** (C. U. 1931) ; ***(iii) Value and Price*** (C. U. 1938, 1954) ; ***(iv) Demand and Supply.***

উঃ। (১) **উপযোগ ঃ**—ইংরাজীতে ইউটিলিটি কথার সাধারণ অর্থ প্রয়োজনীয়তা। কিন্তু ধনবিজ্ঞানে আমরা শব্দটি এই অর্থে ব্যবহার করি না। ইউটিলিটি বলিতে আমরা জিনিষের উপযোগকে বুঝি। মানুষ যদি কোন জিনিষ চায়, মনে করে যে, ইহার দ্বারা তাহার কোন অভাব মিটিবে, তবে সে জিনিষের উপযোগ বা ইউটিলিটি আছে বুঝিতে হইবে।

(২) **ব্যবহারিক-মূল্য ঃ**—ব্যবহারিক-মূল্য বলিতে আমরা কোন জিনিষের আবশ্যকতাকে বুঝি। কোন জিনিষের ব্যবহারিক-মূল্য 'বেশী বলিলে সেই জিনিষের আবশ্যকতা বেশী এই বোঝা যায়। বায়ু, জল প্রভৃতির ব্যবহারিক-মূল্য বেশী।

বিনিময়-মূল্য ঃ—একটি জিনিষের বিনিময়ে যে পরিমাণ অন্য জিনিষ পাওয়া যায়, তাহা সেই জিনিষের বিনিময়-মূল্য। বিনিময়-মূল্য খুব বেশী বলিতে আমরা বুঝি যে, সেই জিনিষের বিনিময়ে অন্য জিনিষ বেশী পরিমাণে পাওয়া যায়। হীরার ব্যবহারিক-মূল্য কম, কিন্তু বিনিময়-মূল্য প্রচুর। ধনবিজ্ঞানে আমরা মূল্য বলিতে এই বিনিময়-মূল্যকেই বুঝি। কোন জিনিষের বিনিময়-মূল্য উচ্চ হইলে যে তাহার ব্যবহারিক-মূল্য বেশী হইবে তাহা নহে। সোনা ও হীরার ব্যবহারিক-মূল্য বিশেষ কিছু নাই। কিন্তু বিনিময়-মূল্য খুব বেশী। জিনিষটি যত দুষ্প্রাপ্য হইবে তাহার বিনিময়-মূল্য তত বেশী হইবে। জলের ও বায়ুর প্রয়োজন খুব বেশী হইলেও তাহাদের বিনিময়-মূল্য খুব কম। তাহার কারণ এই দুইটির কোনটিই দুষ্প্রাপ্য নহে। সোনা ও হীরা দুষ্প্রাপ্য বলিয়া ব্যবহারিক-মূল্য কম হইলেও তাহাদের বিনিময়-মূল্য বেশী।

(৩) **মূল্য (Value)**ঃ—ধনবিজ্ঞানে 'মূল্য' বলিতে আমরা একটি জিনিষের বিনিময়ে যে পরিমাণ অন্য জিনিষ পাওয়া যায় তাহা বুঝি। এক মণ গমের বদলে যদি দুই মণ ধান পাওয়া যায়, তবে আমরা বলিব এক মণ গমের মূল্য দুই মণ ধানের সমান। এইভাবে দ্রব্যের মূল্য ঠিক করা হয়।

দাম (Price)ঃ—একটি জিনিষ কিনিতে হইলে যে পরিমাণ অর্থ দিতে হয়, তাহাকে ইহার 'দাম' বলা হয়। এক মণ চাউল কিনিতে যদি ১৬৲ টাকা দিতে হয়, তবে চাউলের দাম ষোল টাকা বলিব।

(৪) **চাহিদা (Demand)**ঃ—জিনিষের চাহিদা বলিতে একটি নির্দ্দিষ্ট দামে কোন বা কয়েকজন ব্যক্তি যে পরিমাণ জিনিষ কিনিতে রাজী আছে তাহাই বুঝি। কেবলমাত্র উপযোগ থাকিলেই যে জিনিষের চাহিদা হয় তাহা নহে। তাহার সঙ্গে থাকা চাই কিনিবার ক্ষমতা অর্থাৎ প্রয়োজনমত অর্থ এবং সেই অর্থব্যয়ের ইচ্ছা। সুতরাং চাহিদা বলিতে আমরা তিনটি জিনিষ বুঝি : কোন জিনিষের উপযোগ থাকিবে ; সেই জিনিষ কিনিবার মত টাকা চাহিদাকারীর থাকিবে ; এবং সে জিনিষটি কিনিবার জন্য টাকা খরচ করিতে সে রাজী থাকিবে।

চাহিদা বলিতে আমরা কোন নির্দ্ধারিত মূল্যে দ্রব্যের চাহিদাকেই বুঝি। যদি কোন লোককে জিজ্ঞাসা করা হয় সে কতগুলি কমলালেবু কিনিবে, তবে সঠিক উত্তর দিবার আগে তাহাকে লেবুর দাম জানিতে হইবে। কারণ কমলালেবুর দাম জানা না থাকিলে মোট কয়টি কমলালেবু সে কিনিবে তাহা বলা তাহার পক্ষে সম্ভব নয়। কম দাম হইলে সে হয়তো বেশী লেবু কিনিবে। আবার দাম বেশী হইলে কম লেবু লইবে। সুতরাং চাহিদা বলিতে কোন নির্দ্দিষ্ট দামে চাহিদা বুঝিতে হইবে।

যোগান অথবা সরবরাহঃ—একটি নির্দ্ধারিত দামে যে পরিমাণ দ্রব্য বাজারে বিক্রয়ের জন্য মজুত হয়, তাহাকে সেই দ্রব্যের যোগান বলে। মজুত মাল ও যোগানের মধ্যে প্রভেদ আছে। মোট মজুত মাল বলিতে

আমরা ব্যবসায়ীর গুদামজাত সকল জিনিষকে বুঝি। আর যোগান বলিতে মজুত মালের যে পরিমাণ জিনিষ বিভিন্ন দামে বাজারে বিক্রয় করা হইবে তাহা বুঝি। যোগান বলিতে কোন নির্দ্ধারিত মূল্যে যোগান বোঝা হয়।

Q. 3. *Write short notes on :*

(*a*) *The Law of Demand.* (Burd. P. U. 1962)

(*b*) *The Law of Supply.*

উঃ। (ক) **চাহিদার নিয়ম**ঃ—কোন দ্রব্যের মূল্য কমিয়া গেলে আমরা সাধারণতঃ তাহা বেশী করিয়া কিনি ; আবার মূল্য বাড়িয়া গেলে কম করিয়া কিনি। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের এই সাধারণ ঘটনাকে বলা হয় চাহিদার নিয়ম বা আইন। এই আইনে বলে যে, দাম বেশী হইলে চাহিদা কম হইবে ; দাম কম হইলে চাহিদা বেশী হইবে। মূল্য কমিলে বহু নূতন খরিদ্দার জিনিষটি কিনিতে পারে। আবার, মূল্য বাড়িয়া গেলে অনেক লোকই কিনিতে চায় না। কাহারও হয়তো এত দাম দিবার সামর্থ্য নাই, নতুবা তাহারা এত দাম দিতে অনিচ্ছুক। সুতরাং বেশী জিনিষ বিক্রয় করিতে হইলে মূল্য কমাইয়া দিতে হইবে।

(খ) **যোগানের নিয়ম**ঃ—মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জিনিষের যোগান বাড়িয়া যায়, এবং মূল্য কমিয়া গেলে তাহার যোগান কমিয়া যায়। ইহাকে আমরা যোগানের নিয়ম বা আইন বলি। বেশী দামে বিক্রয় হইলে ব্যবসায়ীদিগের লাভ বেশী হয়। সুতরাং তাহারা বেশী পরিমাণ মাল বাজারে সরবরাহ করে। মূল্য কমিয়া গেলে লাভ কম হয় ; এমন কি লোকসান পর্য্যন্ত হইতে পারে। এইজন্য তাহারা কম দামে অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণ জিনিষ বাজারে বিক্রয়ার্থ সরবরাহ করে।

Q. 3(a). *Explain why a rise in price tends to decrease demand and a fall in price tends to increase it.* (Burd.

উঃ। চাহিদার নিয়মে বলে যে, কোন দ্রব্যের মূল্য বাড়িলে ইহার চাহিদা কমিয়া যায়; মূল্য কমিলে চাহিদা বাড়ে। ইহা কেন হয়? মূল্য কমিলে চাহিদা কেন বাড়ে? ইহার দুইটি কারণ আছে। প্রথমতঃ, ধর এক কাপ চায়ের দাম পূর্ব্বে ২০ নয়া পয়সা ছিল। এখন কমিয়া ১৫ নয়া পয়সা হইয়াছে। অন্য কোন জিনিষের দামের পরিবর্ত্তন হয় নাই—অর্থাৎ কফির দাম একই রহিয়া গিয়াছে। ক্রেতাদের মধ্যে একশ্রেণীর লোক চা খাইত, আর এক শ্রেণী কফি খাইত। কিন্তু এখন চা'র দাম কমিয়াছে, কিন্তু কফির দাম কমে নাই। যাহারা কফি খাইত, তাহাদের মধ্যে অনেকে চায়ের দাম কম দেখিয়া কফি না খাইয়া চা খাইবে। ফলে, চা'র চাহিদা বাড়িবে। এই চাহিদা বৃদ্ধির কারণ কফির বদলে চা পান। ইহাকে এক কথায় প্রতিস্থাপনের ফল (Substitution effect) বলা হয়।

দ্বিতীয়তঃ, যে লোক দিনে হয়ত তিন কাপ চা খাইত তাহাকে মোট ৬০ নয়া পয়সা খরচা করিতে হইত। সে এখন দেখিল যে, তিন কাপ চা কিনিতে তাহার ৪৫ নয়া পয়সা ব্যয় হইল—১৫ নয়া পয়সা বাঁচিয়া যাইতেছে। লোকটি তখন হয়ত আরও এক কাপ চায়ের অর্ডার দিতে পারে। ফলে, চায়ের চাহিদা বাড়িবে। দাম কমার ফলে তিন কাপ চা কিনিতে তাহাকে ৬০ নয়া পয়সার স্থলে ৪৫ নয়া পয়সা খরচ করিতে হইতেছে। অর্থাৎ বলা যায় যে, দাম কমার ফলে তাহার আয় ১৫ নয়া পয়সা বাড়িয়াছে। আয় বাড়িলে লোকেরা সাধারণতঃ অধিকাংশ জিনিসই পূর্ব্বের চেয়ে বেশী কিনিতে থাকে। সুতরাং ক্রেতারা চা'র দাম কমার জন্য পূর্ব্বের চেয়ে বেশী চা কিনিবে। ইহাকে আয়ের ফল (Income effect) বলে।

এই দুইটি কারণে দাম কমিলে চাহিদা বাড়ে ও দাম বাড়িলে চাহিদা কমে।

Q 4. *What do you understand by elasticity of demand?*

the elasticity of demand in the case of rice, diamonds and motor cars. (C. U. P. U. 1961)

উঃ। জিনিষের দাম ওঠা-নামার সঙ্গে সঙ্গে ইহার চাহিদা কমে-বাড়ে। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায়, জিনিষের দাম সামান্য কমিলেই চাহিদা বেশী পরিমাণে বাড়িয়া যায়। আবার অনেক জিনিষের দাম কিছু কমিলেও ইহাদের চাহিদা বিশেষ বাড়ে না। দামের সামান্য পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে চাহিদার যে পরিবর্ত্তন হয়, তাহার পরিমাপকে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা (elasticity of demand) বলা হয়।

যখন দাম একটু কমিলে চাহিদা বেশ বাড়ে, তখন সেই চাহিদাকে বলা হয় স্থিতিস্থাপক (elastic) চাহিদা। স্থিতিস্থাপক চাহিদার অর্থ দাম সামান্য কমিলেই বিক্রয়ের পরিমাণ খুব বৃদ্ধি পায়। আবার দাম একটু বাড়িলেই বিক্রয়ের পরিমাণ বহুলাংশে কমিয়া যায়। কোন জিনিষের দাম সামান্য উঠা-নামার সঙ্গে চাহিদা যদি সামান্য কমে ও বাড়ে, তখন সেই চাহিদাকে বলা হয় অস্থিতিস্থাপক (inelastic) চাহিদা। অস্থিতিস্থাপক চাহিদার দাম সামান্য কমিলে জিনিষের বিক্রয় কিছু বাড়ে, তবে খুব বেশী বাড়ে না। আবার দাম সামান্য বাড়িয়া গেলে মূল্যবৃদ্ধির অনুপাতে বিক্রয় খুব সামান্যই কমে।

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা নির্দ্ধারণের একটি নিয়ম আছে। কোন জিনিষের মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে যদি তাহার বিক্রয় এমনভাবে কমিয়া যায় যে, মোট বিক্রয়লব্ধ অর্থের পরিমাণ কমিয়া যায়; অথবা মূল্য হ্রাস পাইলে মোট বিক্রয়লব্ধ অর্থের পরিমাণ যদি বৃদ্ধি পায়, তবে সেইরূপ চাহিদাকে আমরা স্থিতিস্থাপক চাহিদা বলিব। ধরা যাউক, কমলালেবুর মূল্য যখন ১২ নয়া পয়সা তখন মোট ১০০০ লেবু বিক্রয় হয়। তাহা হইলে বিক্রেতারা লেবু বেচিয়া মোট ১২০০০ নয়া পয়সা পায়। যখন মূল্য কমিয়া দশ নয়া পয়সা হয়, তখন বাজারে ১৩০০ লেবু বিক্রয় হয়। তাহা হইলে তখন বিক্রেতারা মোট

১৩০০০ নয়া পয়সা পায়। অর্থাৎ কমলালেবুর দাম কমিলে মোট বিক্রয়লব্ধ অর্থের পরিমাণও বাড়িয়া যায়। আবার, যখন লেবুর মূল্য বাড়িয়া ১৫ নয়া পয়সা হয়, তখন মোট ৭০০ লেবু বিক্রয় হয়, অর্থাৎ ক্রেতারা মোট ১০৫০০ নয়া পয়সার লেবু কিনে। এইরূপ হইলে চাহিদাকে আমরা স্থিতিস্থাপক চাহিদা বলি।

আবার কোন জিনিষের দাম বাড়িলে বিক্রয় এত সামান্য কমে যে, মোট বিক্রীত অর্থের পরিমাণ বাড়িয়া যায়; অথবা দাম কমিয়া গেলে মোট বিক্রয়লব্ধ অর্থের পরিমাণও কমিয়া যায়, তবে আমরা বলিব সেই জিনিষের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক। লবণের দাম যখন ৬ নয়া পয়সা সের, লোকে তখন ১০০০ সের লবণ কেনে। তাহা হইলে মোট বিক্রীত অর্থের পরিমাণ হইল ৬০০০ নয়া পয়সা। দাম কমিয়া ৫ নয়া পয়সা হইলে হয়তো ১১০০ সের লবণ বিক্রয় হয়। মোট বিক্রয় হয় ৫৫০০ নয়া পয়সার লবণ। আবার যদি দাম বাড়িয়া ৭ নয়া পয়সা হয়, তখন ক্রীত লবণের পরিমাণ দাঁড়ায় ৯০০ সের। মোট বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইল ৬৩০০ নয়া পয়সা। দাম বাড়িলে মোট বিক্রয়লব্ধ অর্থের পরিমাণ বাড়ে এবং দাম কমিলে মোট অর্থের পরিমাণ কমে। এইরূপ চাহিদাকে অস্থিতিস্থাপক চাহিদা বলে।

দাম এবং মোট ব্যয়ের অনুরূপ পরিবর্তন হইলে অর্থাৎ দাম বাড়িলে বা কমিলে মোট ব্যয়ের পরিমাণ যদি বাড়ে বা কমে, তবে চাহিদাকে অস্থিতিস্থাপক বলে; আবার, দাম এবং মোট ব্যয়ের অনুরূপ পরিবর্তন না হইলে চাহিদা স্থিতিস্থাপক হয়।

দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় জিনিষের (যেমন, লবণ, চাল, গম, প্রভৃতির) চাহিদা অস্থিতিস্থাপক। এই সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিষ বাদ দিয়া জীবনধারণ সম্ভব হয় না। দাম ওঠা-নামা সত্ত্বেও ইহাদের মোট বিক্রয়ের পরিমাণ প্রায় সমানই থাকে। সুতরাং চাল, গম, লবণ ও অন্যান্য আবশ্যকীয় জিনিষের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক।

সৌখীন জিনিষের চাহিদা স্থিতিস্থাপক। ইহাদের দাম সামান্ত কমিলেই অনেক লোক কিনিবার জন্য ভিড় করে ও চাহিদা খুব বেশী মাত্রায় বৃদ্ধি পায়। মোটর গাড়ী, ঘড়ি এবং আসবাবপত্র সৌখীন জিনিষ। সুতরাং ইহাদের চাহিদাও স্থিতিস্থাপক।

হীরক সৌখীন জিনিষের পর্য্যায়ে পড়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু সাধারণতঃ, ইহার মূল্য এত বেশী যে, কেবল মাত্র অতি ধনী লোকেরাই হীরক কিনিতে পারে। হীরকের মূল্য সামান্য বাড়িলে কমিলে এই শ্রেণীর লোকদের কিছু আসে যায় না। সুতরাং হীরকের চাহিদাকে অস্থিতিস্থাপক বলিতে হইবে।

Q. 5. *Write notes on :—*

The Law of Diminishing Utility. **(C. U. 1956 ; U P. 1935, 1939, 1942)**

উঃ। **ক্রমিক উপযোগ হ্রাসের আইনঃ**—আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা দেখিতে পাই যে, একটি জিনিষ আমরা যত বেশী পরিমাণ পাই ততই আমাদের নিকট তাহার উপযোগ কমিয়া যায়। ইহাকে ক্রমিক উপযোগ হ্রাসের আইন বলে। একটি জিনিষ আমরা যত বেশী পরিমাণ পাই, ততই সেই জিনিষ পাওয়ার ইচ্ছা কমিয়া যায়। একজোড়া জুতার উপযোগ খুবই বেশী হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু ঠিক একই ধরণের দ্বিতীয় জোড়া জুতা পাইবার আগ্রহ আর প্রথম জোড়ার ন্যায় প্রবল থাকে না। তৃতীয় জোড়ার জন্য আগ্রহ দ্বিতীয় জোড়া অপেক্ষা আরও কম হইবে, এবং এইভাবে জুতা কিনিবার আগ্রহ ক্রমেই কমিবে। খাদ্যদ্রব্য এবং পরিধেয় বস্ত্র যত বেশী পাই, খাদ্য এবং বস্ত্রের জন্য আমাদের আকাঙ্ক্ষা ততই কমিয়া যায়। ধর, একজোড়া জুতার প্রয়োজনীয়তা এত বেশী যে, তাহার জন্য একজন লোক ১৫৲ টাকা দিতে রাজী আছে। একই ধরণের দ্বিতীয় জোড়ার জন্য সে আর ১৫৲ টাকা দিতে রাজী হইবে না; সে হয়তো ১২৲

টাকা দিতে চাহিবে। কারণ, দ্বিতীয় জোড়া কিনিবার আগ্রহ প্রথম জোড়া কিনিবার সময়ের মত তত প্রবল থাকে না। দুই জোড়া জুতা হইবার পর তৃতীয় জোড়ার জন্য সে হয়তো মাত্র ৮৲ টাকা দিতে চাহিবে, কারণ জুতা কিনিবার আগ্রহ আরও কমিয়া গিয়াছে। একটি জিনিষ যত বেশী পরিমাণে পাই, ততই ইহার উপযোগ ক্রমে কমিয়া যায়।

এই আইনের কয়েকটি ব্যতিক্রম আছে। কৃপণের অর্থলোলুপতা অর্থের পরিমাণ বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে কমে না। মাতাল যতই মদ খায়, তাহার মদ খাওয়ার আগ্রহ কমে না। কিন্তু সাধারণতঃ কম ক্ষেত্রেই এই প্রকারের ব্যতিক্রম দেখা যায়। সুতরাং এই আইনকে আমরা সাধারণভাবে সর্ব্বত্র প্রযোজ্য বলিতে পারি।

Q. 6. *(a) State the relation between marginal utility and total utility. Illustrate your answer with an example.* (C. U. 1942, 1944, 1955)

(b) Show how the law of demand follows from the law of diminishng marginal utility. (C. U. 1958)

উঃ। **প্রান্তিক উপযোগ** (Marginal Utility):—আমরা যতক্ষণ মনে করি যে, কোন জিনিষের উপযোগের তুলনায় তাহার দাম কম, ততক্ষণ আমরা সে জিনিষ কিনি, এবং সে জিনিষ যতই কিনি তাহার উপযোগ ততই কমিয়া যায়। অবশেষে জিনিষটির উপযোগ বাজার দরের সমান দাঁড়ায়। যে অংশের উপযোগ বাজার দরের সমান, তাহাকে প্রান্তিক অংশ বলা হয় এবং সেই অংশের উপযোগকে বলা হয় প্রান্তিক উপযোগ। বর্ত্তমান বাজার দরে দ্রব্যের ঠিক যে অংশটি পর্য্যন্ত সে কিনিতে ইচ্ছুক, সেই অংশের উপযোগই হইল প্রান্তিক উপযোগ। জিনিষের দাম এই প্রান্তিক অংশের উপযোগের সমান হয়; অর্থাৎ

প্রান্তিক উপযোগের সমান হয়। যখন জুতার দর জোড়া প্রতি ৮৲ টাকা, তখন কোন লোক ঠিক ৩ জোড়া জুতা কিনিতে রাজী থাকে। সে তৃতীয় জোড়া কিনিতেছে, তাহার কারণ সে তৃতীয় জোড়া হইতে যে সুবিধা বা উপযোগ পাইবে আশা করে, তাহার মূল্য অন্ততঃ ৮৲ টাকার সমান মনে করে। তৃতীয় জোড়া হইতে সে যে সুবিধা পাইবে বলিয়া মনে করে, তাহার বদলে সে যদি ৮৲ টাকা খরচ করিতে রাজী না হয়, তবে সে নিশ্চয়ই ৮৲ টাকা দিয়া তৃতীয় জোড়া কিনিবে না। তৃতীয় জোড়া হইল প্রান্তিক অংশ এবং তৃতীয় জোড়ার উপযোগ হইল জুতার প্রান্তিক উপযোগের পরিমাণ।

মোট উপযোগ (Total Utility):—কোন জিনিসের সমস্ত ক্রীত অংশের উপযোগের সমষ্টিকেই মোট উপযোগ বলে। একটি লোক একজোড়া জুতার জন্য ১৫৲ টাকা দিতে প্রস্তুত অর্থাৎ সে একজোড়া জুতা হইতে যেটুকু তৃপ্তি পাইবে আশা করে তাহার মূল্য অন্ততঃপক্ষে ১৫৲ টাকার সমান মনে করে। দ্বিতীয় জোড়ার জন্য সে ১২৲-টাকা এবং তৃতীয় জোড়ার জন্য ৮৲ টাকা দিতে রাজী আছে। যদি জুতার বাজার দর জোড়া প্রতি ৮৲ টাকা হয়, তবে সে হযতো ৩ জোড়া জুতা কিনিবে। তাহা হইলে ৩ জোড়া হইতে সে মোট (১৫ + ১২ + ৮ = ৩৫৲) টাকা মূল্যের উপযোগ ভোগ করিবে আশা করে। তিন জোড়া জুতার মোট উপযোগ ৩৫৲ টাকা।

প্রান্তিক উপযোগ এবং মোট উপযোগের মধ্যে নিম্নলিখিত সম্বন্ধ আছে। একজন ক্রেতা যত জিনিষ কেনে তাহার প্রত্যেকটির প্রান্তিক উপযোগ যোগ করিলে মোট উপযোগ পাওয়া যায়। প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় প্রত্যেকটি জোড়া জুতার প্রান্তিক উপযোগ আলাদা করিয়া যোগ দিলে তবে মোট উপযোগ জানা যাইবে। একথা লক্ষ্য রাখা দরকার যে, জিনিষের দর তাহার প্রান্তিক উপযোগের সমান হয়। জিনিষের মূল্যনির্দ্ধারণের উপর মোট উপযোগের কোন প্রভাব নাই।

(b) চহিদার নিয়ম উপযোগ হ্রাসের নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত। চাহিদার নিয়মে বলে যে, কোন জিনিষের দাম কমিলে ইহার চাহিদা বাড়ে; অর্থাৎ বেশী পরিমাণ জিনিষ বিক্রয় করিতে হইলে দাম কমাইয়া দিতে হয়। দাম না কমাইলে লোকে বেশী জিনিষ কিনিবে না। ইহার কারণ উপযোগ-হ্রাসের নিয়ম হইতে খুঁজিয়া পাওয়া যায়। এই নিয়মে বলে যে, লোকে যত বেশী জিনিষ কেনে ততই জিনিষটির উপযোগ কমিতে থাকে। উপযোগ কমিলে জিনিষটির জন্য লোকে কম দাম দিতে চাহিবে। প্রথম জিনিষটি কিনিতে সে যে দাম দিতে চাহিবে দ্বিতীয়টির জন্য কম দাম দিবে। কাজেই তাহার নিকট দুইটি জিনিষ বিক্রয় করিতে হইলে দাম কমাইতে হইবে। ক্রেতার নিকট যদি বেশী পরিমাণ জিনিষ বিক্রয় করিতে হয়, তবে দাম কমাইতে হইবে। কারণ, জিনিষের পরিমাণ বাড়িলে ইহার উপযোগ কমিতে থাকে।

Q. 7. *How is value determined under conditions of competition?*

"The price of anything (i.e., its money value) is determined by the interaction of two forces, demand and supply which act and re-act on one another through the medium of price changes until a state of equilibrium is reached."— Elucidate this statement. (C. U. 1944)

উঃ। ক্রেতা এবং বিক্রেতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকিলে জিনিষের মূল্য কি ভাবে ঠিক হয়? প্রত্যেক ক্রেতা বাজারে জিনিষ কিনিতে যাওয়ার পূর্ব্বে মনে মনে ঠিক করে যে, কত বেশী দাম পর্য্যন্ত সে কিনিবে। এই সর্ব্বোচ্চ মূল্য আবার নির্ভর করে সেই জিনিষের উপযোগের উপর। জিনিষের উপযোগ অধিক হইলে সর্ব্বোচ্চ দামও বেশী হইবে। আর আগ্রহের

আতিশয্য না থাকিলে সর্ব্বোচ্চ দাম কম হইবে। সে অবশ্য সর্ব্বদাই চেষ্টা করিবে, ইহা হইতে যত কমে সে কিনিতে পারে। আবার প্রত্যেক বিক্রেতাও ঠিক করিয়া রাখে যে, এই দামের নীচে সে বিক্রয় করিবে না। এই সর্ব্বনিম্ন দাম নির্ভর করে উৎপাদনের ব্যয়ের উপর। উৎপাদনের ব্যয় যতই বেশী হইবে বিক্রেতার দাম ততই বেশী হইবে। প্রত্যেক বিক্রেতা ইহার চেয়ে যতটা সম্ভব বেশী দামে বিক্রয়ের চেষ্টা করিবে।

প্রকৃত বাজার দর ক্রেতা ও বিক্রেতাদের দর-কষাকষির মধ্য দিয়া স্থির হয়। যদি জিনিষের জন্য ক্রেতার কড়া চাহিদা থাকে, অথচ বিক্রেতার বিক্রয় করিবার জন্য কোন উদ্বেগই না থাকে, তবে বাজার দর ক্রেতার সর্ব্বোচ্চ দামের নিকটবর্ত্তী হইবে। আবার ক্রেতার চাহিদা যদি খুব বেশী না হয়, অথচ বিক্রেতার বিক্রয় করিবার তাগিদ খুব বেশী থাকে, তবে প্রকৃত বাজার দর বিক্রেতার সর্ব্বনিম্ন দামের নিকটবর্ত্তী হইবে। এইভাবে চাহিদা ও যোগান এই দুইটির দ্বারা বাজার দর ঠিক হয়।

বিষয়টি একটি উদাহরণ দিলে ভাল বোঝা যাইবে। যখন কমলালেবুর বাজার দর ৬ পয়সা, তখন ক্রেতারা মোট ১০০০ কমলালেবু কিনিতে রাজী আছে। চাহিদার নিয়ম অনুযায়ী আমরা জানি যে, লেবুর দাম যতই কমিবে, তাহার চাহিদাও ততই বাড়িয়া যাইবে। সুতরাং বাজার দর যখন ৫ পয়সা হয়, তখন ক্রেতারা ১২০০ লেবু কিনিবে; যখন দাম ৪ পয়সা হয়, তখন মোট ১৫০০ লেবু; ৩ পয়সা দামে ২০০০ লেবু এবং ২ পয়সা দামে মোট ৩০০০ লেবু কিনিবে।

বাজারে লেবুর দাম ৬ পয়সা হইলে বিক্রেতারা ৩০০০ লেবু বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক। যোগানের নিয়ম অনুযায়ী দর কমিলে যোগান কমিবে। সুতরাং দাম যখন ৫ পয়সা হয়, তখন তাহারা মাত্র ২৫০০ লেবু বিক্রয় করিবে। ৪ পয়সা দাম হইলে ২২০০ লেবু; ৩ পয়সা দাম হইলে ২০০০ লেবু ও ২ পয়সা হইলে ১০০০ লেবু বিক্রয় করিতে রাজী থাকিবে।

ক্রেতাগণ কিনিবে	যখন বাজার দর	বিক্রেতাগণ বিক্রয় করিবে
১০০০ লেবু	৬ পয়সা	৩০০০ লেবু
১২০০ "	৫ "	২৫০০ "
১৫০০ "	৪ "	২২০০ "
২০০০ "	৩ "	২০০০ "
৩০০০ "	২ "	১৫০০ "

ইহা হইতে আমরা দেখিতে পাই যে, যখন লেবুর দাম ৩ পয়সা তখন ক্রেতারা মোট ২০০০ লেবু কিনিতে চায়, এবং বিক্রেতারা ঐ একই পরিমাণ লেবু বাজারে বিক্রয় করিতে চায়। সুতরাং প্রকৃত বাজার দর হইবে ৩ পয়সা এবং বাজার দর যখন ৩ পয়সা, তখনই বাজারের যোগান সমস্ত বিক্রয় হইবে এবং সমস্ত চাহিদার তৃপ্তি হইবে। এইজন্য এই দামকে বলা হয় **স্থিরীকৃত বা সাম্য মূল্য** (equilibrium price)। যদি বাজার দর ৪ পয়সা হয় তখন খরিদ্দারেরা মোট ১৫০০ লেবু কিনিবে; আর বিক্রেতাগণ ঐ দরে ২২০০ লেবু বিক্রয় করিতে চাহিবে। বিক্রেতাগণের মোট যোগান ঐ দামে বিক্রয় করা যাইবে না। উদ্বৃত্ত লেবু বিক্রয় করিতে হইলে দাম কমাইয়া দিতে হইবে। এইভাবে বাজার দর কমিয়া ৩ পয়সা দাঁড়াইবে।

কাজেই চাহিদা এবং যোগান, উভয়ের ঘাত-প্রতিঘাতে জিনিষের দাম ঠিক হয়। পণ্যমূল্য সেখানে স্থিরীকৃত হইবে, যেখানে বাজারের মোট চাহিদা মোট যোগানের সমান হয়।

Q. 8. *Distinguish between market value and normal value. Show how market value is determined.* (C. U. 1942)

"*Normal price is the price round which market price fluctuates and to which it tends constantly to approximate.*" (U. P. 1933, 1938)

উঃ। বাজার মূল্য (Market value) বলিতে আমরা একটি

নির্দ্দিষ্ট সময়ে কোন পণ্যদ্রব্যের বাজার দরকে বুঝি। বাজার দরে মোট চাহিদা মোট যোগানের সমান হয়। এই বাজার দর আবার ঐ জিনিষের প্রান্তিক উপযোগের সমান হয়। যে দরে চাহিদা ও যোগানের দীর্ঘকালীন সমন্বয় হয়, সেই দরকে আমরা **স্বাভাবিক মূল্য** (Normal value) বলি। চাহিদা বা যোগানের কোন পরিবর্ত্তন হইলে তাহার প্রভাবে শেষ পর্য্যন্ত যে দাম দাঁড়াইবে তাহাকে আমরা স্বাভাবিক মূল্য বলি।

বাজারে একটি বস্তুর কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে যে দাম বহাল থাকে, তাহাকে সেই দ্রব্যের বাজার মূল্য বলা হয়। আবার দীর্ঘকাল পরে যে মূল্য আশা করা যায় তাহাকেই বলা হয় স্বাভাবিক মূল্য। বাজার মূল্য স্বাভাবিক মূল্যের সমান হইতেও পারে, আবার না হইতেও পারে। কিন্তু বাজার মূল্যের গতি সর্ব্বদাই স্বাভাবিক মূল্যের সমান হইবার দিকে থাকে। স্বাভাবিক মূল্য যেন ঘড়ির দোলকের মধ্যকালীন অবস্থা। বাজার মূল্য ইহার আশে-পাশে ঘোরে। কিন্তু যে দিকেই ঘুরুক, সে মধ্যকালীন অবস্থানে ফিরিয়া আসিতে চায়।

বাজার মূল্য নির্ণীত হয়—চাহিদা এবং যোগানের ঘাত-প্রতিঘাতে। ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দেখ।

Q. 9. *"The normal price of a commodity, under conditions of perfect competition, tends to be equal to its marginal cost of production." Explain.* **(C. U. 1951)**

উঃ। সব সময়েই দ্রব্যের মূল্য চাহিদা ও যোগানের দ্বারা নির্ণীত হয়। জিনিষের চাহিদা ইহার মূল্য ও ক্রেতাদের প্রান্তিক উপযোগের উপরে নির্ভর করে। যোগান নির্ভর করে মূল্য ও উৎপাদনব্যয়ের উপর। অর্থাৎ জিনিষটির মূল্য যদি ইহার উৎপাদনব্যয় হইতে বেশী হয়, তবে ব্যবসায়ীরা বেশী লাভ করিবে এবং বেশী উৎপাদন করিবার চেষ্টা করিবে।

ফলে জিনিষটির যোগান বাড়িবে। আবার মূল্য যদি উৎপাদনব্যয় অপেক্ষা কম হয়, তবে ব্যবসায়ীরা লোকসান দিবে ও উৎপাদনের পরিমাণ কমাইবে। যোগান ক্রমে কমিয়া যাইবে। এইভাবে জিনিষের যোগান ইহার মূল্য ও উৎপাদনব্যয়ের সম্বন্ধের উপর নির্ভর করে। বলা বাহুল্য যে, উৎপাদনব্যয়ের হিসাবের সময় জিনিষটি তৈয়ারী করিবার সমস্ত খরচ ত ধরিতেই হইবে। তাহা ছাড়া, ব্যবসায়ীর লাভের অঙ্ক হিসাবেও কিছু টাকা ধরিতে হইবে।

যদি অল্প সময় ধরা হয়, তবে জিনিষের মূল্য প্রধানতঃ চাহিদার উপর নির্ভর করে। কারণ, জিনিষের যোগানের পরিবর্ত্তন অল্প সময়ের মধ্যে করা সম্ভব না হইতেও পারে। কিন্তু যদি একটু দীর্ঘ সময় ধরা হয়, তবে উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ান কমান যায় ও ফলে যোগানের পরিবর্ত্তন হয়। জিনিষের মূল্য যদি উৎপাদনব্যয়ের বেশী হয় তবে ব্যবসায়ীরা অধিক লাভ করিবে। ধরা যাক্, বর্ত্তমান উৎপাদনব্যয় ২৲ টাকা। অর্থাৎ ২৲ টাকা দাম পাইলে ব্যবসায়ীরা সমস্ত খরচ-খরচা তুলিয়া নিজেদের জন্য ন্যায্য মুনাফাও পাইবে। এখন জিনিষটির মূল্য যদি ২॥০ হয়, তবে ব্যবসায়ীদের মুনফাও অনেক বেশী হইবে। বাজারের অবস্থা ভাল দেখিযা তাহারা আরো বেশী জিনিষ উৎপাদন করিবার চেষ্টা করিবে। ধরা যাক্ যে, বেশী উৎপাদন করিতে গেলে ব্যয়ের পরিমাণ বাড়ে। সুতরাং বেশী উৎপাদনের ফলে ব্যয়ের পরিমাণ ২৲ হইতে বাড়িয়া ২৵০, ২।০ ও শেষে ২॥০ টাকা হইবে। জিনিষের মূল্য ২॥০ টাকা, উৎপাদনব্যয়ও ২॥০ টাকা—এইভাবে উৎপাদনব্যয় ও মূল্য সমান হইলে উৎপাদনের পরিমাণ আর বাড়িবে না। কারণ, আরো উৎপাদন বাড়াইলে উৎপাদনব্যয় মূল্যের বেশী হইবে ও ব্যবসায়ীর লাভ হইবে না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত মূল্য উৎপাদনব্যয়ের অধিক থাকিবে, ততক্ষণ উৎপাদন বাড়িবে ও যখন উৎপাদনব্যয় মূল্যের সমান হইবে তাহার পর আর উৎপাদন বাড়িবে না। আর একটি দ্রব্য উৎপাদন করিতে যে অর্থ ব্যয় হয় তাহাকে

প্রান্তিক উৎপাদনব্যয় (Marginal cost of production) বলে। দীর্ঘ সময়ের কথা ধরিলে বাজারে যে মূল্য বহাল থাকে তাহাকে স্বাভাবিক মূল্য (Normal value) বলে। প্রত্যেক ব্যবসায়ী উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াইতে বাড়াইতে এমন অবস্থায় আসে যখন তাহার প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় মূল্যের সমান হয়। সে আর ইহার অধিক উৎপাদন করিবে না। সুতরাং বলা হয় যে, স্বভাবিক মূল্য প্রান্তিক উৎপাদনব্যয়ের সমান হয়।

Q. 10. *What determines the short-period and the long-period values under perfect competition ?* (C. U. 1955)

উঃ। পূর্ণ প্রতিযোগিতার অর্থ বাজারে বহু ক্রেতা ও বিক্রেতা আছে ও বিক্রেতারা একই জিনিষ বেচিতেছে। ক্রেতা ও বিক্রেতার প্রতিযোগিতার ফলে বাজারে জিনিষটির একটিমাত্র দাম বহাল থাকে। পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকিলে জিনিষের মূল্য চাহিদা ও যোগানের দ্বারা নির্ণীত হয়। ক্রেতাদের চাহিদা জিনিষটির উপযোগের উপর নির্ভর করে। বাজারে বর্ত্তমানে যে দামে জিনিষটি বিক্রয় হইতেছে ক্রেতাদের নিকট তাহার উপযোগ যদি আরও বেশী হয় তবে তাহারা জিনিষটি বেশী পরিমাণে কিনিতে চাহিবে। যোগান যদি না বাড়ে তবে জিনিষটির মূল্য বাড়িবে। চাহিদা বেশী হইলে মূল্য বাড়ে। যদি যোগান বাড়ান সম্ভব হয় তবে বেশী চাহিদার ফলে বাজারে যোগান বাড়িয়া যাইবে। যোগান বাড়িলে দাম কমে। দাম কমিতে কমিতে অবশেষে জিনিষটির প্রান্তিক উপযোগের সমান হইবে। যোগান বাড়া-কমা জিনিষটির উৎপাদন-ব্যয়ের উপর অনেকটা নির্ভর করে। বর্ত্তমান মূল্য যদি উৎপাদন-ব্যয়ের বেশী হয় তবে বিক্রেতারা বা উৎপাদকেরা বেশী লাভ পাইবে। সুতরাং তাহারা আরো বেশী পরিমাণে উৎপাদন করিতে চেষ্টা করিবে।

যোগান বাড়িলে দাম কমিবে ও কমিতে কমিতে অবশেষে উৎপাদনব্যয়ের সমান হইবে।

চাহিদা ও যোগানের ঘাত-প্রতিঘাতে দাম ঠিক হয়। তবে দেখা যায় কোন সময়ে হয়ত চাহিদার প্রভাব বেশী থাকে কিংবা হয়ত যোগানের প্রভাব বাড়ে। এইজন্য সময়ের হিসাব নেওয়া দরকার। সময় যদি অল্প ধরা হয়, তবে যেভাবে দাম ঠিক হয় বেশী সময় ধরিলে সেভাবে নাও হইতে পারে। যেমন ধরা যাক্, আজকের দিনে বাজারে মাছের দাম কিভাবে ঠিক হইবে? মাছের ব্যবসায়ীরা বিক্রয়ের জন্য বাজারে হয়ত সবশুদ্ধ ১০ মণ মাছ নিয়া আসিয়াছে। মাছ সাধারণতঃ এক বেলার বেশী রাখা যায় না। হয়ত বড় জোর একদিন রাখা চলে। তার বেশী সময় রাখিতে গেলে পচিয়া যায়। কাজেই বাজারে যা মাছ আসিয়াছে সবই সেদিন বিক্রয় করিতে হইবে। এই অবস্থায় মাছের দাম চাহিদার উপর নির্ভর করিবে। সেদিন অনেক বিয়ের লগ্ন থাকিলে মাছের চাহিদা বেশী হইবে ও দামও বাড়িবে। আবার সাধারণ অবস্থা থাকিলে দামও সাধারণ থাকিবে। এইজন্য বলা হয় যে, অল্প সময়ের বাজারে চাহিদার প্রভাব বেশী। মাছের দাম মাছ ধরার খরচের সমান হইতেও পারে। আবার নাও হইতে পারে। চাহিদা বেশী থাকিলে দাম খরচের বেশীও হইতে পারে। ধরা যাক্ তাহাই হইয়াছে। অর্থাৎ মাছের বর্ত্তমান বাজার দর মাছ ধরার খরচের বেশী যাইতেছে। কারণ চাহিদা বেশী। মাছের ব্যবসায়ীরা তাহা হইলে বেশী লাভ করিতেছে ও বাজারের অবস্থা ভাল দেখিয়া আরো বেশী মাছ ধরিবার ব্যবস্থা করিবে। ফলে, মাছের যোগান বাড়িবে ও দাম কমিতে থাকিবে ও ক্রমশঃ কমিতে কমিতে মাছ ধরার খরচের সমান হইবে। সময় দীর্ঘ হইলে জিনিষের যোগান বাড়ান-কমান সম্ভব হয়। জিনিষের যোগান বাড়ান-কমান সম্ভব হইলে তাহার দাম উৎপাদনব্যয়ের সমান হইবে। দীর্ঘ সময়ে যোগানের প্রভাব বেশী হয়।

Q. 11. *How is monopoly price determined?* (C. U. 1939, 1953, 1958; P. U. 1962)

উঃ। যখন একটি দ্রব্যের উৎপাদন বা বিক্রয়ের উপর একজন লোক বা প্রতিষ্ঠানের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণক্ষমতা থাকে, তখন ইহাকে একচেটিয়া কারবারী বলা হয়। কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন কলিকাতা সহরের বিদ্যুৎ-উৎপাদনের একমাত্র অধিকারী। অর্থাৎ কলিকাতা সহরে এই কোম্পানীর বিদ্যুৎ-সরবরাহের একচেটিয়া কারবার আছে। একচেটিয়া কারবারী যে দামে জিনিষ বিক্রয় করে, ইহাকে একচেটিয়া দাম বলে। সে নিজের ইচ্ছামত দামে বাজারে জিনিষ বিক্রয় করিতে পারে এবং সে সর্ব্বদাই সর্ব্বোচ্চ লাভে জিনিষ বিক্রয় করিতে চেষ্টা করে। যে দামে সবচেয়ে বেশী লাভ হয় সেই দামেই সে জিনিষ বিক্রয় করে।

সে যদি বাজারে বেশী মাল যোগান দেয়, তবে দাম কমিয়া যাইবে, একথা সে জানে। আবার যোগান কম রাখিলে বেশী দাম পাওয়া যাইবে। দাম বেশী হইলে বিক্রয়ের পরিমাণ কমিয়া যাইবে এবং দাম কম রাখিলে বিক্রয়ের পরিমাণ বেশী হইবে। এখন সে যদি দেখে যে, বেশী দামে বিক্রয় করিলে সবচেয়ে বেশী লাভ হইবে, তবে সে দাম বেশী রাখিবে। কিন্তু সবক্ষেত্রে ইহা নাও হইতে পারে। তখন সে দাম কমাইয়া দিবে। কম দামে জিনিষ পিছু মুনাফা কম হইলেও বহু পরিমাণ বিক্রয়ের জন্য মোট মুনাফার অঙ্ক সবচেয়ে বেশী হইতে পারে। একটি উদাহরণ দিয়া বিষয়টি পরিষ্কার করা যাক্। ধরা যাক্, পাটের উৎপাদনব্যয় মণ প্রতি ১৲ টাকা। পাটের দাম যখন মণ পিছু ৫৲ টাকা, তখন বাজারে মোট বিক্রয়ের পরিমাণ হয় ১০০০ মণ; দাম যখন মণ পিছু ৪৲ টাকা, তখন মোট বিক্রয় হয় ২৫০০ মণ; দাম যখন ৩৲ টাকা তখন মোট বিক্রয় হয় ৪০০০ মণ; এবং দাম যখন ২৲ টাকা তখন মোট বিক্রয় হয় ৬৫০০ মণ।

যখন বাজার দর	মোট বিক্রয় পরিমাণ	মোট বিক্রয়-লব্ধ অর্থ	মোট খরচ	নীট লাভ
৫ টাকা	১,০০০ মণ	৫,০০০ টাকা	১,০০০ টাকা	৪,০০০ টাকা
৪ "	২,৫০০ "	১০,০০০ "	২,৫০০ "	৭,৫০০ "
৩ "	৪,০০০ "	১২,০০০ "	৪,০০০ "	৮,০০০ "
২ "	৬,৫০০ "	১৩,০০০ "	৬,৫০০ "	৬,৫০০ "

এই হিসাব হইতে দেখা যায় যে, যখন বাজার দর মণ প্রতি ৩৲ টাকা তখন নীট লাভ সর্ব্বোচ্চ হইবে। একচেটিয়া কারবারী বিক্রয় মূল্য ৩৲ টাকা করিয়া স্থির করিবে।

সপ্তম অধ্যায়

অর্থ, ক্রেডিট ও ব্যাঙ্ক

Q. 1. *Mention the difficulties and conveniences attending an exchange by barter. Show how these difficulties are overcome by the introduction of money.*

(C. U. 1934 ; U. P. 1937, **1939.**)

উঃ। দ্রব্যের বিনিময়ে দ্রব্যবিক্রয়ের ব্যবস্থাকে পণ্যবিনিময়-ব্যবস্থা বলা হয়। পণ্যবিনিময়-ব্যবস্থায় অর্থের কোন প্রচলন হয় না। এই ব্যবস্থায় কতকগুলি অসুবিধা উপস্থিত হয়।

প্রথমতঃ, এই অবস্থায় "অভাবের সংযোগসাধন" অনেক সময়ই সম্ভব হইয়া উঠে না। এক ব্যক্তির একটি ছুরি আছে এবং সে ঐ ছুরির বদলে

একটি মাছ ধরার ছিপ চায়। হয়তো দ্বিতীয় ব্যক্তির নিকট একটি ঘোড়া আছে, সে হয়তো ছুরি কিনিতে চায়, কিন্তু প্রথম ব্যক্তি ঘোড়া চায় না। তৃতীয় একজনের হয়তো ছিপ আছে, কিন্তু তাহার হয়তো ছুরির কোন প্রয়োজন নাই। ফলে, তাহাদের মধ্যে কোন বিনিময়ই সম্ভবপর হইবে না। অর্থের প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে এই অসুবিধা দূর হইয়াছে। প্রথম ব্যক্তি টাকার বিনিময়ে ছুরি বিক্রয় করিবে এবং প্রাপ্ত অর্থ দিয়া ছিপ কিনিবে।

দ্বিতীয়তঃ, পণ্যবিনিময়-ব্যবস্থায় জিনিষের উপযুক্ত বিভাজ্যতার অভাবে অসুবিধা হয়। ক-এর একটি ঘোড়া আছে এবং সে একখানা ছুরি চায়। কিন্তু একটি ঘোড়ার মূল্য একখানা ছুরির মূল্য অপেক্ষা অনেক বেশী। অথচ ঘোড়াকে খণ্ড খণ্ড করিয়া তাহার একটি অংশের বিনিময়ে একটি ছুরি কেনা সম্ভব নয়। টাকা চালু হইবার সঙ্গে সঙ্গে এই অসুবিধা থাকে না। ক টাকার বিনিময়ে ঘোড়া বিক্রয় করে ও প্রাপ্ত অর্থের সামান্য অংশ ব্যয় করিয়া অতি সহজেই ছুরি কিনিতে পারে।

তৃতীয়তঃ, পণ্যবিনিময়-ব্যবস্থায় মূল্য-নিরূপণের কোন পরিমাপ থাকে না বলিয়া মুস্কিল হয়। বিনিময়ের কোন সাধারণ মাপকাঠি না থাকার ফলে সহজে এবং সুবিধার সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন জিনিষের মূল্যের পরিমাপ করার কোন উপায় ছিল না। অর্থের প্রচলনে এই অসুবিধা দূর হইয়াছে। প্রত্যেক জিনিষের মূল্যের পরিমাপ হয় টাকার বিনিময়ে। ফলে, আমরা অতি সহজেই বিভিন্ন দ্রব্যের মূল্য তুলনা করিতে পারি।

Q. 2. (*a*) *Define money.* (U. P. 1936, 1937)

(*b*) *What do you mean by legal tender money ?*

উঃ। (ক) সাধারণতঃ, অর্থ বলিতে আমরা সোনা, রূপা অথবা নিকেলের টাকা-কড়ি অথবা কাগজের নোট বুঝি। এ সমস্ত জিনিষের কি কি বৈশিষ্ট্য আছে? প্রথমতঃ, সকলেই এ সমস্ত গ্রহণ করিতে রাজী আছে এবং ইহার বদলে সব দোকানদার মাল বিক্রয় করিবে ও সব পাওনাদার

ইহা পাইলে পাওনা চুকিয়াছে বলিয়া মানিয়া লয়। দ্বিতীয়তঃ, কেহ যদি ইহা নিতে রাজী না হয়, আইন অনুসারে তাহাকে শাস্তি দেওয়া যায়। সুতরাং অর্থ বলিতে আমরা সেই সমস্ত জিনিষকে বুঝি, যাহার বিনিময়ে সব কিছুর কেনা-বেচা চলে ও যাহা দিয়া পাওনাদারের দাবী মিটানো যায়। যে সমস্ত জিনিষের বিনিময়ে দোকানের কেনা-বেচা চলে, ধনবিজ্ঞানে তাহাদের অর্থ বলে।

বিহিত অর্থ (Legal Tender) **:**—যে সমস্ত জিনিষকে দেশের সরকার অর্থ বলিয়া ঘোষণা করে এবং যাহা দিয়া আইনতঃ ধার শোধ দেওয়া যায়, তাহাকে বিহিত অর্থ বলে। এই ধরণের অর্থ যদি কেহ লইতে অস্বীকার করে, তবে তাহাকে আইনতঃ শাস্তি পাইতে হয়। বিহিত অর্থের আবার দুইটি প্রকার ভেদ আছে:—**সীমাবদ্ধ বিহীত অর্থ** (limited legal tender) এবং **অসীম বিহিত অর্থ** (unlimited legal tender)। **সীমাবদ্ধ বিহিত অর্থ** একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ পর্য্যন্ত পাওনাদার গ্রহণ করিতে বাধ্য। সেই নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের বেশী অর্থ দিলে সে তাহা গ্রহণ নাও করিতে পারে। বিলাতের শিলিং এইরূপ একটি সীমাবদ্ধ বিহিত অর্থ। একটি একটি করিয়া শিলিং দিলে মোট ৪০ শিলিং পর্য্যন্ত পাওনাদার গ্রহণ করিতে বাধ্য। কেউ পাওনা মিটাইতে গিয়া একসঙ্গে যদি ৪০ শিলিং-এর বেশী দিতে চায়, তবে পাওনাদার সেই বেশী শিলিং নাও লইতে পারে। **অসীম বিহিত অর্থ** সকলেই যে-কোন পরিমাণে গ্রহণ করিতে বাধ্য। আমাদের দেশের টাকা অসীম বিহিত অর্থের পর্য্যায়ে পড়ে।

Q. 3. *What are the characteristics to be looked for in the commodity selected as money? Discuss the comparative fitness of precious metals, precious stones and staple food-stuffs to serve as money.* (C. U. 1930)

Why have the precious metals been chosen as money? (C. U. 1928, 1938; U. P. 1938, 1940)

উঃ। সব জিনিষই অর্থের কাজ করিতে পারে না। অর্থ হইতে গেলে তাহার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন :

(১) **সাধারণের স্বীকার** (General acceptability):—জনসাধারণ যাহা অর্থ হিসাবে গ্রহণ করিতে রাজী থাকে, তাহাই অর্থ হইতে পারে। যে জিনিষ সবাই বা অধিকাংশ লোক লইতে রাজী নয়, তাহা অর্থ বলিয়া চালু করা যায় না।

(২) **সমজাতিত্ব** (Homogeneity):—সেই জিনিষকে সমরূপ গুণবিশিষ্ট হইতে হইবে। অর্থাৎ একটি জিনিষ এক রকমের, আর একটি অন্য রকমের, এরূপ হইলে চলিবে না।

(৩) **বিভাজ্যতা** (Divisibility):—সেই জিনিষকে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করা যাইতে পারিবে এবং প্রত্যেক অংশের দাম সমানুপাতিক হিসাবে থাকিবে।

(৪) **স্থায়িত্ব** (Stability):—এমন জিনিষকে অর্থ করা হইবে, যাহার খুব কম ক্ষয় হয়। বহুদিন প্রচলিত থাকিলেও তাহার ওজনের অথবা গুণের পরিবর্ত্তন হইবে না।

(৫) **সুবহনীয়তা** (Portability):—এমন জিনিষকে অর্থ করিতে হইবে যাহা আকারে ছোট হইয়াও বেশী দামী হইবে এবং তাহাকে অনায়াসে স্থানান্তর করা চলিবে।

(৬) **সহজবোধগম্যতা** (Cognisability):—এমন দ্রব্যকে অর্থ হিসাবে ঠিক করিতে হইবে যাহা লোকে সহজে চিনিতে পারে। তাহা হইলে এই জিনিষের জাল চালান শক্ত হইবে।

(৭) **নমনীয়তা** (Malleability):—এমন জিনিষকে অর্থ করিতে হইবে যাহা সহজে গলাইয়া মুদ্রা প্রস্তুতের কাজে ব্যবহার করা চলিবে।

(৮) **মূল্যের স্থায়িত্ব**:—অর্থের মূল্যস্থায়িত্ব থাকিবে। তাহা না হইলে অর্থ হিসাবে কোন জিনিষ ব্যবহার করার অসুবিধা হইবে।

সোনা এবং রূপার মত মূল্যবান ধাতু অর্থ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। ইহার কারণ তাহাদের উপরি-উক্ত গুণ আছে। প্রত্যেকেই সোনা এবং রূপা গ্রহণ করিতে রাজী। যেখানেই সোনা পাওয়া যাক না কেন, সর্ব্বত্রই তাহার একই গুণ। সোনারূপা বহুকাল স্থায়ী; এবং ওজনের তুলনায় দাম বেশী বলিয়া অতি সহজেই স্থানান্তরে লইয়া যাওয়া চলে। মূল্যের হানি না করিয়া তাহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করা যায়। আবার তাহাদের অতি সহজেই চেনা যায় ও প্রয়োজনমত গলাইয়া যে-কোন আকৃতিতে পরিবর্ত্তিত করা যায়। ইহাদের মূল্যও মোটামুটিভাবে স্থায়ী।

হীরার ন্যায় দামী পাথরের কিন্তু এই সমস্ত গুণ নাই। হীরা অবশ্য সকলেই লইতে রাজী ও সহজেই স্থানান্তর করা চলে। একটি হীরা বহুদিন পর্য্যন্ত ঠিক থাকে। কিন্তু সব হীরা সমরূপ গুণসম্পন্ন নয়। গুণে বা চাকচিক্যে বিভিন্ন হীরার মধ্যে প্রভেদ আছে। সাধারণ লোকে হীরা সহজে চিনিতে পারে না। কৃত্রিম হীরা হইতে খাঁটি হীরা বাছিয়া লওয়া শক্ত। হীরা বিভাজ্যও নয়। একটি হীরাকে দুই ভাগে ভাগ করিলে এক এক ভাগের দাম আসল হীরার অর্দ্ধেক হইবে না, কম হইবে। কিন্তু এক ভরি সোনাকে অর্দ্ধেক করিলে আধভরি সোনার দাম এক ভরির অর্দ্ধেক হইবে।

সাধারণ খাদ্যদ্রব্যগুলির উপরিলিখিত গুণ নাই। এইগুলি অতি সহজেই নষ্ট হয়। ইহাদের সমরূপ গুণও নাই,অথবা গলাইয়া যে-কোন আকৃতিবিশিষ্ট করা যায় না। ইহাদের অনায়াসে ও অল্পব্যয়ে স্থানান্তরে লওয়া যায় না।

এই তিনটির মধ্যে কেবলমাত্র প্রথমোক্ত মূল্যবান্ ধাতু দুইটিতে অর্থাৎ সোনা-রূপাতে অর্থের প্রয়োজনীয় গুণাবলী আছে এবং এইজন্য ইহাদের সর্ব্বত্রই অর্থ হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

Q. 4. (*a*) ***Describe the functions of money.*** **(C. U. 1929, 1938, 1941 ; U. P. 1938, 1940)**

(*b*) ***How is production facilitated by the use of money ?***

উঃ। (ক) অর্থের কি কি কাজ, এই সম্বন্ধে ইংরাজীতে একটি দুই-লাইনের কবিতা আছে। তাহাতে বলা হইয়াছে অর্থের কাজ হইল চারিটি—বিনিময়ের বাহনের কাজ, দ্রব্যমূল্যের মাপকাঠির কাজ, সঞ্চয়ের বাহনের কাজ এবং স্থগিত পাওনার মানের কাজ।

(১) **বিনিময়ের বাহন** (Medium of exchange) ঃ—অর্থের বিনিময়ে সমস্ত জিনিষের কেনা-বেচা করা যায়। ইহাই অর্থের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কাজ। অর্থ না থাকিলে আমরা কোন জিনিষ কিনিতে পারিব না এবং দোকানদারেরাও জিনিষ বিক্রয় করিতে পারে না। অর্থকে সকলেই গ্রহণ করে বলিয়া তাহার বদলে কেনা-বেচার কাজ সহজেই করা যায়।

(২) **দ্রব্যমূল্যের পরিমাপ** (Measure of value) ঃ—অর্থের মাপকাঠিতে সমস্ত জিনিষের দাম ঠিক করা যায়। অর্থের সহায়তায় আমরা অতি সহজেই দুই বা ততোধিক জিনিষের দামের তুলনা করিতে পারি। যদি চায়ের দাম পাউণ্ড প্রতি ৩৲ টাকা হয় এবং চিনির দাম সের প্রতি ১৲ টাকা হয়, তবে আমরা তৎক্ষণাৎ বলিতে পারি যে, ৩ সের চিনির দাম এক পাউণ্ড চায়ের সমান।

(৩) **সঞ্চয়ের বাহন** (Store of value) ঃ—অর্থের মূল্যের স্থায়িত্ব আছে। সুতরাং যখনই কাহারও নিকট কোন জিনিষ বেশী থাকে, সে তাহা অতি সহজেই অর্থের বিনিময়ে বিক্রয় করিয়া ঐ অর্থ সঞ্চয় করিতে পারে। পরে যখন দরকার হইবে, তখন সে অন্ততঃপক্ষে একই পরিমাণ জিনিষ কিনিতে পাইবে আশা করিতে পারে। কিন্তু খাদ্যশস্য ঐরূপ খুশীমত সঞ্চয় করা সম্ভব হয় না, কারণ কিছুদিন পরে তাহা নষ্ট হইয়া যাইবে।

(৪) **স্থগিত পাওনার মান** (Standard of deferred payment) ঃ—একই অর্থ অনেক দিন প্রচলিত থাকে এবং তাহার মূল্যের স্থায়িত্ব আছে। যখন কোন পাওনাদার শস্য ধার দেয় এবং খাতক নির্দ্দিষ্টকাল পরে যখন সমপরিমাণ শস্য দিয়া সেই ধার শোধ করে, তখন পাওনাদার যে সমমূল্যের শস্য পাইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। কারণ শস্যের মূল্য বৎসরের পর বৎসর এক থাকে না। কিন্তু যদি সে টাকা ধার দেয় তবে নির্দ্দিষ্টকাল পরে সমপরিমাণ অর্থ ফিরিয়া পাইবে এবং অর্থের মূল্য অপেক্ষাকৃত স্থায়ী বলিয়া তাহার কোন লোকসান হইবে না। অর্থের প্রচলনের ফলে দেনাপাওনার অনেক সুবিধা হইয়াছে। অর্থ না থাকিলে বর্ত্তমানকালের বৃহদায়তন উৎপাদনকার্য্য চলিত না।

অর্থের আরও কিছু কাজ আছে—(৫) অর্থের সহায়তায় বিভিন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে জাতীয় আয় বণ্টন করা সম্ভবপর হয়। (৬) আবার অর্থই হইল বর্ত্তমানকালের ক্রেডিটের ভিত্তিস্বরূপ।

(খ) অর্থহীন সমাজব্যবস্থায় উৎপাদনকার্য্য-পরিচালনার অনেক অসুবিধা হয়। এইরূপ বিনিময়ব্যবস্থায় অনেক সময়ই অভাবের সমন্বয়সাধন করা যায় না, অথবা বিনিময়ের বাহন থাকে না। ফলে, জিনিষ বেচা-কেনা অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গেই যদি উৎপন্ন জিনিষ লাভে বিক্রয় করা সম্ভব না হয়, তবে কেহ উৎপাদন করিতে চাহিবে না। অর্থের প্রচলনে এই অসুবিধা দূর হইয়াছে। অর্থ বিনিময়ের বাহন হিসাবে কাজ করে বলিয়া জিনিষ কেনা-বেচা অনেক সহজ হইয়াছে। ফলে, উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে ও সমস্ত জিনিষের বিক্রয়ের সুবিধা হইয়াছে।

Q. 5. *Write notes on :—*

(*a*) *Free Coinage and Gratuitous Coinage.*

(*b*) *Brassage, Seignorage, Debasement.*

(*c*) *Appreciation and Depreciation of money.*

উঃ। (ক) **অবারিত মুদ্রাঙ্কন-ব্যবস্থা** (Free Coinage) ঃ—সকল দেশেই টাকা তৈয়ারী হয় সরকারী টাঁকশালে। যদি এমন ব্যবস্থা থাকে যে, জনসাধারণ টাঁকশালে সোনা বা রূপার তাল লইয়া গেলে তাহা হইতে অর্থ তৈয়ারী করিয়া তাহাদের দেওয়া হইবে, তবে ইহাকে অবারিত মুদ্রাঙ্কন-ব্যবস্থা বলা হয়। ১৮৯৩ সালের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে রূপার এইরূপ অবারিত মুদ্রাঙ্কন-ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু তারপর হইতে জনসাধারণের এ অধিকার আর নাই। এখন কেবলমাত্র ভারত সরকারই মুদ্রাঙ্কন করে।

অবারিত মুদ্রাঙ্কন-ব্যবস্থায় টাঁকশালে সোনা ও রূপা লইয়া গেলে তাহা হইতে যত অর্থ তৈয়ারী হয় টাঁকশাল তাহা তৈয়ারী করিয়া দেয়। অর্থ তৈয়ারী করিতে যে খরচ হয় তাহা হইতে কাটিয়া লওয়া যাইতে পারে। কিন্তু যদি তাহা না করা হয়, অর্থাৎ সমস্ত খরচই সরকার বহন করে, তবে এই ব্যবস্থাকে **বিনাব্যয়ে মুদ্রাঙ্কন** (Gratuitous Coinage) বলা হয়।

(খ) **ব্রাসেজ ও সিনিয়রেজ** (Brassage and Seignorage) : —টাকা তৈয়ারী করিতে যে ব্যয় হয় তাহা সরকার নিজে বহন না করিয়া যখন জনসাধারণের নিকট হইতে আদায় করে, তাহাকে ইংরাজীতে ব্রাসেজ বলা হয়। আবার সরকার যখন টাকা তৈয়ারীর ন্যায্য ব্যয়ের বেশী জন-সাধারণের নিকট হইতে আদায় করে এবং এইভাবে প্রত্যেক টাকা হইতে লাভ করে, তখন সেই ব্যবস্থাকে ইংরাজীতে সিনিয়রেজ বা টাকার বানি বলা হয়।

অর্থের বিকৃতিকরণ (Debasement of Coinage) ঃ—কখনও কখনও অভাবগ্রস্ত সরকার প্রচলিত মুদ্রার সমপরিমাণ মূল্যের ধাতু দেয় না। আইনে যতটুকু পরিমাণ ধাতু দিবার কথা থাকে, তাহা হইতে কম দিয়া টাকা তৈয়ারী করে। তাহা হইলে ইহাকে মুদ্রার বিকৃতিকরণ বলা হয়।

(গ) **মুদ্রামূল্যবৃদ্ধি** (Appreciation of Money) ঃ—অর্থের মূল্য বৃদ্ধি হইলে তাহাকে বলা হয় মুদ্রার মূল্যবৃদ্ধি। মুদ্রার মূল্যবৃদ্ধির অর্থ হইল

এক টাকায় পূর্ব্বের চেয়ে বেশী পরিমাণ জিনিষ যেমন চাউল, গম প্রভৃতি পাওয়া যাইবে। তাহার অর্থ জিনিষপত্রের দাম কমিয়া গিয়াছে। সুতরাং এক টাকার বদলে বেশী জিনিষ পাওয়া যাইবে।

মুদ্রার মূল্যহ্রাস (Depreciation of Money) ঃ—ইহার অর্থ টাকার দাম কমিয়া যাওয়া। টাকার দাম কমিয়া গেলে এক টাকার বদলে পূর্ব্বের চেয়ে কম জিনিষ কিনিতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ জিনিষপত্রের দাম বাড়িয়া যায়।

Q. 6. *What do you mean by 'Token Money' and 'Standard Money'? Illustrate your answer with reference to Indian rupee.* (C. U. 1920, 1937; U. P. 1937, 1939)

উঃ। **প্রামাণিক অর্থ** (Standard money) বলিতে আমরা বুঝি সেই সমস্ত মুদ্রা, যাহা দিয়া অন্য জিনিষের মূল্যের হিসাব করা হয়। সমস্ত দেনাপাওনার হিসাব-নিকাশ এই মুদ্রায় রাখা হয়। ইংলণ্ডের পাউণ্ড, ফরাসী দেশের ফ্রাঁ, আমেরিকার ডলার এবং ভারতবর্ষের টাকা প্রামাণিক মুদ্রার উদাহরণ। পূর্ব্বে যখন ধাতবমুদ্রা প্রচলিত ছিল তখন প্রামাণিক অর্থ সাধারণতঃ পূর্ণ মুদ্রা হইত। অর্থাৎ ইহা গলাইলে যে ধাতু পাওয়া যাইত তাহা বিক্রয় করিলে মুদ্রার সমান দাম পাওয়া যাইত। সমমূল্যের ধাতু দিয়া এই সমস্ত মুদ্রা তৈযারী হইত। দ্বিতীয়তঃ, প্রামাণিক মুদ্রাকে অসীম বৈধ অর্থ করা হয় এবং সাধারণতঃ এইরূপ মুদ্রাসম্বন্ধে অবারিত মুদ্রাঙ্কন-ব্যবস্থা থাকে। ভারতবর্ষে টাকা প্রামাণিক অর্থ হইলেও ইহার মুদ্রাঙ্কন-ব্যবস্থা অবারিত নয এবং ইহার লিখিতমূল্য ধাতুমূল্য অপেক্ষা অধিক। টাকা একটি নিদর্শক অর্থ।

যে সমস্ত মুদ্রার লিখিতমূল্য ইহার ধাতুমূল্যের বেশী, তাহাকে বলা হয় **নিদর্শক মুদ্রা** (Token money)। যদি এই সমস্ত মুদ্রা গলাইয়া ধাতু হিসাবে বিক্রয় করা যায়, তবে ইহার লিখিত দাম হইতে অনেক কম দাম

পাওয়া যাইবে। সাধারণতঃ, শিলিং, পেনি, আধুলি, সিকি প্রভৃতি ছোট ছোট মুদ্রাকে নিদর্শক মুদ্রা করা হয়। এই সমস্ত মুদ্রার অবারিত মুদ্রাঙ্কন-ব্যবস্থা কখনই থাকে না এবং একমাত্র দেশের সরকারই ইহাদের চালু করে। এই মুদ্রা সীমাবদ্ধ বৈধ অর্থ হিসাবে প্রচলিত থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ শিলিং-এর কথা বলা যাক্। শিলিং দিয়া ৪০ শিলিং পর্য্যন্ত দেওয়া চলে। ইহার বেশী শিলিং পাওনাদার লইতে অস্বীকার করিতে পারে।

আমাদের টাকা প্রামাণিক মুদ্রা হিসাবে গণ্য হইলেও ইহার মধ্যে কিছু কিছু নিদর্শক অর্থের বৈশিষ্ট্য আছে। টাকা নিদর্শক মুদ্রা হইয়াও অসীম বৈধ অর্থরূপে প্রচলিত আছে।

Q. 7. *Define Monometallism, Gold Standard and Bimetallism.*

উঃ। **একধাতুমান** (Monometallism) ঃ—দেশের প্রামাণিক মুদ্রা যখন এক ধাতুর তৈয়ারী হয়, তখন সেই ব্যবস্থাকে একধাতুমান বলা হয়। যদি প্রামাণিক মুদ্রা কেবলমাত্র স্বর্ণ দিয়া তৈয়ারী হয়, তবে তাহাকে স্বর্ণমান বলা হয; এবং যদি তাহা শুধু রৌপ্যনির্ম্মিত হয়, তবে তাহাকে রৌপ্যমান বলা হয়।

স্বর্ণমান (Gold Standard) :—যখন কোন দেশের প্রামাণিক মুদ্রা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণ দিয়া প্রস্তুত করা হয়, তখন সেই দেশের প্রচলিত মুদ্রা-ব্যবস্থাকে স্বর্ণমান বলে। অবশ্য স্বর্ণমান থাকিলে যে সর্ব্বদাই স্বর্ণমুদ্রা প্রচলিত রাখিতে হইবে ইহার কোন অর্থ নাই। কোন দেশে যদি প্রচলিত সর্ব্ব-প্রকারের মুদ্রার বিনিময়ে একটি নির্দ্দিষ্ট দামে স্বর্ণ পাওয়া যায়, এবং তাহা খুশীমত আমদানী অথবা রপ্তানী করিতে পারা যায়, তবে দেশে স্বর্ণমান আছে বলা যাইতে পারে।

দ্বিধাতুমান (Bimetallism) :—যখন দুই ধাতুর মুদ্রাকে প্রামাণিক মুদ্রা করা হয়, তখন সেই ব্যবস্থাকে দ্বিধাতুমান বলে। দ্বিধাতুমান থাকিলে

নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন। প্রথমতঃ, স্বর্ণ ও রৌপ্য দুই প্রকারের ধাতুরই অবারিত মুদ্রাঙ্কন-ব্যবস্থা থাকিবে। দ্বিতীয়তঃ, এই দুই প্রকারের মুদ্রাকেই অসীম বৈধ অর্থ করিতে হয়। সরকার সোনা ও রূপার টাকায় বিনিময় হার নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেয়।

Q. 8. *State and explain Gresham's Law.* (C. U. 1937, 1944 ; U. P. 1934, 1935, 1945)

"Bad money always drives good money out of circulation" Name and explain the law. How does good money disappear ? (C. U. 193৮, 1943)

উঃ। এই আইনের সারমর্ম্ম হইল এই যে, ভাল এবং মন্দ এই দুই প্রকারের মুদ্রা একই সঙ্গে প্রচলিত থাকিলে ধীরে ধীরে ভাল মুদ্রার প্রচলন একেবারে বন্ধ হইয়া যায় ও শুধু মন্দ মুদ্রা প্রচলিত থাকে। রাণী এলিজাবেথের রাজত্বকালীন লণ্ডন রয়াল এক্সচেঞ্জের প্রতিষ্ঠাতা স্যার টমাস গ্রেসামের নাম অনুসারে এই আইনের নামকরণ হইয়াছে।

যদি কোন ছেলেকে একটি নূতন চকচকে এবং আর একটি ঘসা পয়সা দেওয়া হয়, তবে সে প্রথমেই ঘষা পয়সা খরচ করিবে এবং নূতন পয়সা নিজের নিকট রাখিয়া দিতে চেষ্টা করিবে। ফলে, ভাল পয়সার প্রচলন বন্ধ হইবে। ভাল মুদ্রার প্রচলন তিনটি কারণে বন্ধ হয়।

(ক) **জমান**ঃ—সাধারণতঃ লোকে ভাল টাকা নিজের নিকট রাখিয়া প্রথমে মন্দটি চালাইবার চেষ্টা করে। এইভাবে ভাল টাকা জমান থাকে বলিয়া ইহার প্রচলন বন্ধ হয়, এবং কেবলমাত্র মন্দ টাকা বাজারে চালু থাকে।

(খ) **গলান**ঃ—স্যাকরা অনেক সময় মুদ্রা গলাইয়া গহনা গড়ায়। তাহারা নূতন মুদ্রা গলাইবে। কারণ নূতন বলিয়া ইহাদের ক্ষয় হয় নাই

ও এই মুদ্রা গলান হইলে পুরা ধাতুই পাওয়া যায়। ফলে, নূতন মুদ্রা গলান হইবে ও পুরাতন মুদ্রা চালু থাকিবে।

বিদেশীদের পাওনা মিটানঃ—বিদেশীরা কখনও আমাদের দেশের মুদ্রা গ্রহণ করিবে না, কারণ তাহাদের দেশে ইহা বৈধ অর্থ নয়। তাহারা শুধু সোনা কিংবা রূপা লইবে। কারণ বিদেশীদের পাওনা মিটাইতে হইলে ভাল মুদ্রা গলাইয়া যে সোনা ও রূপা পাওয়া যায় তাহা পাঠাইতে হয়। এইরূপে বিভিন্ন উপায়ে ভাল মুদ্রার প্রচলন ধীরে ধীরে উঠিয়া যায়।

ভাল এবং মন্দ মুদ্রার আবার প্রকারভেদ আছেঃ—প্রথমতঃ, যখন একই ধাতুনির্ম্মিত মুদ্রা পাশাপাশি প্রচলিত থাকে, তখন নূতন মুদ্রাকে ভাল এবং পুরাতন মুদ্রাকে মন্দ মুদ্রা বলে। পুরাতন মুদ্রার প্রচলনে নূতন মুদ্রার প্রচলন বন্ধ হইয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ, যখন দ্বিধাতুমানে সোনা এবং রূপার মুদ্রা পাশাপাশি প্রচলিত থাকে, তখন অধিক মূল্যবান মুদ্রা মন্দ মুদ্রা ও অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যের মুদ্রা ভাল মুদ্রা হইবে। টাঁকশালে একটি সোনার টাকার বদলে ১৫টি রূপার টাকা দেয়। কিন্তু বাজারে কোন সময়ে রূপার দাম বাড়িয়া ১টি সোনার টাকার বদলে মাত্র ১৪টি রূপার টাকা পাওয়া যায়; অর্থাৎ সোনার টাকার দর বাজারে কমিয়া গেল, কিন্তু টাঁকশালে বেশী রহিল। ফলে, সোনার টাকা অধিক মূল্যের মুদ্রা হইল। লোকে তখন রূপার টাকা গলাইয়া সেই রূপা দিয়া বাজারে সোনা কিনিবে ও সোনা টাঁকশালে লইয়া গিয়া তাহার বদলে রূপার টাকা লইয়া আসিবে। ফলে, রূপার টাকা সব গলান হইবে ও কেবল সোনার টাকার প্রচলন থাকিবে।

যখন কাগজী নোট এবং ধাতুনির্ম্মিত মুদ্রা পাশাপাশি প্রচলিত থাকে, তখন কাগজী নোট মন্দ অর্থ হইবে এবং কেবলমাত্র তাহাই প্রচলিত থাকিবে।

নিম্নলিখিত দুই প্রকার অবস্থায় গ্রেসাম আইন কার্য্যকরী থাকিবে না।

প্রথমতঃ, যদি কোন কারণে জনসাধারণ মন্দ মুদ্রা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করে তবে ভাল মুদ্রা প্রচলিত থাকিবে। দ্বিতীয়তঃ, যদি ভাল এবং মন্দ মুদ্রা মিলাইয়া মোট মুদ্রার পরিমাণ জনসাধারণের প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট না হয়, তবে ভাল মুদ্রা প্রচলিত থাকিবে। *

Q. 9. (*a*) *What are the different kinds of paper money ?*

(*b*) *Discuss the merits and demerits of inconvertible paper money.* (C. U. 1936, 1943 ; U. P. 1942)

উঃ। (ক) কাগজী মুদ্রা তিন প্রকারের হইতে পারে :—প্রতিনিধি-মূলক কাগজী মুদ্রা, বিনিমেয় কাগজী মুদ্রা এবং অবিনিমেয় কাগজী মুদ্রা।

১। **প্রতিনিধিমূলক কাগজী মুদ্রা** ঃ—কাগজী নোট চালু করিবার জন্য তহবিলে সোনা কিংবা রূপার টাকা কিংবা সোনা-রূপার তাল জমা রাখা হয়। যদি ১০০৲ টাকার কাগজী মুদ্রার পিছনে ১০০৲ টাকা মূল্যের সোনা-রূপা কিংবা টাকা জমা থাকে, তবে তাহাকে প্রতিনিধিমূলক কাগজী মুদ্রা বলে। যে পরিমাণ কাগজী মুদ্রা বাজারে চালু করা হয় ঠিক সেই পরিমাণ ধাতু বা ধাতুর টাকা জমা রাখা হয়। এই ধরণের কাগজী মুদ্রা কার্য্যতঃ আমানতের রসিদস্বরূপ।

২। **বিনিমেয় কাগজী মুদ্রা** ঃ—সাধারণতঃ কাগজী মুদ্রার বদলে সমমূল্যের সোনা-রূপার টাকা দেওয়া হয়। এই প্রকার কাগজী মুদ্রাকে বলা হয় বিনিমেয় কাগজী মুদ্রা। সরকার কিংবা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সর্ব্বদাই কাগজের নোটের পরিবর্ত্তে সমমূল্যের সোনা-রূপার মুদ্রা দিতে প্রস্তুত থাকে, এবং এই উদ্দেশ্যে কিছু পরিমাণ সোনা-রূপা জমা রাখে। সকলেই একসঙ্গে কাগজের মুদ্রার বদলে টাকা চাহে না বলিয়া সুংরক্ষিত ধাতুর পরিমাণ মোট প্রচলিত কাগজী মুদ্রা অপেক্ষা কম রাখিলেও চলে। ভারতবর্ষে দশ টাকার নোট বিনিমেয় কাগজী মুদ্রা।

৩। **অবিনিমেয় কাগজী মুদ্রা** :—যখন কাগজী মুদ্রার পরিবর্তে সোনা-রূপা দেওয়া হয় না, তখন সেই মুদ্রাকে বলা হয় অবিনিমেয় কাগজী মুদ্রা। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বা সরকার এই ধরণের কাগজী মুদ্রা চালু করিয়া থাকে। সুতরাং এই প্রকারের কাগজী মুদ্রার তহবিলে সোনা-রূপা জমা রাখার প্রয়োজন নাই। তবে সাধারণতঃ কিছু সোনা-রূপা জমা রাখা হয়। দেশের সরকার গোড়া হইতেই এই প্রকারের অবিনিমেয় কাগজী মুদ্রার প্রচলন করিতে পারে। অথবা, অনেক সময় অসমর্থতার জন্য বিনিমেয় কাগজী মুদ্রা অবিনিমেয় বলিয়া ঘোষণা করা হয়।

(খ) কাগজী মুদ্রা প্রচলিত থাকিলে নিম্নলিখিত সুবিধা পাওয়া যায় :—

১। কাগজী মুদ্রা সোনা-রূপার কাজ করে এবং তাহাদের স্থান গ্রহণ করে। কাগজের নোট তৈয়ারীর ব্যয় ধাতুনির্মিত মুদ্রা হইতে অনেক কম। যদি সরকারকে সোনা-রূপার টাকা চালু রাখিতে হয়, তবে প্রচুর সোনা-রূপা কিনিতে হইবে। কাগজের নোট চালু করিলে সরকার এই ব্যয়ের হাত হইতে বাঁচিয়া যাইবে।

২। এই অবস্থায় আর একটি দিক দিয়া কম ব্যয় হয়। নিয়ত ব্যবহারে সোনা-রূপার টাকার ক্ষয় হয়। কাজেই তাহার বদলে নূতন টাকা তৈয়ারী করিতে হয় ও তাহাতে বেশ খরচ হয়। কাগজী মুদ্রার ব্যবহারে এত খরচ করিতে হয় না। সোনা-রূপার তুলনায় কাগজের দাম কিছুই নহে।

৩। যখন একসঙ্গে অনেক টাকা লেন-দেন হয়, তখন কাগজী মুদ্রার ব্যবহারে অনেক সুবিধা হয়। কাগজী মুদ্রা লইয়া দূরে যাতায়াতের সুবিধা হয়। হাজারটি কাঁচা টাকা পকেটে লইয়া যাওয়া বিপজ্জনক। কিন্তু দশখানা একশত টাকার নোট পকেটে থাকিলে কেহই টের পায় না।

৪। দেশে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং উৎপাদনের বিস্তৃতিসাধনের ফলে মোট অর্থের প্রয়োজন বাড়িয়া গেলে অতি সহজেই কাগজের নোট বেশী করিয়া

চালু করা যায়। কিন্তু সোনা-রূপার মুদ্রা প্রচলিত থাকিলে চট্ করিয়া মুদ্রার সংখ্যা বাড়ান সহজ নয়। তাল তাল নূতন সোনা কিনিতে না পারিলে নূতন মুদ্রা তৈয়ারী করা যাইবে না। সময় সময় নূতন ধাতু কিনিতে বিশেষ বেগ পাইতে হয়। গত মহাযুদ্ধের সময় ভারত সরকারকে দরকারমত রূপা যোগাড় করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল। কাগজী মুদ্রার প্রচলন করিলে এই অসুবিধা থাকে না।

কিন্তু কাগজী মুদ্রা প্রচলনের অনেক দোষও দেখা যায়। এই ব্যবস্থার প্রধান ত্রুটি হইল এই যে, কাগজী মুদ্রার মূল্য খুবই অনিশ্চিত। ধাতুনির্ম্মিত মুদ্রার মূল্যের স্থিরতা অনেক বেশী। এইরূপ মুদ্রার দাম কমিলেও মুদ্রাতে যেটুকু ধাতু আছে তাহার মূল্যের কম হইতে পারে না। কাগজী মুদ্রার মূল্য নির্ভর করে মোট চালু নোটের পরিমাণের উপর ; এবং সরকার যদি প্রচুরসংখ্যক কাগজী নোট বাজারে চালু করে, তবে নোটের মূল্যও দ্রুতগতিতে কমিয়া যাইবে, এবং অন্য সমস্ত জিনিষপত্রের মূল্য অসম্ভব বৃদ্ধি পাইবে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর জার্ম্মানীতে এই অবস্থা হইযাছিল। তখন জার্ম্মান সরকার এত প্রচুর কাগজী মুদ্রার প্রচলন করিয়াছিল যে, তাহাদের মূল্য শেষ পর্য্যন্ত একেবারে শূন্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

এই ব্যবস্থার দ্বিতীয় ত্রুটি হইল এই যে, কাগজী মুদ্রা কেবলমাত্র দেশের অভ্যন্তরেই চালু করা যাইবে। বিদেশীরা কখনও এই নোট লইবে না। ফলে, আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যক্ষেত্রে কাগজী মুদ্রার কোন মূল্যই থাকে না।

Q. 10. *Write short notes on :—*

(*a*) *The Price level.*

(*b*) *The Index number.*

উঃ। (ক) **মূল্যস্তর** (Price level) ঃ—দ্রব্যের মূল্যস্তর বলিতে আমরা বুঝি কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে দ্রব্যসমষ্টির গড়পড়তা দাম। মনে করা যাক্, চারিটি জিনিষ আছে এবং তাহাদের বাজার দর যথাক্রমে ৪৲ টাকা,

৩৲ টাকা, ২৲ টাকা এবং ১৲ টাকা। এই সমস্ত দামের গড়পড়তা হিসাব হইল আড়াই টাকা অর্থাৎ এই সমস্ত জিনিষের মূল্যস্তর হইল ২॥০ টাকা। এখন মনে কর, পরের বছর এই চারিটি জিনিষের দাম যথাক্রমে ৩৲ টাকা, ২৲ টাকা, ৩৲ টাকা এবং ৪৲ টাকা হইয়াছে। প্রথম দুইটির দাম কমিয়াছে এবং শেষের দুইটির দাম বাড়িয়াছে। গড়পড়তা দাম হইল ৩৲ টাকা। সুতরাং আমরা বলিব মূল্যস্তর বাড়িয়া গিয়াছে। মূল্যস্তর বাড়িলে বুঝিতে হইবে টাকার দাম কমিয়াছে। অর্থাৎ টাকার বদলে কম জিনিষ কেনা যাইতেছে। আবার মূল্যস্তর কমিবার অর্থ টাকার মূল্য বৃদ্ধি পাওয়া।

(খ) **সূচকসংখ্যা** (Index numbers) :—সূচকসংখ্যার সাহায্যে আমরা মূল্যস্তরের পরিবর্ত্তন ঠিক করিতে পারি। কোন নির্দ্দিষ্ট তারিখে বা বৎসরে সাধারণ ব্যবহৃত কয়েকটি জিনিষের গড়পড়তা দামকে সূচকসংখ্যা বলা হয়। সূচকসংখ্যা নীচের নিয়মে ঠিক করা হয়। কোন একটি বছর হইতে আমরা এই সংখ্যা নির্ণয় করা সুরু করি ; এবং সেই বৎসরে কতকগুলি জিনিষের গড়পড়তা দাম ঠিক করি। এই বৎসরের গড়পড়তা দামের সূচক-সংখ্যা বলা হয় ১০০। অন্যান্য বৎসরের দ্রব্যমূল্যকে প্রথম বৎসরের দামের শতকরা হিসাবে প্রকাশ করা হয়। মুদ্রামূল্যের পরিবর্ত্তনের নিদর্শক হিসাবেই সূচকসংখ্যা ব্যবহৃত হয়। সূচকসংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ার অর্থ হইল মূল্যস্তরের বৃদ্ধি ; আর সূচকসংখ্যা কমিয়া যাওয়ার অর্থ হইল মূল্যস্তরের হ্রাস পাওয়া।

Q. 11. *(a) What do you mean by the value of money ?* (C. U. 1946, 1951)

(b) How is the value of money determined ? (C. U. 1945, 1951)

Give an idea of Fisher's Quantity equation. (C. U. 1955)

উঃ। (ক) **অর্থের মূল্য** ঃ—কোন দ্রব্যের মূল্য বলিতে আমরা সেই দ্রব্যের বিনিময়ে যে পরিমাণ অপরাপর জিনিষ পাওয়া যায় তাহাই বুঝি। অর্থের বিনিময়ে অপরাপর যে সমস্ত জিনিষ পাওয়া যায় তাহাই অর্থের মূল্য। যখন এক টাকা দিয়া আমরা বেশী জিনিষ কিনিতে পারি তখন আমরা বলি যে, টাকার মূল্য বাড়িয়াছে। আবার টাকার বিনিময়ে ক্রীত দ্রব্যের পরিমাণ যখন কমিয়া যায়, তখন বলা হয় যে, টাকার মূল্য কমিয়া গিয়াছে।

(খ) **অর্থের পরিমাণতত্ত্ব** (Quantity theory of money) ঃ—এই তত্ত্বে বলা হইয়াছে যে, অর্থের মূল্য ইহার চাহিদা ও যোগান দ্বারা ঠিক হয়। এখন দেখা যাক্ অর্থের চাহিদা এবং যোগান বলিতে আমরা কি বুঝি। মানুষ অর্থ চায় কেন? অর্থ থাকিলে জিনিষপত্র কিনিয়া আমাদের অভাব মিটাইতে পারি, সুতরাং অর্থের চাহিদা হয় জিনিষ কিনিবার জন্য। জিনিস কেনা-বেচার পরিমাণ যত বাড়িয়া যায়, অর্থের চাহিদাও তত বাড়ে। এখন যে পরিমাণ জিনিষ বাজারে বিক্রয়ার্থ আসে, তাহাদের সংক্ষেপে T আখ্যা দেওয়া যাক্। জিনিষ কিনিতে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়, তাহাই অর্থের যোগান বা সরবরাহ। এখানে একটি বিষয় আমাদের লক্ষ্য করা দরকার। ধরা যাক্, আমার একটি টাকা আছে এবং আমি সেই টাকা দিয়া বাজারে মাছ কিনিলাম। মাছওয়ালা সেই টাকা লইয়া মুদীর দোকান হইতে এক টাকার চাল কিনিল। মুদী আবার হয়তো কাপড়ের দোকানে গিয়া ঐ টাকাটি দিয়া কিছু কাপড় ক্রয় করিল। এইভাবে একই দিনের মধ্যে একটি টাকা তিনবার জিনিষ কিনিবার কাজে ব্যবহৃত হইল; অর্থাৎ এক টাকা কার্য্যতঃ তিন টাকার কাজ করিতেছে। ইহাকে অর্থের প্রচলনগতি (Velocity of circulation) বলা হয়, এবং এই প্রচলনগতি নির্দ্ধারিত হয় নির্দ্দিষ্ট সময়ে একটি মুদ্রা কতবার বেচা-কেনায় হাত বদল হয়, ইহার হিসাব করিয়া। আমাদের উপরের উদাহরণে টাকার প্রচলনগতি তিনবার

হইবে। অর্থের মোট সরবরাহ ঠিক করিতে হইলে অর্থের পরিমাণকে তাহার প্রচলনগতি দিয়া গুণ করিতে হইবে।

মোট অর্থের পরিমাণকে M বলা হয় এবং তাহার প্রচলনগতিকে V বলে। তাহা হইলে অর্থের মোট যোগান হইল MV. এখন অর্থের মূল্য নির্দ্ধারিত হইল অর্থের মোট চাহিদা Tকে মোট যোগান বা সরবরাহ MV দিয়া ভাগ করিয়া।

সুতরাং অর্থের মূল্য $= \frac{T}{MV}$ মূল্যস্তর P অর্থমূল্যের ঠিক বিপরীত।

$P = \frac{MV}{T}$ ইহাকে ফিসারের অর্থের পরিমাণতত্ত্ব বলে।

Q. 12. *Explain why general prices rise and fall within a country.* (C. U. 1941, '49)

Explain the causes of variation in the value of money.

উঃ। আমরা জানি যে, নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক দ্রব্যের মূল্যের গড়পড়তা হিসাবকে মূল্যস্তর বলে। মূল্যস্তর বাড়িলে বা কমিলে বুঝিতে হইবে যে, জিনিষপত্রের দাম বাড়িয়াছে বা কমিয়াছে। এই দর ওঠা-নামার কারণ হইল জিনিষপত্রের চাহিদা অথবা যোগানের পরিবর্ত্তন। দেশের মধ্যে যদি টাকার সংখ্যা বাড়ে, জিনিষপত্রের চাহিদাও বৃদ্ধি পাইবে। ফলে, মোটামুটিভাবে লোকের ব্যয়ের পরিমাণও বাড়িয়া যাইবে ও জিনিষপত্রের দাম বৃদ্ধি পাইবে। গত যুদ্ধের সময় ভারত সরকার বহু পরিমাণে কাগজী মুদ্রা বাজারে চালু করিতে বাধ্য হয়। যুদ্ধ-সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্য্যে অনেক লোককে নিযুক্ত করা হয়। শ্রমের মজুরী এবং ব্যবসায়ের আয় বৃদ্ধি পায়। লোকের ব্যয়ের ক্ষমতা বহু পরিমাণে বাড়ে। ফলে দেখা যায়, সমস্ত জিনিষপত্রের দাম খুব বৃদ্ধি পাইয়াছে। আবার অর্থের পরিমাণ একই থাকিয়া যদি জিনিষপত্রের সরবরাহ কমিয়া যায় তবে জিনিষপত্রের দাম বৃদ্ধি পাইবে। আবার জিনিষপত্রের সরবরাহ কমিয়া যাইবার কারণ, যত জিনিষ তৈয়ারী হইত ইহার বেশী অংশ যুদ্ধরত সৈন্যদের

জন্য সরকার রাখিয়া দিয়াছিল। ফলে বাজারে কম মালই আসিত। আবার উপযুক্ত সংখ্যক জাহাজ না থাকায় বিদেশ হইতে জিনিষপত্রের আমদানী বন্ধ হইয়া যায়। কয়লার মূল্যবৃদ্ধি, জিনিষপত্রের চালানীর মাশুলবৃদ্ধি প্রভৃতি কারণে সাধারণভাবে উৎপাদনের ব্যয় বাড়িয়া যায়। ইহার ফলে যুদ্ধের সময় জিনিষপত্রের দাম অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

জিনিষপত্রের দাম কমিবার কারণ, হয় ইহাদের চাহিদা কম, নতুবা ইহাদের সরবরাহ বৃদ্ধি পাওয়া। অর্থের সরবরাহ কমিলে সাধারণভাবে জিনিষপত্রের চাহিদা কমে। দেশের মধ্যে ব্যবসায় মন্দা হইলে জিনিষপত্রের চাহিদা কমে। আবার উৎপাদনক্ষমতা অথবা যানবাহন-ব্যবস্থার উন্নতি হইলে জিনিষপত্রের সরবরাহ বাড়িবে ও ইহাদের দাম কমিয়া যাইবে।

Q. 13. *Define Inflation. Examine the effects of inflation on the businessmen, wage-earners, pensioners and salaried people.* (C. U. 1952, '56)

Examine the effects of variations in prices upon different classes of people. (C. U. 1949, '58)

উঃ। **মুদ্রাস্ফীতি**ঃ—গভর্ণমেণ্ট যখন বাজারে অত্যধিক পরিমাণে টাকা চালু করিতে আরম্ভ করে ও ইহার ফলে জিনিষপত্রের মূল্য বৃদ্ধি পায়, তখন সেই দেশে মুদ্রাস্ফীতি হইয়াছে বলা হয়। উৎপাদনের পরিমাণ যে হারে বাড়ে, মোট অর্থের পরিমাণও সেই হারে বাড়িলে ইহাকে মুদ্রাস্ফীতি বলে না। কিন্তু মোট অর্থের পরিমাণ যদি উৎপাদনের পরিমাণের তুলনায় বেশী হারে বৃদ্ধি পায়, তবে মুদ্রাস্ফীতি হয়। মুদ্রাস্ফীতি হইলে জিনিষপত্রের দাম বাড়ে।

জিনিষপত্রের দাম বৃদ্ধি বা কম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যদি সকলের আয় সমপরিমাণে বাড়িত বা কমিত, তবে কোন অসুবিধার কারণ থাকিত না।

কিন্তু জিনিষপত্রের দাম যখন বাড়ে বা কমে, তখন বহু লোকের আয় একই থাকে, বাড়ে-কমে না। এদের নির্দ্দিষ্ট আয়ের লোক বলা চলে। এই শ্রেণীতে পড়ে সরকারী চাকুরিয়া, পেন্সনভোগী, শিক্ষক, সদাগরী অফিসের চাকুরিয়া প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট বেতনপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা। জিনিষপত্রের দাম বাড়িলে তাহাদের অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়ে। তাহাদের আয় বাড়ে না, অথচ জিনিষের দাম চড়িয়া যায়। ফলে, তাহারা পূর্ব্বের অনুপাতে খাদ্য-বস্ত্র ও অন্যান্য দ্রব্যাদি কিনিতে পারে না কিংবা কিছুই টাকা জমাইতে পারে না। অবশ্য সব জিনিষের দাম কমিলে ইহাদের সুবিধা হয়। আয় একই থাকে, অথচ জিনিষের দাম কম বলিয়া তাহারা বেশী জিনিষ কিনিতে বা বেশী সঞ্চয় করিতে পারে।

জিনিষপত্রের দাম বাড়িলে শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থাও খারাপ হয়। এই সময়ে ধর্ম্মঘট করিয়া ও অন্যান্যভাবে চাপ দিয়া শ্রমিকেরা হয়তো মজুরীর হার বাড়াইতে পারে। কিন্তু সাধারণতঃ জিনিষপত্রের দাম যে হারে বৃদ্ধি পায়, মজুরীর হার সেই অনুপাতে বাড়ে না। ফলে, শ্রমিকদের কষ্ট পাইতে হয়। দাম কমিলে অবশ্য তাহাদেরও সুবিধা হয়। দাম বাড়িলে ব্যবসায়ীর খুবই সুবিধা হয়। কারণ, জিনিষের মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের লাভ বাড়ে। আবার দাম কমিলে তাহারা লোকসানে পড়ে।

Q. 14. (*a*) *What are the chief functions of banks?* (C. U. 1935, '52 ; U. P. 1942)

(*b*) *Show how a good banking system can further the economic well-being of a country.* (C. U. 1939, '42, '44, 1955)

"Banks are the dispensers of credit"—Discuss this statement. (C. U. 1941)

উঃ। (ক) ব্যাঙ্কের প্রধান কাজ হইল উদ্বৃত্ত ধন সংগ্রহ এবং নিয়োগ

করা ; ব্যাঙ্ক জনসাধারণের নিকট হইতে টাকা আমানত নেয় এবং সেই আমানতী টাকা আবার চাষী, ব্যবসায়ী ও অন্যান্য লোকের নিকট লগ্নী করে।

(১) **আমানত লওয়া** ঃ—ব্যাঙ্কের প্রধান কাজ হইল জনসাধারণের নিকট হইতে টাকা আমানত লওয়া। যাহাদের টাকা আছে, তাহারা অনেক সময় ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখে। কারণ, ব্যাঙ্কের উপর তাহাদের এমন আস্থা আছে যে, প্রয়োজনের সময় চাহিলেই সে টাকা ব্যাঙ্কের নিকট হইতে পাওয়া যাইবে। ঐ আমানতী টাকায় ব্যাঙ্ক নিয়মিত সুদ দেয়। আমানত আবার দুই প্রকারের হয়: **চল্‌তি আমানত** এবং **মেয়াদী আমানত** আমানতকারীরা চল্‌তি আমানতের টাকা যে-কোন সময় তুলিতে পারে মেয়াদী বা স্থায়ী আমানত তুলিতে হইলে ব্যাঙ্ককে পূর্ব্বে লিখিত নির্দ্দেশ দিয়া নির্দ্দিষ্ট সময় অপেক্ষা করিতে হইবে। ব্যাঙ্ক সব সময়েই কিছু নগদ টাকা তহবিলে রাখে। ইহাকে বলা হয় ব্যাঙ্কের নগদ রিজার্ভ। অবশিষ্ট টাকা ব্যাঙ্ক অপরের নিকট লগ্নী করে এবং সুদ আদায় করিয়া লাভ করে। যাহাদের চল্‌তি আমানত থাকে, তাহারা চেক কাটিয়া টাকা তুলিয়া লইতে পারে।

(২) **লগ্নী করা** ঃ—ব্যাঙ্কের দ্বিতীয় কাজ হইতেছে টাকা লগ্নী করা। নিজস্ব মূলধন ও আমানতের অধিকাংশ অর্থ ব্যাঙ্ক বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের ধার দেয়। যাহাদের উপর আস্থা আছে ব্যাঙ্ক কেবলমাত্র তাহাদের ধার দেয়। ব্যাঙ্ক তাহাদের নিকট হইতে প্রমিসরি নোট, ব্যবসায়ী হুণ্ডি, শেয়ার প্রভৃতি জামিন রাখে। এইভাবে যাহারা ব্যবসায় বা শিল্প প্রতিষ্ঠা বা প্রসার করিতে চায় তাহারা ব্যাঙ্কের নিকট হইতে টাকা ধার পায়।

কাগজী মুদ্রা চালু করা ঃ—পূর্ব্বে অনেক ব্যাঙ্ক কাগজী মুদ্রা চালু করিত। বর্ত্তমানে কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কাগজী নোট চালায়। কাগজী নোটের বিনিময়ে ব্যাঙ্ক নগদ টাকা দিবে এই বিশ্বাস আছে বলিয়া লোকে

নোট লয়। নোট বদল দিবার জন্য ব্যাঙ্ক সাধারণতঃ তহবিলে উপযুক্ত পরিমাণ নগদ টাকা মজুত রাখে।

ইহা ছাড়াও ব্যাঙ্ক অনেক কাজ করে। ব্যাঙ্কের গ্রাহকরা ব্যাঙ্কে গহনা ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রভৃতি জমা রাখে। ব্যাঙ্ক আমানতকারীদের তরফ হইতে শেয়ার ও হুণ্ডি প্রভৃতি কেনা-বেচার বন্দোবস্ত করে। গ্রাহকদের চিঠিপত্র গ্রহণ করে এবং তাহাদের ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবার বন্দোবস্ত করে এবং আরও অনেক কাজ করে।

(খ) ভাল ব্যাঙ্ক থাকিলে দেশের অনেক দিক হইতে উন্নতি হয়। ভাল ব্যাঙ্ক থাকিলে লোকে সেখানে নিরাপদে জমান টাকা রাখিতে পারে। চোর-ডাকাতের ভয় থাকে না, বরং ব্যাঙ্কের নিকট হইতে সুদ পাওয়া যায়। সুতরাং জমান টাকা মাটির নীচে বা ঘরে না রাখিয়া লোকে ব্যাঙ্কে আমানত রাখে। ব্যাঙ্ক এইভাবে সঞ্চয়ের সহায়তা করে। যাহারা অল্প টাকা জমাইয়াছে তাহারা কিভাবে টাকা লগ্নী করা যায় তাহা বুঝিতে পারে না। তাহারা ব্যাঙ্কে টাকা রাখিয়া নিশ্চিন্ত হয়। আবার, ব্যাঙ্ক বিস্তুরের খুদ যোগাড় করিযা একসঙ্গে বহু টাকা করে। এই সমস্ত টাকা উদ্যমশীল ব্যবসায়ীদের ধার দিয়া ব্যাঙ্ক দেশের বাণিজ্য এবং শিল্পগঠনের সহায়তা করে। ইংলণ্ডের শিল্পোন্নতির একটি কারণ, সেখানে অনেক ভাল ব্যাঙ্ক আছে। ব্যবসায়ক্ষেত্রে বাঙ্গালীদের পিছাইয়া পড়ার একটি প্রধান কারণ ভাল বাঙ্গালী ব্যাঙ্কের অভাব। কোন দেশের আর্থিক উন্নতি সেই দেশের ব্যাঙ্কব্যবস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

(গ) ব্যাঙ্ককে ধারের কারবারী বলা হয়। ব্যাঙ্কের সুনামে আস্থা আছে বলিয়াই লোকে তাহাদের জমান টাকা ব্যাঙ্কে আমানত করে। যদি তাহাদের আমানতী টাকা ব্যাঙ্কের ফিরাইয়া দিবার সামর্থ্য সম্বন্ধে তাহারা সন্দিহান হয়, তবে সবাই তাহাদের আমানত তুলিয়া লইবে। ব্যাঙ্ক গ্রাহকদের টাকা ধার দেয়, কারণ তাহাদের সুনামের উপর ব্যাঙ্কের বিশ্বাস আছে বলিয়াই, অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দেনাদার টাকা শোধ দিবে এই বিশ্বাস আছে

বলিয়াই ব্যাঙ্ক টাকা ধার দেয়। এইজন্য ব্যাঙ্ককে বলা হয় ধারের কারবারী।

Q. 15. *What is a central bank? Discuss its functions.* (C. U. 1946 ; P. U. 1961 ; Burd. P. U. 1962)

উঃ। প্রত্যেক দেশেই নানা শ্রেণীর ব্যাঙ্ক আছে। সাধারণতঃ এই ব্যাঙ্কের শীর্ষস্থানে একটি ব্যাঙ্ক থাকে। ইহাকে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বলে। এই ব্যাঙ্কও অন্যান্য ব্যাঙ্কের ন্যায় আমানত লওয়া ও ধার দেওয়ার কারবার করে। কিন্তু ব্যাঙ্কিং সমাজে ইহার একটি বিশেষ স্থান আছে। ইনি সেই সমাজের সমাজপতি। ইহার উপরে কতকগুলি বিশিষ্ট কাজের ভার দেওয়া আছে, যাহা অন্য ব্যাঙ্কের কর্তব্য নহে।

প্রথমতঃ, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দেশের অভ্যন্তরে নানা শ্রেণীর মুদ্রা চালু করে। ইহা কাগজী নোট চালু করিবার একমাত্র অধিকারী। সাধারণতঃ দেশের আর কোন ব্যাঙ্কের এই অধিকার থাকে না। দ্বিতীয়তঃ, এই ব্যাঙ্ক সরকারী ব্যাঙ্কের কাজ করে। ইহার নিকট সরকারী তহবিল জমা থাকে। প্রয়োজন হইলে ইহা সরকারকে টাকা ধার দেয়। অবশ্য সরকারকে কয়েক মাসের মধ্যেই এই ধার শোধ দিতে হয়। সরকারী ঋণের সুদ দেওয়া, বাজার হইতে ঋণ তোলা ও সময়মত ঋণ শোধ দেওয়া সম্পর্কে সব কাজ এই ব্যাঙ্ককে করিতে হয়। তৃতীয়তঃ, এই ব্যাঙ্ক অন্যান্য ব্যাঙ্কের নেতা, সচিব ও বল-ভরসা; অন্য ব্যাঙ্ক বিপদ্-আপদে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হাত পাতিতে পারে ও বিপদে সব রকম সাহায্য পায়। অবশ্য বিনিময়ে তাহাদের প্রত্যেককে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট কিছু কিছু টাকা জমা রাখিতে হয়। যেমন এদেশে তপশীল শ্রেণীভুক্ত ব্যাঙ্ককে চলতি ও স্থায়ী আমানতের শতকরা তিন টাকা হিসাবে যত টাকা হয়, তাহা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট জমা রাখিতে হয়। এই ব্যাঙ্ক বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময়ের কাজ করে ও বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময়ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে।

অষ্টম অধ্যায়

আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য

Q. 1. *Describe the advantages and disadvantages of foreign trade.* (C. U. 1931, 1942, 1945, 1951)

উঃ। **সুবিধা ঃ**—(ক) বৈদেশিক বাণিজ্যের সহায়তায় আমরা যে সমস্ত দ্রব্য নিজেদের দেশে উৎপন্ন হয় না তাহা ভোগ করিতে পারি। ইংলণ্ডে পাট ও ভারতবর্ষে টিন উৎপন্ন হয় না। কিন্তু আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের মারফত দুইটি দেশই এই দুইটি জিনিষ পায়।

(খ) আবার আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের মারফত প্রত্যেক দেশই অপেক্ষাকৃত সস্তা দামে জিনিষপত্র পায়। ইংলণ্ডে হয়তো তুলা অথবা পাট উৎপাদন করা যায়, কিন্তু সেই বাবদ খরচ হইবে অতিরিক্ত। কিন্তু বৈদেশিক বাণিজ্যের ফলে, ইংলণ্ড এই দুইটি জিনিসই অতি সস্তা দামে ভারতবর্ষ হইতে আমদানী করে। ফলে, জনসাধারণ লাভবান্ হয় এবং সকলের জীবনধারণের মান উন্নত হয়।

(গ) প্রত্যেক দেশেরই কতকগুলি জিনিষ তৈয়ারী করিবার সুবিধা আছে। আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের ফলে সে সেই সমস্ত জিনিষের উৎপাদনে নিজেকে নিয়োজিত করিতে পারে। আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের জন্য শ্রম-বিভাগের বিস্তৃতি সাধন হয়। শ্রমবিভাগনীতির মূল কথা হইল প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী কার্য্যে নিযুক্ত হইবে। পাট, চা প্রভৃতি দ্রব্য উৎপাদনে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুবিধা ভারতবর্ষের আছে। এই সমস্ত দ্রব্য-উৎপাদনে তাহার যোগ্যতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের ফলে ভারতবর্ষ কেবল এই সমস্ত জিনিষ উৎপাদন করে ও ইহাদের

বিনিময়ে বিদেশ হইতে অন্য জিনিষ কিনে। ফলে, ইহার কর্ম্মদক্ষতা বাড়ে, উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং জিনিষপত্রের দাম কমে।

(ঘ) আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যে আন্তর্জ্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি পায়। দ্রব্য-বিনিময়ের মারফত ভাবের আদান-প্রদান হয়। হিন্দুরাজত্বের সময়ে যে সমস্ত আরব ব্যবসায়ী ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিবার জন্য আসিয়াছিল তাহারা ভারতবর্ষ হইতে বহু ভাবধারা নিজেদের দেশে লইয়া গিয়াছে। প্রত্যেক দেশকে জিনিষপত্রের বিক্রয় এবং সরবরাহের জন্য অপর দেশের উপর নির্ভর করিতে হয়; এই নির্ভরশীলতার ফলে জাতিতে জাতিতে শান্তি এবং শুভেচ্ছা বৃদ্ধি পায়।

অসুবিধা ঃ—(ক) আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের প্রধান ত্রুটি হইল, অত্যাবশ্যকীয় জিনিষপত্রের সরবরাহের জন্য বিদেশের উপর নির্ভরশীলতা। ইহার ফলে কোন অস্বাভাবিক অবস্থার উদ্ভব হইলে বিশেষ অসুবিধায় পড়িতে হয়। মনে কর, ভারতবর্ষ নিজের প্রয়োজনীয় লবণ সরবরাহের জন্য ইংলণ্ডের উপর নির্ভর করে। হঠাৎ যুদ্ধ আরম্ভ হইলে ইংলণ্ড ভারতবর্ষে লবণ পাঠাইতে পারিবে না। ফলে, আমাদের অবস্থা কি দাঁড়াইবে তাহা সহজেই অনুমেয়। কারণ, আমাদের পক্ষে রাতারাতি নিজেদের উৎপাদন বাড়ানো সম্ভবপর নয়।

(খ) আবার বৈদেশিক প্রতিযোগিতার ফলে আমাদের দেশীয় কোন শিল্পের ক্ষতি হইতে পারে। ইহার ফলে আমাদের দেশে বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে।

Q. 2. (*a*) *What is meant by balance of trade ?* **(C. U. 1933, 1944)**

(*b*) *Define favourable or unfavourable balance of trade.* **(C. U. 1953)**

উঃ। (ক) কোন দেশের মোট রপ্তানী এবং আমদানী জিনিষের দামের

উদ্বৃত্তকে সেই দেশের **বাণিজ্যিক তহবিল** (Balance of trade) বলা হয়। প্রত্যেক দেশ কিছু কিছু জিনিষ বিদেশে রপ্তানী করে, আবার বিদেশ হইতে অন্যান্য জিনিষ আমদানী করে। এই মোট রপ্তানী এবং আমদানী মূল্যের তহবিলকে বাণিজ্যিক তহবিল বলে।

কখনও কখনও আবার আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যক্ষেত্রে মোট হিসাবের বা দেনা-পাওনার তহবিল (Balance of account) শব্দটি ব্যবহার করা হয়। বাণিজ্যিক তহবিল বলিতে শুধু আমদানী ও রপ্তানী জিনিষের উদ্বৃত্তকে বুঝায়। আর দেনা-পাওনার তহবিল বলিতে আমদানী ও রপ্তানী জিনিষ এবং অন্যান্য দেনা-পাওনার জের বুঝায়। প্রথমটিতে কেবলমাত্র জিনিষের দামের হিসাব মিলিবে, আর দ্বিতীয়টিতে সব রকম দেনা-পাওনার হিসাব মিলিবে।

(খ) রপ্তানী জিনিষের মোট দাম যখন আমদানী জিনিষের মোট দাম হইতে বেশী হয়, তখন তাহাকে অনুকূল বাণিজ্যিক তহবিল (favourable balance of trade) বলা হয়। যাঁহারা এই 'অনুকূল বাণিজ্যিক তহবিল' আখ্যা দিয়াছিলেন তাঁহারা এই ভাবিয়া দিয়াছিলেন যে, মোট রপ্তানীর হিসাব মোট আমদানীর হিসাব হইতে অধিক হইলে এই উদ্বৃত্ত রপ্তানীর দাম হিসাবে সেই দেশে সোনার আমদানী হইবে। দেশে সোনা বেশী হইলে দেশ ধনী হইবে।

মোট রপ্তানীর হিসাব মোট আমদানীর হিসাব হইতে যদি কম হয়, তখন সেই দেশের বাণিজ্যিক তহবিলকে আখ্যা দেওয়া হয় 'প্রতিকূল বাণিজ্যিক তহবিল' (unfavourable balance of trade)। ইহার কারণ বেশী আমদানী জিনিষের দাম দিতে দেশের সোনা বিদেশে চালান দিতে হইবে।

Q. 3. *(a) Define free trade and protection.* **(C. U. 1944 C.)**

(b) Discuss the main arguments in favour of protection.

উঃ। (ক) **অবাধ বাণিজ্যনীতি**ঃ—বিদেশ হইতে অবাধে বিনা বা কম শুল্কে জিনিষ আমদানী করিতে দিবার নীতিকে অবাধ বাণিজ্যনীতি (Free trade) বলে। যে দেশ এই নীতি গ্রহণ করে সেদেশে আমদানী-শুল্ক থাকিলেও তাহা শুধু রাজস্ব-সংগ্রহের জন্য ধার্য্য করা হয়।

সংরক্ষণনীতিঃ—দেশের শিল্পের উন্নতির জন্য বৈদেশিক দ্রব্যের উপর উচ্চহারে শুল্ক ধার্য্য করিয়া আমদানী কমানকে সংরক্ষণনীতি (Protection) বলে।

(খ) **সংরক্ষণনীতির স্বপক্ষে যুক্তি**ঃ—(১) এই নীতির গোড়ার কথা এই যে, দেশের বাজারে দেশের জিনিষ বিক্রয় হইবে। বিদেশী জিনিষ দেশের বাজারে বিক্রয় হইতে দেওয়া উচিত নয়। ইহা করিলে আমাদের দেশের শিল্পগুলি উন্নত হইবে।

(২) সংরক্ষণনীতির ফলে দেশে চাকরীর সংখ্যা বাড়িবে। বিদেশীর প্রতিযোগিতা হইতে দেশী শিল্পগুলিকে সংরক্ষিত করিলে দেশী শিল্পের উন্নতি হইবে। ফলে, এই সমস্ত দেশীয় শিল্পে বহু লোক কাজ পাইবে। সুতরাং সংরক্ষণনীতির ফলে দেশে বেকারের সংখ্যা কমিবে।

(৩) সংরক্ষণের ফলে শ্রমিকদের মজুরী বাড়িবে। দেশের শিল্পের প্রসার হইলে শ্রমিকের চাহিদা ও মজুরীর হার বৃদ্ধি পাইবে।

(৪) দেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিবার জন্য সংরক্ষণনীতির প্রয়োজনীয়তা আছে। সংরক্ষণনীতির ফলে দেশীয় শিল্পের উন্নতি হইলে দেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ হইবে। তাহা হইলে অত্যাবশ্যক জিনিষের জন্য আর বিদেশের উপর নির্ভর করিতে হইবে না। যুদ্ধের সময় জিনিষপত্রের আমদানী বন্ধ হওয়ার দরুণ অযথা কষ্ট ভোগ করিতে হইবে না।

(৫) শিশুরা হাঁটিতে না শিখা পর্য্যন্ত তাহাদের যেমন লালন-পালন এবং সংরক্ষণ করিতে হয়, তেমনি দেশের তরুণ শিল্পকে গড়িয়া তুলিবার জন্য

শক্তিশালী বৈদেশিক প্রতিযোগিতার হাত হইতে রক্ষা করিতে হইবে। তবেই তাহারা পূর্ণবয়স্ক হইয়া বৈদেশিক প্রতিযোগীদের সঙ্গে সমান প্রতিযোগিতা করিতে পারিবে। শক্তিশালী বৈদেশিক প্রতিযোগীর আক্রমণ হইতে দেশের তরুণ শিল্পকে লালন-পালন করিবার প্রয়োজনীয়তা আছে। ইহাকে 'শিশু শিল্পের যুক্তি' বলা হয়।

(৬) সংরক্ষণের ফলে দেশে বিভিন্ন রকমের শিল্প প্রতিষ্ঠা হইবে। জাতীয় জীবনের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য এইরূপ বহুমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন।

সংরক্ষণনীতির বিরুদ্ধে যুক্তি ঃ—(১) সংরক্ষণনীতির ফলে জিনিষ-পত্রের দাম বৃদ্ধি পাইবে, ফলে সাধারণ লোকের কষ্ট হইবে। (২) মজুরীর হার বাড়িলেও শ্রমিকদের কোন লাভ হয় না, কারণ জিনিষপত্রের দাম বৃদ্ধির জন্য তাহাদের বেশী দরে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্র কিনিতে হয়। (৩) সংরক্ষণনীতির ফলে দেশে অনুপযোগী শিল্প গড়িয়া উঠে, ফলে দেশের ক্ষতি হয়। কারণ, এই সমস্ত অযোগ্য শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক এবং মূলধন অধিকতর লাভের সঙ্গে অন্যান্য উপযুক্ত কাজে নিযুক্ত করা যাইতে পারিত।

Q. 4. *Indicate the circumstances in which the imposition of restrictions on international trade may be justified.—Illustrate your answer with reference to Indian conditions.* **(C. U. 1944)**

উঃ। ধনবৈজ্ঞানিকদের অধিকাংশই অবাধ বাণিজ্যনীতি অনুসরণ করিবার পক্ষপাতী। কিন্তু কোন দেশে বিশেষ অবস্থা উপস্থিত হইলে সংরক্ষণনীতির প্রবর্ত্তন করা ন্যায়সঙ্গত হইতে পারে। এই রকমের একটি অবস্থা হইল, ভবিষ্যতে উন্নতির সম্ভাবনাপূর্ণ শিশুশিল্পের সংরক্ষণ। দেশে এমন অনেক শিশুশিল্প থাকিতে পারে যাহারা এখন শক্তিশালী বিদেশী শিল্পের প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারিবে না। কিন্তু তাহাদের যদি

কিছুকালের জন্য সংরক্ষণ করা যায়, তবে তাহারা শীঘ্রই সম্পূর্ণ কার্য্যক্ষম হইয়া বিদেশী শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে পারিবে। দ্বিতীয়তঃ, কখনও কখনও দেশে অত্যাবশ্যকীয় শিল্প গড়িবার জন্য সংরক্ষণনীতির অনুসরণ করিতে হয়। সাময়িক কারণের জন্য এই ধরণের শিল্প গড়িয়া তোলা প্রয়োজন। এইরূপ ক্ষেত্রে সংরক্ষণনীতির ফলে দেশের কিছু অর্থনৈতিক ক্ষতি হইলেও দেশরক্ষার জন্য এই ক্ষতি স্বীকার করা হয়। অর্থনৈতিক প্রাচুর্য্য অপেক্ষা দেশরক্ষা নিশ্চয়ই অধিকতর প্রয়োজনীয়।

ভারতবর্ষে এই সকল অবস্থাই বিদ্যমান। সুতরাং এই দেশে সংরক্ষণ-নীতি বহাল আছে।

Q. 5. *State the infant industry argument for protection. How far is it applicable to Indian conditions?* (C. U. 1941)

উঃ। সংরক্ষণনীতির পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী যুক্তি হইল শিশুশিল্পের যুক্তি। এমন কি যাঁহারা অবাধবাণিজ্যের সমর্থক, তাঁহারাও সংরক্ষণনীতির এই যুক্তিকে মানেন। শৈশবে শিশুদের লালন-পালনের প্রয়োজনীয়তা সকলেই স্বীকার করে। উপযুক্ত লালন-পালনের অভাব হইলে বহুসংখ্যক শিশু মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। আর শৈশবকালে তাহারা উপযুক্ত পরিমাণ যত্ন ও শিক্ষা পাইলে তাহাদের মধ্যে অনেকেই উত্তরকালে নামকরা প্রতিভাবান্ ব্যক্তি হইতে পারিবে।

শিল্পক্ষেত্রেও এই কথা খাটে। এমন অনেক শিল্প থাকিতে পারে, যাহাদের উন্নতি করিতে যে যে জিনিষের প্রয়োজন তাহা সমস্তই দেশে আছে। কিন্তু আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যদি তাহাদের বিদেশের সুপ্রতিষ্ঠিত শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে হয়, তবে তাহারা হয়তো বাঁচিবে না। কিন্তু প্রথম অবস্থায় যদি তাহাদের বিশেষ যত্ন করা যায়,

বিদেশীর কঠোর প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষা করা যায়, তবে সময়ে তাহারা বড হইয়া নিজেদের পায়ে দাঁড়াইতে পারিবে।

শিল্পক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে পিতামাতার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে এবং এই সমস্ত শিশুশিল্পকে বিদেশী প্রতিযোগীর হাত হইতে সংরক্ষণ করিতে হইবে। ফলে, তাহারা নিজেদের সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার সুযোগ পাইবে। এই সমস্ত শিল্প সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে দেশের অর্থ বাড়িবে। কিন্তু এই যুক্তি অনুযায়ী সংরক্ষণনীতি চিরকালের জন্য বহাল রাখা হইবে না। যতক্ষণ না দেশের তরুণশিল্পগুলি সম্পূর্ণ অবয়বে গড়িয়া উঠে, ততক্ষণ এই নীতি অনুসরণ করিতে হইবে। যুক্তিটির সারমর্ম্ম একজন ভারতীয় ব্যবসায়ী এইভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন: "ছোটদের লালন-পালন কর, বালককে রক্ষণাবেক্ষণ কর এবং পূর্ণবয়স্ককে মুক্ত করিয়া দাও।"

এই যুক্তির দ্বারা ভারতবর্ষের সংরক্ষণনীতি সমর্থন করা হয়। ভারতবর্ষ সবে শিল্পোন্নয়ন কার্য্যে নামিয়াছে। কাঁচামালের প্রাচুর্য্য থাকার জন্য ভারতবর্ষে ভবিষ্যৎ শিল্পোন্নয়নের যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। কিন্তু তাহার তরুণ শিল্পগুলি পাশ্চাত্ত্য এবং জাপানের শিল্পের প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে অক্ষম। এই সমস্ত বিদেশীর প্রতিযোগিতা হইতে ভারতবর্ষের তরুণশিল্পকে সংরক্ষণ করিবার প্রয়োজনীয়তা আছে। কার্য্যতঃ, বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে অনেক শিল্প, যেমন লৌহ এবং ইস্পাত শিল্প, দিয়াশলাই শিল্প প্রভৃতি প্রথম অবস্থায় সংরক্ষণের ফলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

———

নবম অধ্যায়

ধনবিভাগ

Q. 1. *Define Rent.* (C. U. 1945)

উঃ। সাধারণ কথায় খাজনা বলিতে আমরা জমি অথবা বাড়ী বাবদ প্রজা বা ভাড়াটে মালিককে যে টাকা দেয় তাহা বুঝি। ধনবিজ্ঞানে এই শব্দটি একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। ধনবিজ্ঞানে খাজনা বলিতে জমির মালিকানা এবং প্রাকৃতিক অন্যান্য সম্পত্তির আয় বুঝায়। একটি বাড়ী হইতে একজন যে ভাড়া পায় তাহাকে খাজনা বলা চলে না। কারণ, বাড়ী প্রকৃতিদত্ত সম্পত্তি নয়, মানুষের তৈরী জিনিষ। জমি, খনি প্রভৃতি কোন প্রাকৃতিক সম্পত্তি হইতে যে আয় হয়, ধনবিজ্ঞানে তাহাকে খাজনা বলে।

Q. 2. *Explain the Ricardian theory of rent.* (C. U. 1939, 1958; U. P. 1937, 1938, 1940)

"The price that is paid for land tends to approximate to the producer's surplus, i.e., to the economic rent." Explain the statement. (C. U. 1935, 1946)

Discuss the origin and significance of rent. (C. U. 1953)

উঃ। প্রত্যেক জমিরই কম-বেশী উর্ব্বরতা আছে। জমি হইতে উৎপন্ন শস্যের যে অংশ জমিদারকে দিতে হয় রিকার্ডোর মতে তাহাই হইল খাজনা। দুইটি কারণে জমিদারকে খাজনা দিতে হয়। প্রথমতঃ, জমির পরিমাণ সীমাবদ্ধ। দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন জমির উর্ব্বরতা ভিন্ন প্রকারের। চাহিদার তুলনায় সরবরাহ কম বলিয়া জমির ব্যবহারের জন্য সকলকে খাজনা দিতে হয়। এই খাজনার পরিমাণ আবার নির্ভর করে জমির উর্ব্বরতার উপর। বিভিন্ন জমির উর্ব্বরতাও বিভিন্ন। যে জমির উর্ব্বরতা বেশী তাহার খাজনার পরিমাণও বেশী। কম উর্ব্বর জমির খাজনা কম হইবে।

মনে কর, কোন অঞ্চলে হয়তো কেবলমাত্র দুইখণ্ড জমিই আছে। একটি অপরটির অপেক্ষা কম উর্ব্বর। প্রথম প্রথম লোক কম থাকার জন্য খাদ্যের চাহিদা কম থাকে। এই চাহিদা কেবলমাত্র প্রথমখণ্ড জমি চাষ করিয়াই মিটান যায়। পরে লোক বাড়িলে খাদ্যের চাহিদা বাড়ে। ফলে, খাদ্যের চাষও বাড়াইতে হয়, এবং চাষীরা দ্বিতীয় জমি চাষ করিতে সুরু করে। চাষীরা দুইটি জমিই সমান পরিশ্রম ও মূলধন দিয়া চাষ করে। দুই জায়গাতেই চাষের খরচ সমান হয় ধরা যাক্, চাষের খরচ হয় মোট একশ টাকা করিয়া। দ্বিতীয় জমির উর্ব্বরতা অপেক্ষাকৃত কম বলিয়া তাহা হইতে ফসল অপেক্ষাকৃত কম হইবে। ধর, প্রথম জমিতে ৫০ মণ ও দ্বিতীয় জমিতে ৪০ মণ ফসল হয। দ্বিতীয় জমিতে ১০০৲ টাকা খরচ করিয়া ৪০ মণ ফসল পাওয়া যায়। সুতরাং ১ মণ ফসলের খরচ হয় আড়াই টাকা। বাজারে ফসলের দাম ২॥০ টাকা না হইলে দ্বিতীয় জমি চাষ হইবে না। দ্বিতীয় জমি চাষ হওয়ার অর্থ বুঝিতে হইবে ফসলের দাম অন্ততঃ ২॥০ টাকা এবং তাহা না হইলে এ জমিতে ফসলের খরচ মোট দামের সমান হইবে না। এই জমিকে প্রান্তিক জমি (marginal land) বলে। প্রান্তিক জমির উৎপন্ন ফসলের মূল্য ঠিক ইহার উৎপাদনের ব্যয়ের সমান। প্রথম জমিতে ৫০ মণ ফসল হয়। তাহা ২॥০ টাকা দরে বিক্রয় করিয়া ১২৫৲ টাকা পাওয়া যায়। এখানেও কিন্তু মোট খরচের পরিমাণ ১০০৲ টাকা। ফলে, এই জমিতে সব খরচ মিটাইয়া ২৫৲ টাকা উদ্বৃত্ত থাকে। এই ২৫৲ টাকা হইল জমির খাজনা। জমি হইতে যে ফসল পাওয়া যায় তাহা যদি চাষের মোট খরচ অপেক্ষা বেশী হয়, তবে এই উদ্বৃত্ত ফসলকে খাজনা বলে। যদি চাষী নিজে জমির মালিক হয়, তবে এই উদ্বৃত্তের সমস্ত অংশটাই সে নিজে পায়। কিন্তু সে যদি প্রজা হয় তবে এই উদ্বৃত্ত ফসলের পরিমাণ (অর্থাৎ ১০ মণ ধান) জমিদারকে খাজনা হিসাবে দিতে হইবে।

জমিতে চাষের খরচ মিটাইয়া যাহা উদ্বৃত্ত থাকে তাহাই হইল খাজনা।

প্রান্তিক জমিতে মণ পিছু যে খরচ হয়, ফসলের দাম ইহার সমান হইবে। প্রান্তিক জমিতে কিছু উদ্বৃত্ত থাকে না, অর্থাৎ এই জমির বাবদ কোন খাজনা দিতে হয় না। সুতরাং জমির খাজনা চাষের খরচের বা ফসলের দামের অন্তর্ভুক্ত নয়।

Q. 3. *Examine the effect of the pressure of population on the rent of land.* (C. U. 1945, 1952)

উঃ। জমির মৌলিক এবং চিরন্তন উৎপাদিকা শক্তি আছে বলিয়াই জমির মালিককে খাজনা দিতে হয়। জমি হইতে চাষের খরচ মিটাইয়া যে উদ্বৃত্ত থাকে তাহাকে খাজনা বলে। এই উদ্বৃত্ত হয় কেন? ইহার দুইটি কারণ আছে।

প্রথমতঃ, জমির পরিমাণ চাহিদার তুলনায় সীমাবদ্ধ। দ্বিতীয়তঃ, জমির উৎপন্ন ফসল উৎপাদনের ক্রমিক হ্রাসের নিয়মের অন্তর্ভুক্ত। ইংরাজ লেখক রিকার্ডোর মতে নিম্নলিখিতভাবে জমির খাজনার পরিমাণ ঠিক হয়।

মনে কর, কোন দেশে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণ জমি আছে, এবং একদল লোক ঐ দেশে গিয়া জমি চাষ করা সুরু করে। প্রথম প্রথম তাহারা সবচেয়ে ভাল জমি চাষ করিবে। দেশে খাজনা বলিতে কিছুই থাকিবে না। জমির সরবরাহ চাহিদার তুলনায় অপর্য্যাপ্ত বলিয়া কেহই জমির জন্য কোন মূল্য দিতে চাহিবে না। যতদিন পর্য্যন্ত ভাল জমিগুলি নিঃশেষ না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত খাজনার কোন প্রশ্নই আসে না; কিন্তু আজ হউক, কাল হউক, শীঘ্রই ভাল জমি সমস্ত চাষ হইয়া যাইবে। জনসংখ্যা যতই বাড়িবে জমির জন্য চাহিদাও ততই বাড়িবে। লোকেরা তখন বাধ্য হইয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি চাষ করিতে সুরু করিবে। সবচেয়ে ভাল জমির উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ দ্বিতীয় শ্রেণীর জমির ফসলের পরিমাণ অপেক্ষা বেশী হইবে। দ্বিতীয় শ্রেণীর জমির মোট উৎপন্ন ফসলের তুলনায় প্রথম শ্রেণীর জমিতে কিছু উদ্বৃত্ত ফসল হইবে। এই উদ্বৃত্ত ফসলই হইল প্রথম শ্রেণীর জমির খাজনা। দেশের

জনসংখ্যা যতই বৃদ্ধি পাইবে, সেখানকার জমির খাজনার পরিমাণ ততই বাড়িবে। জনসংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাইলে লোকে তৃতীয় শ্রেণীর জমি চাষ করিতে আরম্ভ করিবে। তখন দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিতেও উদ্বৃত্ত ফসল পাওয়া যাইবে এবং প্রথম শ্রেণীর জমির উদ্বৃত্ত ফসলের পরিমাণ আরও বাড়িবে। সুতরাং জনসংখ্যা যতই বেশী হইবে জমির খাজনার পরিমাণও ততই বাড়িবে।

Q. 4. *Write notes on :—*

(*a*) ***Ground rent.***

(*b*) *Unearned increment.* (U. P. 1937)

উঃ। (ক) **ভূমির খাজনা** (Ground rent) :—যে জমির উপর বাড়ী তৈয়ারী হয়, তাহার খাজনাকে বলা হয় ভূমির খাজনা। চাষের জমির খাজনার পরিমাণ নির্ভর করে ইহার উর্ব্বরতার উপর। কিন্তু বাড়ীর জন্য ব্যবহৃত জমির খাজনা নির্ভর করে জমির অবস্থানের উপর। সহরের সৌখীন অঞ্চলের জমি অথবা বড়বাজারের নিকটবর্ত্তী জমির খাজনা বেশী হইবে। আবার সহরের উপবর্ত্তী অঞ্চলের খাজনা অপেক্ষাকৃত কম হইবে। চৌরঙ্গী অথবা বড়বাজারের নিকটবর্ত্তী জমির খাজনা এবং দাম দুইই বেশী হইবে। আবার দমদম অথবা ঢাকুরিয়া অঞ্চলে জমির খাজনা অপেক্ষাকৃত কম হইবে। বাড়ীর জমির খাজনা নির্ভর করে ইহার অবস্থানের উপর।

(খ) **অনুপার্জ্জিত বর্দ্ধিত মূল্য** (Unearned increment) :—মাত্র কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও কলিকাতার বালিগঞ্জ অঞ্চলের জমির দাম অত্যন্ত কম ছিল। কিন্তু ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট ঐ অঞ্চলের উন্নতি করিবার সঙ্গে সঙ্গে ঐ অঞ্চলের জমির দামও ক্রমশঃ বাড়িতেছে। কোন অঞ্চলে সহর গড়িয়া উঠার ফলে অথবা অন্য কোন কারণে সেই অঞ্চলের উন্নতি হইলে সেখানকার জমির দামও বাড়িয়া যায়। এইরূপ মূল্যবৃদ্ধিকেই বলা হয় অনুপার্জ্জিত বর্দ্ধিত মূল্য।

Q. 5. *Distinguish between money wages and real wages.* (C. U. 1936 ;

"The labourer is rich or poor, is well or ill rewarded in proportion to the real, not the nominal wages of his labour." Elucidate. (C. U. 1940)

"The attractiveness of a trade depends not on its money earnings, but on its net advantages."—Discuss the statement. (U. P. 1939)

Upon what factors do real wages depend ? (Burd. 1961)

উঃ। শ্রমিক কাজের জন্য যে অর্থ পায় তাহাকে বলা হয় **আর্থিক মজুরী** (Money wages)। আবার শ্রমিক এই অর্থের বিনিময়ে যে পরিমাণ প্রয়োজনীয় সামগ্রী এবং সুযোগ-সুবিধা লাভ করে তাহাকেই বলা হয় **প্রকৃত** বা **সামগ্রীক মজুরী** (Real wages)। আর্থিক মজুরীর পরিমাপ হয় অর্থের দ্বারা। পণ্যদ্রব্য (যেমন খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, আমোদ-প্রমোদ) প্রভৃতির পরিমাণ দ্বারা সামগ্রীক মজুরীর পরিমাপ হয়।

শ্রমিকের সামগ্রীক মজুরী কেবলমাত্র মালিকের নিকট প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণের উপর নির্ভর করে না, অন্য অনেক বিষয়ের উপর নির্ভর করে, যেমন :—

(ক) **মূল্যান্তর** :—জিনিষপত্রের মূল্য হ্রাস পাইলে সমপরিমাণ অর্থদ্বারা পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী সামগ্রী ক্রয় করা যায়। ফলে, সামগ্রীক মজুরীর পরিমাণও বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু জিনিষপত্রের দাম যদি বৃদ্ধি পায়, তবে একই অর্থে অপেক্ষাকৃত কম জিনিষ ক্রয় করা যাইবে। সুতরাং প্রকৃত মজুরী হ্রাস পাইবে।

(খ) **অতিরিক্ত আয়ের সুবিধা** :—শ্রমিক তাহার দৈনিক মজুরী বা মাসিক বেতন ব্যতীত অন্য উপায়ে অতিরিক্ত আয় করিতে পারে। তাহার

প্রকৃত মজুরী নির্দ্ধারণ করিতে হইলে এই অতিরিক্ত আয়ের হিসাব করিতে হইবে। জমিদারের নায়েবের বেতন কম থাকে, কিন্তু তাহারা প্রজাদিগের নিকট হইতে নানা উপায়ে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করে। নায়েবদের প্রকৃত মজুরী নির্দ্ধারণ করিতে হইলে বেতনের সহিত এই অতিরিক্ত আয় যোগ করিতে হইবে।

(গ) **বিনামূল্যে খাদ্য, বাসস্থান প্রভৃতি সরবরাহ :**—অনেক সময়ে শ্রমিকগণ তাহাদের বেতন ব্যতীত মালিকদের নিকট হইতে অন্যান্য জিনিষ যেমন—খাদ্য, বাসস্থান প্রভৃতি বিনামূল্যে কিংবা নাম মাত্রখরচে পায়। ভৃত্য প্রভুর নিকট হইতে বেতন ব্যতীত বিনামূল্যে খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয় প্রভৃতি পায়। সরকারী কর্ম্মচারিগণ অনেক সময় বিনামূল্যে অথবা নামমাত্র ভাড়ায় বাড়ী পায়। প্রকৃত মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে হইলে এই সকল সুবিধার হিসাব করিতে হইবে।

(ঘ) আবার অনেক সময় আয় করিবার জন্য কিছু ব্যয়ও করিতে হয়। ব্যারিষ্টার এবং উকীলদের ভালভাবে কাজ করিতে হইলে কেরানী ও মুহুরী নিযুক্ত করিতে হয়। ইহাদের আর্থিক আয় হইতে এই বাবদ খরচ বাদ দিলে তবেই প্রকৃত মজুরী নির্দ্ধারণ করা যাইবে।

(ঙ) কাজটি স্থায়ী কি অস্থায়ী তাহাও জানা প্রয়োজন। চাকুরীতে আর্থিক মজুরীর পরিমাণ হয়তো বেশী হইতে পারে। কিন্তু চাকুরী যদি অস্থায়ী হয়, তবে কম বেতনের স্থায়ী কাজ হইতে ইহা বাঞ্ছনীয় হয় না। সে ক্ষেত্রে তাহার প্রকৃত মজুরী আর্থিক মজুরী অপেক্ষা অনেক কম করা উচিত।

Q. 6. *What are the principles which determine wages?* (C. U. 1940, '54 ; P. U. 1962 ; U. P. 1941).

উঃ। শ্রমিকের মজুরী কিভাবে ঠিক হয়? মজুরীর পরিমাণ নির্ভর করে শ্রমের চাহিদা এবং সরবরাহের উপর। শ্রমের চাহিদা প্রধানতঃ পণ্য-দ্রব্যের চাহিদার অনুরূপ। মালিক শ্রমিক নিযুক্ত করিতে চায়;

তাহার কারণ পণ্যদ্রব্যের উৎপাদনে শ্রমিক সহায়তা করে। শ্রমিকের শ্রমের ফলে দ্রব্যের উৎপাদন বাড়ে, মালিকের নিকট শ্রমিকের উপযোগ এইখানে। একজন শ্রমিক নিযুক্ত করিলে মোট উৎপাদন যে পরিমাণ বাড়িবে, তাহার মজুরী এই বর্ধিত উৎপাদনের সমান হইবে। মনে কর, মালিক যখন ২০০ শ্রমিককে কাজে নিয়োগ করে, তখন মোট উৎপাদনের পরিমাণ হয় ১০,০০০ টাকা এবং যখন ২০১ জন লোক নিযুক্ত থাকে, তখন উৎপাদনের পরিমাণ হয় ১০,০৫০ টাকা। সুতরাং আমরা বলিতে পারি যে, ঐ ২০১ নং শ্রমিক ৫০ টাকা মূল্যের সামগ্রী উৎপাদন করে। মালিকের নিকট ঐ শ্রমিকের উপযোগের মূল্য ৫০ টাকা হইবে। মালিক শ্রমিক নিয়োগ করিবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত, যতক্ষণ শ্রমিকের মজুরী শ্রমিকের উপযোগের কম থাকে, এবং মালিক অতিরিক্ত শ্রমিক নিয়োগ বন্ধ করিবে তখন, যখন তাহার নিযুক্ত সর্ব্বশেষ শ্রমিকের উৎপাদনের পরিমাণ মজুরীর সমান হইবে। এই শ্রমিককে আমরা বলি 'প্রান্তস্থ শ্রমিক' (Marginal labour) এবং 'প্রান্তস্থ শ্রমিক' যে পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করে, ইহাকে বলা হয় প্রান্তিক উৎপাদন। শ্রমের মজুরী শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদনের সমান হয়।

যতগুলি মজুর কাজ করিতে ইচ্ছুক মজুরীর হার ইহার উপরও নির্ভর করে। শ্রমিকের সংখ্যা যদি বৃদ্ধি পায় তবে মজুরীর হার হ্রাস পাইবে, আর শ্রমিকের সংখ্যা যদি কম হয় তবে মজুরীর হার বৃদ্ধি পাইবে। যেমন, পণ্যদ্রব্যের পরিমাণ বেশী হইলে ইহার প্রান্তিক উপযোগ কমিয়া যায়, সেইরূপ মজুরের সংখ্যা যদি বেশী হয়, তবে তাহাদের প্রান্তিক উৎপাদনও কমিয়া যাইবে। এইভাবে মজুরীর হার শ্রমের চাহিদা এবং সরবরাহ দ্বারা ঠিক হয়।

Q. 7. *Explain why wage rates vary in different occupations within a country.* (C. U. 1937, '44)

উঃ। ভিন্ন কাজের মজুরীর হার ভিন্ন। এই মজুরীর হারে তফাৎ কেন

হয়? কেন সকল শ্রমিক একই হারে বেতন পায় না? ইহার প্রধান কারণ চাকুরীর ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার অভাব। শ্রমিক নিজ খুশীমত যে-কোন কাজে যোগ দিতে পারে না। ফলে, কোন কাজের জন্য হয়তো বেশী সংখ্যক মজুর পাওয়া যায় আবার কোথাও বা কাজের জন্য লোক পাওয়া যায় না। সেইজন্য মজুরীর হার ভিন্ন হয়। কিন্তু যদি সকল শ্রমিকই সর্ব্বপ্রকার কাজ লইতে পারিত, তথাপি মজুরীর হারের তফাৎ থাকিয়া যাইত। এই তফাৎ থাকিত নিম্নলিখিত কারণগুলির জন্য :—

(ক) অনেক কাজ আছে যাহা সাধারণতঃ লোকে পছন্দ করে না। অল্প লোকই সেই কাজে যাইতে চাহে। ঝাড়ুদার মেথরের কাজ অল্প লোকেই করিতে চাহিবে। কর্ম্মপ্রার্থী শ্রমিকের সংখ্যা কম হইলে মজুরীর হার তত বেশী হইবে।

(খ) যদি কোন কাজে যোগদানের পূর্ব্বে অনেক খরচ করিয়া বৃত্তিশিক্ষা লইতে হয় তবে এই কাজে মজুরীর হারও বেশী হইবে। কারণ, তাহা না হইলে লোকে বৃথা খরচ ও পরিশ্রম করিবে না। এইজন্য কৃতী ইঞ্জিনিয়ার এবং আইন ব্যবসায়ীদিগের আয়ের হার বেশী।

(গ) কাজ যদি অস্থায়ী হয়, তবে তাহার মজুরীর হার বেশী হইবে। কারণ, বেশী বেতন না দিলে লোকে অস্থায়ী কাজ নেয় না। এইজন্য যাহারা রাজমিস্ত্রীর কাজ করে তাহাদের মজুরীর হার অপেক্ষাকৃত বেশী হয়। কারণ, তাহারা বর্ষাকালে বেশী কাজ করিতে পারে না।

(ঘ) অনেক কাজে প্রথমে আয়ের পরিমাণ সামান্য থাকে। কিন্তু পরে বেতনের হার খুব বৃদ্ধি পায় কিংবা বেশী হারের সম্ভাবনা থাকে. এইরূপ সম্ভাবনা যত বেশী থাকিবে, লোকে ততই অল্প বেতনে সে কাজ করিতে সম্মত হইবে। আইন ব্যবসায়ে অল্প, কয়েকজন লোক কৃতকার্য্য হয়। সুতরাং যাহারা কৃতকার্য্য হয় তাঁহাদের আয়ের হারও খুব বেশী হইয়া থাকে।

(ঙ) অনেক সময় মালিক শ্রমিকদিগের জন্য বিনা বেতনে বাসস্থান,

আহার প্রভৃতির বন্দোবস্ত করে। এই প্রকারের আনুষঙ্গিক সুখ-সুবিধা থাকিলে মজুরীর হার কম হইতে পারে। যে ক্ষেত্রে অতিরিক্ত আয়ের সম্ভাবনা বা পথ আছে, সেক্ষেত্রে মজুরীর হার কম হইতে পারে। জমিদারের নায়েব অতি সামান্য বেতনে জমিদারের অধীনে কাজ করিত; কারণ, সে জানিত যে, প্রজাদিগের নিকট হইতে প্রচুর অতিরিক্ত আয় হইবে।

(চ) যোগ্য শ্রমিকের মজুরীর হার অযোগ্য শ্রমিকের মজুরীর হার অপেক্ষা বেশী হইবে। শ্রমিকদিগের যোগ্যতার তফাৎ থাকে বলিয়া মজুরীর হার ভিন্ন হয়।

Q. 8. *Define interest. Distinguish between gross interest and net interest.* (C. U. 1941, '44c, '51 ; U. P. 1937, '38)

উঃ। মূলধন নিয়োগ করিলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। সেইজন্য মূলধনের মালিককে বর্দ্ধিত উৎপাদনের যে অংশ দিতে হয় তাহার নাম সুদ। সঞ্চয় না হইলে মূলধন প্রস্তুত হয় না। যাহারা সঞ্চয় করে, তাহারা নিজেদের আয়ের কিছু অংশ অবিলম্বে ভোগের জন্য ব্যয় না করিয়া ভবিষ্যতের জন্য রাখিয়া দেয়। এই সকল লোক তাহাদের সঞ্চয়ের ফলপ্রসবের জন্য প্রতীক্ষা করে। এইজন্য সুদকে প্রতীক্ষার পুরস্কারও বলা হয়। পাওনাদার দেনাদারের নিকট হইতে যে টাকা সুদ হিসাবে আদায় করে তাহাকে বলা হয় **মোট সুদ** (Gross interest)। যে সকল ঋণ পরিশোধের জন্য কোন দুর্ভাবনা থাকে না, আবার আসল ও সুদ আদায় করা লইয়া বেশী পরিশ্রম করিতে হয় না, তাহাতে যে সুদ পাওয়া যায় তাহাকে (**নীট সুদ**—Net interest) বলে। মোট সুদের হার নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর নির্ভর করে:—

(১) **নীট সুদ**:—যে ঋণ পরিশোধের জন্য দুর্ভাবনা থাকে না ও আসল আদায় করিতে পরিশ্রম করিতে হয় না তাহার সুদকে নীট সুদ বলে।

(২) **ঝুঁকিবহনের পুরস্কার ঃ**—ঋণশোধের জন্য দুর্ভাবনা থাকে না এইরূপ ঋণ অল্পই থাকে। অধিকাংশ সময়ে পাওনাদারকে কিছু-না-কিছু অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকিতে হয়। দেনাদার ভাল হইলেও হয়তো অনির্দ্দিষ্ট কারণের জন্য সময়মত টাকা শোধ দিতে অক্ষম হইতে পারে। এই অনিশ্চযতা ও দুর্ভাবনার জন্য পাওনাদারকে নীট সুদ অপেক্ষা বেশী হারে সুদ নিতে হয়। তাহা না হইলে সে ঝুঁকি লইয়া টাকা ধার দিতে চাহিবে না।

(৩) **পরিশ্রমের মূল্য ঃ**—ঋণ দেওয়া ও আদায় করা লইয়া পাওনাদারকে কিছু-না-কিছু হাঙ্গামায় পড়িতে হয়। তাহাদের নিয়মিত হিসাব রাখিতে হয় এবং সুদ ও আসল টাকা আদায় করিতে পরিশ্রম করিতে হয়। এই পরিশ্রমের মূল্য তাহাকে দিতে হইবে। সুতরাং মোট সুদের হার নীট অথবা প্রকৃত সুদ অপেক্ষা বেশী হয়।

Q. 9. *How is interest determined?* (C. U. 1941, 1942, 1944c, 1949)

"The interaction of the forces which influence borrowers and lenders results in a price for the services for capital, the rate of interest."—Elucidate this statement. (C. U. 1938; U. P. 1939)

উঃ। মূলধনের মালিককে মূলধন ব্যবহার বাবদ যে টাকা দিতে হয় তাহাকে সুদ বলা হয়। অন্য যে-কোন জিনিষের দামের ন্যায় মূলধনের দাম নির্দ্ধারিত হয় মূলধনের সাধারণ চাহিদা এবং সরবরাহের দ্বারা। মূলধনের চাহিদা আসে ঋণগ্রহণকারীদিগের তরফ হইতে। মূলধন-বিনিয়োগের ফলে উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এইজন্য ব্যবসায়ীরা মূলধন বিনিয়োগ করিতে চায়। মূলধনের চাহিদা সুদের হার (বা মূলধনের দাম)-এর উপর নির্ভর করে। সুদের হার যত বেশী হইবে মূলধনের

চাহিদাও তত কম হইবে। আবার সুদের হার কমিলে মূলধনের চাহিদাও বৃদ্ধি পাইবে।

ঋণদানকারীদিগের নিকট হইতে মূলধনের সরবরাহ আসে। মূলধনের পরিমাণ মোট সঞ্চয়ের উপর নির্ভর করে এবং মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ আবার নির্ভর করে অনেকগুলি বিষয়ের উপর ; যেমন সঞ্চয়ের ক্ষমতা, সঞ্চয়ের অভ্যাস, দূরদর্শিতা, স্ত্রীপুত্রের প্রতি স্নেহ প্রভৃতি। সুদের হারের উপরও সঞ্চয়ের পরিমাণ কিছুটা নির্ভর করে। সুদের হার বেশী হইলে মূলধনের সরবরাহও কিছু বৃদ্ধি পাইবে। সুদের হার বা সঞ্চয়ের পুরস্কার বৃদ্ধি পাইলে সঞ্চয়ের পরিমাণও বাড়িতে পারে।

এইভাবে আমরা দুইটি তালিকা প্রস্তুত করিতে পারি, একটিতে থাকিবে বিভিন্ন সুদের হারে বিভিন্ন পরিমাণে মূলধনের চাহিদা, আর একটিতে থাকিবে বিভিন্ন হারে বিভিন্ন পরিমাণ মূলধনের সরবরাহ।

ঋণগ্রহণকারীর চাহিদা	যখন সুদের হার	ঋণদানকারীর সরবরাহ
২০,০০০ টাকা মূলধন	৬ টাকা হার	৬০,০০০ টাকার মূলধন
৩০,০০০ " "	৫ " "	৫০,০০০ " "
৪০,০০০ " "	৪ " "	৪০,০০০ " "
৫০,০০০ " "	৩ " "	৩০,০০০ " "

সুদের হার যখন শতকরা ৪ টাকা তখন মোট মূলধনের সরবরাহ মোট চাহিদার সমান হইবে। সুতরাং সুদের হার বাৎসরিক শতকরা ৪ টাকা হইবে।

Q. 10. ***What are the causes of differences in the rates of interest prevailing within a country?*** **(C. U. 1951; U. P. 1941)**

Account for the fact that while the Government of India is able to borrow at 3 p. c., the peasant in the rural areas has to pay much higher rates of interest. **(C. U. 1942; U. P. 1927)**

উঃ। বেতনের হারের ন্যায় সুদের হারও সমান থাকে না। সব লোক একই সুদে ধার পায় না। ভিন্ন লোক ভিন্ন সুদে ধার পায়। ইহার কারণ কি? সুদের হারের তফাৎ ঋণ পরিশোধের নিশ্চয়তা ও অন্যান্য বিষয়ের উপর নির্ভর করে। যেখানে ঋণশোধের অনিশ্চয়তা বেশী, সুদের হারও সেখানে বেশী হইবে। এক শ্রেণীর খাতক আছে, যেমন দেশের সরকার, যাহারা টাকা লইয়া শোধ দিবে না, এই দুর্ভাবনা থাকে না। সুতরাং প্রত্যেকেই তাহাদিগকে ঋণ দিতে চাহিবে ও ফলে তাহারা কম সুদে টাকা ধার করিতে পারিবে। আবার আর একদল খাতক আছে, যেমন চাষীগণ, যাহাদের ঋণ শোধ দিবার অভ্যাস বিশেষ নাই। তাহাদের কেহই ধার দিতে চাহিবে না ও ফলে তাহাদের বেশী হারে সুদ দিতে হইবে। সুদের হারের বিভিন্নতার আর একটি কারণ এই যে, বিভিন্ন ধরণের লেনদেন কারবারে পরিশ্রমের পরিমাণ ভিন্ন। সেইজন্য নীট সুদ ব্যতীত পাওনাদারকে পারিশ্রমিক হিসাবে কিছু অতিরিক্ত টাকা দিতে হয়। এই সকল কারণে সুদের হারে তফাৎ হয়।

Q. 11. ***Define profit and enumerate the different elements in profit*** **(C. U. 1943)**

"Profits are the reward of enterprise." Explain. **(C. U. 1936, 1943)**

উঃ। ব্যবসায়ের মালিক (Entrepreneur) তাহার কার্য্যপরিচালনার জন্য যে পুরস্কার পায় তাহার নাম লাভ (Profit)। মালিকের প্রধান কাজ হইল ব্যবসায়ের অনিশ্চয়তার ঝুঁকি বহন এবং উৎপাদনের উপাদানগুলির সমন্বয় সাধন করা। ইহার ফলে উৎপাদনকার্য্য সাফল্যের সঙ্গে পরিচালিত হয়। মালিককে অন্যান্য উৎপাদকদিগের পারিশ্রমিক পূর্বাহ্নে দিতে হয়। কিন্তু এই বাবদ সে যে ব্যয় করে উৎপন্ন সামগ্রী বিক্রয় করিয়া তাহা হয়ত আদায় হয় না। ব্যবসায়ে তাহা হইলে লোকসান হইবে। আর যদি ব্যবসায়ের অবস্থা ভাল থাকে, তবে উৎপন্ন বস্তু বিক্রয় করিয়া সকল আনুষঙ্গিক খরচ মিটাইয়াও কিছু উদ্বৃত্ত থাকে; এই উদ্বৃত্ত অংশকে লাভ বলে।

(ক) **পরিচালনার পারিশ্রমিক**:—মালিক উৎপাদনকার্য্য পরিচালনার জন্য পারিশ্রমিক হিসাবে কিছু অর্থ পায়। অনেক ধনবৈজ্ঞানিক এই পারিশ্রমিককে শ্রমের মজুরী বলিয়া গণ্য করেন।

(খ) **ব্যবসায়ের ঝুঁকি বহনের পুরস্কার**:—মালিক ব্যবসায়ের ঝুঁকি বহন করে। এইজন্য তাহাকে কিছু পারিশ্রমিক দিতে হইবে। কারণ বেশী পারিশ্রমিক না পাইলে ঝুকি বহন করিতে কেহ রাজী হইবে না। সুতরাং ঝুঁকি বহিবার জন্য যে পারিশ্রমিক তাহা লাভের অন্তর্ভুক্ত।

(গ) **অপ্রত্যাশিত আয়**:—হঠাৎ কোন অপ্রত্যাশিত সুযোগের ফলে লাভের হার বৃদ্ধি পাইতে পারে। জাপান যখন ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিল, তখন ভারতবর্ষের সকল বস্তুর দাম কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বাড়িয়া যায়। ফলে ব্যবসায়ীদিগের লাভ বাড়িয়া গেল।

(ঘ) অনেক ক্ষেত্রে আবার মালিক কিছু একচেটিয়া অধিকার ভোগ করে। এই অধিকার সে নানাকারণে পায়। খুব কম সময়েই বাজারে বিক্রেতাদিগের মধ্যে পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকে। পূর্ণ প্রতিযোগিতা বহাল না থাকিলেই ব্যবসায়িগণ নিজ ইচ্ছামত দামে জিনিষ বিক্রয় করিতে পারে।

আবার কৌশলে বিজ্ঞাপন দিবার ফলে ক্রেতাদিগের মনে এই বিশ্বাস হয় যে অমুক ব্যবসায়ীর জিনিষই বাজারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তবে তাহারা সেই জিনিষ ব্যতীত অন্য কিছু কিনিবে না। একবার এইভাবে বাজারে নিজের প্রতিষ্ঠা করিয়া লইতে পারিলে সেই ব্যবসায়ী মূল্য বাড়াইয়া দিতে পারে ও তাহার মুনাফার অঙ্কও বৃদ্ধি পায়।

দশম অধ্যায়

করনীতি

Q. 1. *What are the different sources of income of the government ?* (C. U. 1943, 1952)

Distinguish between tax revenue and non-tax revenue. (C. U. 1944c.)

উঃ। বিভিন্ন বিভাগের ব্যয় মিটাইবার জন্য সরকারের অনেক অর্থের প্রয়োজন হয়। এই অর্থ বা রাজস্ব সরকার নানা উপায়ে সংগ্রহ করে। সাধারণতঃ, এই উপায়গুলিকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়:—করলব্ধ রাজস্ব ও অন্যান্য উপায়লব্ধ রাজস্ব।

দ্বিতীয় উপায়গুলিকে আবার তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়:—যথা, সরকারী সম্পত্তিলব্ধ রাজস্ব, সরকারী ব্যবসায়লব্ধ রাজস্ব ও অন্যান্য রাজস্ব।

(ক) সাধারণ লোকের যেমন সম্পত্তি আছে, সরকারেরও জমি, বন, খনি প্রভৃতি সম্পত্তি থাকিতে পারে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাহার খাসমহল জমি এবং বন হইতে (অর্থাৎ সরকারী মালিকানার অধীন জমি) কয়েক কোটি টাকা রাজস্ব আদায় করে।

(খ) সরকারের নানাপ্রকারের ব্যবসায় থাকে। এই সকল ব্যবসায়ের মুনাফা সরকারী তহবিলে জমা হয়। ভারত সরকার ডাক এবং টেলিগ্রাফ, রেলওয়ে ও মুদ্রাঙ্কন প্রভৃতি ব্যবসায় পরিচালনা করিয়া তাহা হইতে প্রতি বৎসর অর্থোপার্জ্জন করে।

(গ) এতদ্ব্যতীত সরকার জনসাধারণকে নানাপ্রকার সুবিধা দেয়। যেমন মোটরচালককে গাড়ী চালাইবার অনুমতিপত্র দেয়; আদালতে সুবিচার পাইবার উদ্দেশ্যে মকদ্দমা করিবার সুযোগ দেয়। ইহার পরিবর্ত্তে সরকার ইহাদের নিকট হইতে লাইসেন্স বাবদ টাকা আদায় করে। এইরূপেও কিছু রাজস্ব আদায় হয়।

কিন্তু সরকারী আয়ের অধিকাংশই নানাপ্রকারের কর ধার্য্য করিয়া আদায় হয়। জনসাধারণের হিতার্থে সরকার কর ধার্য্য করে ও করদাতাগণ প্রত্যেকেই ধার্য্য কর দিতে বাধ্য। আয়কর, আমদানী-রপ্তানী শুল্ক প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার করের নিদর্শন।

Q. 2. *Define a tax.* (C. U. 1953) *Distinguish between a direct and indirect tax. Give some examples of both from the Indian tax system.* (C. U. 1930, 1935, 1951 ; U. P. 1935, 1940, 1941

উঃ। ধনবিজ্ঞানে 'কর' শব্দটির বিশেষ অর্থ আছে। সরকার নানা উপায়ে রাজস্ব সংগ্রহ করে। সরকার অনেক সময় কোন বিশেষ শ্রেণীর লোককে বিশেষ সুবিধা ভোগ করিতে দেয়। পরিবর্ত্তে তাহাদের নিকট হইতে রাজস্ব আদায় করে। ইহাকে কর বলে না। কর ধার্য্য করা হয় সর্ব্বসাধারণের হিতার্থে; কোন ব্যক্তিবিশেষে বা শ্রেণীর মঙ্গলের জন্য নহে। আবার অনেক সময় সরকারী তহবিলে অর্থ দেওয়া বা না দেওয়া লোকের উপর নির্ভর করে। যেমন, আমি যদি রেলগাড়ী না চড়ি, তবে সরকার আমার নিকট হইতে রেলভাড়া বাবদ টাকা আদায় করিতে পারে না। ডাক

টিকিট না কিনিলে ডাক বিভাগের তহবিলে আমাদের অর্থ দিতে হয় না। কিন্তু কর যাহাদের উপর ধার্য্য করা হয়, তাহাদের কর দিতেই হইবে। কর দেওয়া বাধ্যতামূলক। তাহার পরিবর্ত্তে কোন সুবিধা আমরা পাই আর না পাই তাহাতে কিছু আসে যায় না। যাহাদের বাৎসরিক আয় তিন হাজার টাকা কিংবা তাহার বেশী, তাহাদের আয়কর দিতেই হইবে। সুতরাং সকলের সুবিধার জন্য সর্ব্বসাধারণের নিকট হইতে বাধ্যতামূলকভাবে যে অর্থ আদায় করা হয়, তাহাকে কর বলা হয়।

কর আবার দুই প্রকারের হয়। প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ। যিনি করদাতা, অর্থাৎ সরকার যাহার নিকট হইতে কর আদায় করে, তিনিই যখন করের ভার সম্পূর্ণ বহন করেন, তখন সেই করকে **প্রত্যক্ষ কর** (Direct tax) বলা হয়। সরকার যাহার নিকট হইতে এই কর আদায় করে, শেষ পর্য্যন্ত করের বোঝা তাহাকে বহন করিতে হয়। আয়কর একটি প্রত্যক্ষ কর।

সরকার যাহার নিকট হইতে প্রথমে কর আদায় করে, তিনি যদি অন্যের ঘাড়ে সেই করের বোঝা চাপাইয়া দিতে পারেন, তবে তাহাকে **পরোক্ষ কর** (Indirect tax) বলা হয়। প্রথমে যে কর দেয়, সে আবার অন্যের নিকট হইতে টাকা আদায় করে, যেমন বিক্রয় কর। সরকার দোকানদারের নিকট হইতে এই কর আদায় করে। কিন্তু তাহারা খরিদ্দারের নিকট হইতে টাকা আদায় করিয়া লয়। কাজেই করের আসল বোঝা খরিদ্দারের ঘাড়ে পড়ে। যে কর দেয়, ও যে করভার বহন কর, তাহারা ভিন্ন লোক। আমদানী-রপ্তানী শুল্ক, উৎপাদনশুল্ক প্রভৃতিকে পরোক্ষ কর বলা হয়।

Q. 3. *Discuss the merits and defects of direct and indirect taxes.* (C. U. 1938, 1940, 1944c, 1945 ; U. P. 1940, 1941)

উঃ। **প্রত্যক্ষ করব্যবস্থায়** নিম্নলিখিত **সুবিধা** পাওয়া যায় :—

(ক) **নিশ্চয়তা :**—এই ব্যবস্থায় প্রত্যেক করদাতা জানে তাহাকে

কি পরিমাণ কর দিতে হইবে। প্রত্যেকেই জানে সে কতটা আয়কর দিতেছে।

(খ) **মিতব্যয় ঃ**—এইরূপ কর আদায় করিবার ব্যয় রাজস্বের তুলনায় খুব কম হয়। আয়কর হইতে সরকারের যাহা আয় হয়, কর আদায় করিবার ব্যয় সে তুলনায় খুব কম হয়।

(গ) **সমতা ঃ**—যে কর দেয় সে নিজেই করভার বহন করে বলিয়া সামর্থ্য অনুযায়ী প্রত্যেকের উপর কর ধার্য্য করা যায়। যাহার আয় কম সে কম হারে কর দেয়। আবার যে ধনী তাহার উপর বেশী হারে কর ধার্য্য করা চলে। যাহার যেমন অবস্থা, তাহার নিকট হইতে সেই হারে কর আদায় করা হয়। ফলে কাহারও প্রতি অন্যায় হয় না।

(ঘ) নিজের পকেট হইতে টাকা দিতে হয় বলিয়া প্রত্যেক করদাতাই সচেতন হইয়া উঠে, এবং সরকার কেন এত কর আদায় করিতেছে, সে বিষয়ে অনুসন্ধান করে। ফলে, তাহার নাগরিক কর্ত্তব্যবোধ জাগ্রত হয়।

কিন্তু **প্রত্যক্ষ করব্যবস্থারও** নানারূপ **অসুবিধা** আছে :—

(ক) এই কর বেশী ধার্য্য করিলে সরকার জনসাধারণের বিরাগভাজন হয়। কারণ বেশী কর দিতে কেহ পছন্দ করে না।

(খ) আবার এই ব্যবস্থায় কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে একসঙ্গে অনেকগুলি টাকা দেওয়া করদাতাদের পক্ষে সব সময়ে সুবিধাজনক হয় না।

(গ) এই ব্যবস্থার আর একটি দোষ হইল এই যে, ইহা করদাতাদের অসৎ করিয়া তুলে। আয়কর এড়াইবার জন্য অনেক লোকই নিজেদের আয়ের মিথ্যা হিসাব সরকারে দাখিল করে।

পরোক্ষ করব্যবস্থারও কতকগুলি **সুবিধা** আছে :—

(ক) যাহারা শেষ পর্য্যন্ত এই করের ভার বহন করে তাহারা জানিতে পারে না যে, তাহারা কর দিতেছে। লবণ কিনিবার সময় খুব কম লোকই ভাবে যে, সে সরকারকে কর দিতেছে। কাজেই যে সরকার প্রত্যক্ষ কর

ধার্য্য না করিয়া পরোক্ষ কর আদায় করে, সে জনসাধারণের বেশী বিরাগ-ভাজন হয় না।

(খ) পরোক্ষ কর ধার্য্য করিয়া ধনী-দরিদ্র সকলের নিকট হইতেই কিছু-না-কিছু রাজস্ব আদায় করা যায়। আয়কর সকলের নিকট হইতে আদায় করা হয় না ; কিন্তু লবণের উপর ধার্য্য কর সকলকেই দিতে হয়।

(গ) সৌখীন দ্রব্যের উপর কর ধার্য্য করিলে বড লোকদের নিকট হইতে বেশী রাজস্ব আদায় করা যায়।

(ঘ) মাদকদ্রব্যের উপর পরোক্ষ কর ধার্য্য করিলে ইহার দাম অনেক বৃদ্ধি পায় ও ইহার বিক্রয় কমিয়া যায়। তাহার ফলে সমাজের মঙ্গল হয়।

পরোক্ষ করব্যবস্থার অনেক দোষ আছে ঃ—

(ক) পরোক্ষ করব্যবস্থায় লোকের সামর্থ্য অনুযায়ী কর ধার্য্য করা যায় না। লবণের উপর শুল্ক ধনী-দরিদ্র সকলকেই সমানভাবে দিতে হয়। গরীবের কর দিবার ক্ষমতা খুব কম। অথচ তাহার নিকট হইতে বড লোকদের মত সমান হারে কর আদায় করা হয়। সুতরাং পরোক্ষ করে গরীবের প্রতি অবিচার করা হয়, ধনীদের সুবিধা হয়।

(খ) যাহারা করভার বহন করে, তাহারা সকল সময়ে ইহা জানে না বলিয়া তাহাদের নাগরিক কর্তব্যবোধ জাগ্রত হয় না।

সকল দিক বিবেচনা করিয়া দেখিলে বলা যায়, প্রত্যক্ষ করব্যবস্থা পরোক্ষ করব্যবস্থা হইতে অনেক ভাল।

Q. 4. *What are the different canons of taxation ?*

Explain the characteristics of a good tax. (C. U. 1951).

উঃ। যে সমস্ত নীতির উপর ভিত্তি করিয়া করভার বণ্টন করা হয় ইহাদের করবিধি (Canons of taxation) আখ্যা দেওয়া হয়। ইংরাজ লেখক এড্যাম স্মিথ্ চারিটি করবিধির কথা বলিয়াছেন। তাঁহার মতে সাম্য, নিশ্চয়তা, সুবিধা এবং মিতব্যয় এই চারিটি করবিধি আছে।

সাম্যনীতিতে (Equality) বলে যে, প্রজারা সরকারের ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী কর দিবে। এই সামর্থ্যের পরিমাপ করা হইবে কে কত আয় করে তাহার দ্বারা। এড্যাম্ স্মিথ্ মনে করেন যে, যদি আনুপাতিক হারে কর (Proportional taxation) ধার্য্য করা হয়, তবে এই নীতি অনুযায়ী কাজ করা হইবে। প্রত্যেকের নিকট হইতে যদি একই হারে কর আদায় করা হয়, তবে কাহারও প্রতি অবিচার করা হয় না। কিন্তু বর্ত্তমান কালের লেখকদের মত হইল এই যে, ধনীদের উপর অপেক্ষাকৃত অধিক হারে কর ধার্য্য করিতে হইবে। কারণ তুলনায় গরীবদের অপেক্ষা তাহাদের সামর্থ্য বেশী।

নিশ্চয়তাবিধিতে (Certainty) বলে যে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে যে কর দিতে হইবে তাহার পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতে হইবে। যখন তখন যাহা খুশী কর বসাইয়া দিলেই হইবে না, কর দেওয়ার সময়, কর ধার্য্যের নিয়ম, করের পরিমাণ প্রভৃতি সুস্পষ্ট এবং সহজভাবে পূর্ব্বেই জানাইয়া দিতে হইবে।

সুবিধার বিধিতে (Convenience) বলে, যে সময়ে ও যে ভাবে কর দিলে করদাতার সুবিধা হয় সে সময়েই কর আদায় করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

মিতব্যয়ের বিধি (Economy) হইল এই যে, এমনভাবে কর ধার্য্য করিতে হইবে যাহার ফলে করদাতার পকেট হইতে যে অর্থ আদায় হয়, তাহার বেশী অংশই সরকারী তহবিলে জমা হয়। অর্থাৎ যত রাজস্ব আদায় হইবে সেই তুলনায় ব্যয় যেন বেশী না হয়। এককোটি টাকা আদায় করিতে যদি ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে হয়, তবে এই বিধি অনুসারে সেই কর ধার্য্য করা উচিত নয়।

আধুনিক কালের লেখকগণ আরো দুইটি বিধির কথা বলেন, **ফলপ্রসূতা** (Productivity) এবং **স্থিতিস্থাপকতা** (Elasticity)।

প্রথম বিধিতে বলে যে, এইরূপ কর ধার্য্য করা উচিত যাহা হইতে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার কোন ক্ষতি না করিয়া বেশী পরিমাণে রাজস্ব আদায় হয়।

দ্বিতীয় বিধিতে বলে যে, এইরূপ কর ধার্য্য করা উচিত যাহা হইতে কোন আকস্মিক প্রয়োজনের সময় করের হার বৃদ্ধি করিয়া বেশী পরিমাণ রাজস্ব আদায় করা যায়।

উদাহরণস্বরূপ লবণশুল্কের উল্লেখ করা যায়। প্রয়োজনমত লবণশুল্কের হার বাড়াইয়া প্রচুর রাজস্ব আদায় করা যাইত।

কর ধার্য্য করিবার সময় মন্ত্রীদের এইসকল করবিধি মানিয়া চলা উচিত।

Q. 5. *On what main principles can equity in taxation be secured ?* (C. U. 1932, 1949)

How should the burden of taxes be distributed among the different sections of society ? (C. U. 1953.)

উঃ। প্রত্যেক দেশের সরকারকে জনসাধারণের নিকট হইতে প্রচুর রাজস্ব সংগ্রহ করিতে হয়। এই বিরাট করভার জনসাধারণের মধ্যে কিরূপ ভাবে ভাগ করিলে সকলের প্রতি ন্যায় করা হইবে? এ সম্বন্ধে কি করা উচিত তাহা এড্যাম্ স্মিথ বহুদিন পূর্ব্বে তাঁহার প্রথম করবিধিতে উল্লেখ করিয়াছেন। প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী কর দিতে হইবে। এই সামর্থ্যের বিচার হইবে আযের পরিমাণ দ্বারা। এই বিধি যে ন্যাযসঙ্গত তাহা সকলেই স্বীকার করে। কিন্তু সমস্যা হইল এই যে, আয়বৃদ্ধির সঙ্গে সামর্থ্য আনুপাতিক না ক্রমবর্দ্ধমান হারে বৃদ্ধি পায় বলিয়া ধরা হইবে? এড্যাম্ স্মিথের মতে আয়ের উপর আনুপাতিক হারে (যথা, প্রত্যেকেরই আয়ের শতকরা ১০ টাকা হারে) কর বসাইলে ন্যায়সঙ্গত হইবে। কিন্তু একথা আধুনিক লেখকগণ মানিয়া লইতে রাজী নহেন। তাঁহাদের মতে আয়বৃদ্ধির সঙ্গে কর দিবার

সামর্থ্য অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পায়, সুতরাং আয় যত বেশী হইবে ততই অপেক্ষাকৃত অধিক হারে কর ধার্য্য করিতে হইবে।

বর্ত্তমানকালে প্রত্যেক রাষ্ট্রই করব্যবস্থায় ক্রমিক হারবৃদ্ধির নীতি (Progressive principle in taxation) মানিয়া চলে। সকল কর এইরূপ ভাবে ধার্য্য করিতে হইবে যাহাতে করভারের অধিকাংশই ধনীদের উপর পড়ে এবং অপেক্ষাকৃত কম বোঝা গরীবদের উপর পড়ে।

Q. 6. *"The rich should be taxed more in proportion than the poor." Why? Do all taxes obey this principle?* (C. U. 1931)

উঃ। কর দিলে করদাতাগণের প্রত্যেকের কিছু-না-কিছু ক্ষতি হয়। এই ক্ষতির পরিমাণ সবচেয়ে কম হওয়াটাই কাম্য। একজন গরীবের পক্ষে সামান্য টাকা দিতে হইলে যে ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়, একজন ধনীকে হয়তো ১০০ টাকা দিতে হইলেও তত ক্ষতি স্বীকার করিতে হইবে না। সুতরাং ধনীদের অধিক হারে করভার বহন করা উচিত। গরীবের চেয়ে ধনীর কর দিবার সামর্থ্য অধিক সন্দেহ নাই। যাহার আয় ১০০ টাকা তাহার উপর শতকরা ৫ টাকা হারে কর বসাইলে তাহার যে কষ্ট হইবে, একজন ১০০০ টাকা আয়ের লোকের নিকট হইতে ৫০ টাকা আদায় করিলে তাহার অনেক কম কষ্ট হইবে। যে গরীব সে ৫ টাকা দিলে হয়তো কোন প্রয়োজনীয় জিনিষ কিনিতে পারিবে না। আর ধনীকে হয়তো কেবলমাত্র কোন বিলাসের সামগ্রী কেনা ছাড়িতে হইবে। গরীবের নিকট হইতে এক টাকার প্রান্তিক উপযোগ যত হইবে ধনীর নিকট তাহা অপেক্ষা কম। সুতরাং ধনীর পক্ষে অধিক হারে করভার বহন করাটা ন্যায়সঙ্গত। স্কুলের ছেলেরা যখন সরস্বতী পূজা করে তখন তাহারা ধনীর ছেলেদের নিকট বেশী চাঁদা আদায় করে এবং দরিদ্র ছাত্রের নিকট কম চাঁদা আদায় করে। সকলে এই নিয়ম ন্যায়সঙ্গত বলিয়া মনে করে। কর দিবার সময় একই নীতি মানিয়া নেওয়া উচিত।

কারণ, রাষ্ট্র হইল সকলের সুবিধার্থে একটি সাধারণ প্রতিষ্ঠান। ধনীদের স্কন্ধে করভারের বৃহত্তর অংশ চাপাইয়া দেওয়া ন্যায়সঙ্গত। এই নীতি সকল কর ধার্য্য করিবার সময় মানা চলে না। আয়কর এবং উত্তরাধিকার কর এই নীতি অনুযায়ী ধার্য্য করা হয়। কিন্তু লবণকর, দিয়াশলাই শুল্ক প্রভৃতি পরোক্ষ করের ভার ধনী অপেক্ষা গরীবের ঘাড়ে বেশী পড়ে।

Q. 7. *Write notes on :—*

Income Tax, Death Duties, Customs, Excise. (U. P. 1943)

উঃ। **আয়কর** ঃ—আয়ের উপরে যে কর বসান হয় তাহাকে আয়কর বলে। যাহাদের আয় অল্প তাহাদের উপর কর ধার্য্য করা হয় না। একটি সর্ব্বনিম্ন নির্দ্দিষ্ট আয় অপেক্ষা যাহাদের বেশী আয় আছে, তাহাদের উপরই কর ধার্য্য করা হয়। বর্ত্তমানে এদেশে যাহাদের আয় বৎসরে অন্ততঃ ৩,০০০ টাকা কিংবা তাহার বেশী, কেবলমাত্র তাহাদেরই এই কর দিতে হয়। আয়ের পরিমাণ যত বৃদ্ধি পায় করের হারও তত বাড়ান হয়। যাহার আয় বৎসরে ৫,০০০ টাকা পর্য্যন্ত তাহাকে টাকা প্রতি ৫ পয়সা হিসাবে কর দিতে হয়। যাহার আয় ৫ হাজার টাকার অধিক অথচ ১০ হাজারের কম তাহার নিকট হইতে টাকা প্রতি ৭ পয়সা হারে কর আদায় করা হয়। কখনও আবার যাহারা বিবাহিত এবং যাহাদের ছেলেমেয়ে আছে, তাহাদের উপর কম হারে কর বসান হয় ও যাহারা অবিবাহিত কিংবা সন্তানহীন, তাহাদের বেশী হারে কর দিতে হয়।

উত্তরাধিকার কর ঃ—মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির উপর যে কর বসান হয় তাহাকে উত্তরাধিকার কর (Death duty বা Estate duty) বলা হয়। উত্তরাধিকারীকে সম্পত্তি দখলের পূর্ব্বে এই কর দিতে হয়। আয়করের ন্যায় এই করের হারও ক্রমিক গতিতে বৃদ্ধি পায় এবং সম্পত্তির মূল্য একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের কম হইলে কোন কর বসান হয় না। আবার, সম্পত্তির

উত্তরাধিকারী যদি মৃত ব্যক্তির দূর সম্পর্কের আত্মীয় হয়, তবে তাহার করের হার অপেক্ষাকৃত অধিক করা হয়।

আমদানী-রপ্তানী শুল্ক ঃ—বিদেশ হইতে আমদানী ও বিদেশে রপ্তানী দ্রব্যের উপর যে শুল্ক ধার্য্য করা হয়, তাহাকে আমদানী-রপ্তানী শুল্ক বলা হয়। আমদানী জিনিষের উপর যে কর বসান হয় তাহাকে আমদানী শুল্ক (Import duty) বলা হয়; এবং বিদেশে প্রেরিত দ্রব্যের উপর যে কর বসান হয়, তাহাকে রপ্তানী শুল্ক (Export duty) বলা হয়। এই প্রকার শুল্ক যদি কেবল রাজস্ব আদায় করিবার জন্য ধার্য্য করা হয় তবে ইহাদের রাজস্ব কর (Revenue duty) বলা হয়। আর যদি শুল্কের উদ্দেশ্য বিদেশীর প্রতিযোগিতা হইতে দেশীয় শিল্পের সংরক্ষণ করা হয়, তাহাকে সংরক্ষণ শুল্ক (Protective duty) বলা হয়।

উৎপাদন শুল্ক ঃ—নিজ দেশে উৎপন্ন এবং ব্যবহৃত দ্রব্যের উপরে যে শুল্ক বসান হয় তাহাকে উৎপাদন শুল্ক (Excise) বলা হয়। ভারতবর্ষে লবণ, চিনি, দিয়াশলাই প্রভৃতি দ্রব্যের উপর শুল্ক ধার্য্য করা হইয়াছে।

Q. 8. *What is public debt? Classify the different kinds of public debt.*

উঃ। কর ধার্য্য করিয়া যে রাজস্ব আদায় হয় তাহা দিয়া সকল সময়ে সরকারী ব্যয় সঙ্কুলান হয় না। তখন সরকার জনসাধারণের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করে। এই ঋণকে সরকারী ঋণ (Public debt) বলা হয়। সাধারণতঃ যুদ্ধের সময় সরকার ঋণ গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। ইহা ছাড়া, রেলনির্ম্মাণ, জলসেচের খাল কাটা প্রভৃতি অধিক ব্যয়সাপেক্ষ কাজের জন্য সরকার ঋণ গ্রহণ করে।

সরকারী ঋণের শ্রেণীভেদ করা হয়। প্রথমতঃ, ইহাদের মেয়াদী ঋণ

(Funded debt) এবং চলতি ঋণ (Floating debt) এই দুইভাগে ভাগ করা হয়। যে সমস্ত ঋণ পরিশোধের কোন নির্দ্দিষ্ট কাল ঠিক করা নাই, কিংবা যাহা দীর্ঘকাল পরে শোধ দেওয়া হইবে, তাহাদের মেয়াদী ঋণ বলে। আর অল্পকালের মধ্যে যে ঋণের পরিশোধ করা হয় তাহাকে চলতি ঋণ বলা হয়।

সরকারী ঋণকে আবার কখনও কখনও উৎপাদনশীল (Productive) এবং অনুৎপাদনশীল (Unproductive) এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। রেলনির্ম্মাণ, জলসেচের খাল কাটা প্রভৃতি কাজের জন্য সরকার যে ঋণ করে, তাহাকে **উৎপাদনশীল ঋণ** বলে। এই শ্রেণীর ঋণের বাবদ যে সুদ দিতে হয় এবং আসল টাকা জলসেচের খাল হইতে প্রাপ্ত আয় হইতে শোধ হইয়া যায়। আবার যুদ্ধবাবদ ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য সরকার যে ঋণ গ্রহণ করে তাহাকে **অনুৎপাদনশীল ঋণ** বলা হয়। ভারত সরকারের মোট ঋণের অধিকাংশই রেলনির্ম্মাণ, জলসেচকার্য্য প্রভৃতি উৎপাদনশীল কাজে লগ্নী আছে।

তৃতীয় খণ্ড

ভারতের অর্থনীতি

প্রথম অধ্যায়

প্রাকৃতিক পরিবেশ

Q. 1. *What do you mean by monsoons ?*

উঃ। ভারত মহাসাগর হইতে প্রবাহিত যে জলভরা মেঘ সারাদেশকে জলসিক্ত করিয়া দেয়, তাহাকে মৌসুমী বায়ু বলে।

ভারতবর্ষে দুই প্রকার মৌসুমী বায়ু আছে—দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু (অথবা সিক্ত মৌসুমী) এবং উত্তর-পূর্ব্ব মৌসুমী বায়ু (অথবা শুষ্ক মৌসুমী)।

দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু জুন হইতে সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত প্রবাহিত হয়। এই বায়ু দুইটি স্রোতে প্রবাহিত হয়—একটি আরবসাগরীয় স্রোত, আর একটি বঙ্গোপসাগরীয় স্রোত। আরবসাগরীয় স্রোত আরব সাগরে উত্থিত হইয়া বোম্বাই, পাঞ্জাব এবং মধ্যপ্রদেশের উপর দিয়া প্রবাহিত। বঙ্গোপসাগরীয় স্রোত আসাম, বাংলাদেশ, বিহার, উড়িষ্যা এবং উত্তরপ্রদেশের কিছু কিছু অঞ্চলের উপর দিয়া প্রবাহিত হয়। ভারতবর্ষের মোট বৃষ্টিপাতের শতকরা ৯০ ভাগই দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী হইতে পড়ে ; সুতরাং ইহার গুরুত্ব অনেক বেশী।

উত্তর-পূর্ব্ব মৌসুমী বায়ু শীতকালে প্রবাহিত হয়। এই বায়ু ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্ব্ব অঞ্চল হইতে অর্থাৎ স্থলপথে উত্থিত বলিয়া ইহা হইতে বিশেষ বৃষ্টিপাত হয় না। মাদ্রাজ, বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ এবং পাঞ্জাবে এই বায়ুর ফলে শীতকালে সামান্য পরিমাণ বৃষ্টি হয়।

ভারতবর্ষে বৃষ্টিপাত সব অঞ্চলে সমানভাবে হয় না। একদিকে আসামের

চেরাপুঞ্জী অঞ্চলে বৎসরে ৪৩৬" ইঞ্চি অর্থাৎ প্রচুর বৃষ্টি হয়, অপর দিকে রাজস্থান অঞ্চলে বৎসরে মোট ৩" ইঞ্চি অর্থাৎ খুব কম বৃষ্টি হয়। আবার সময়মত বর্ষা হইবে কিনা তাহাও অনিশ্চিত। ঠিক সময়ে বর্ষা নাও হইতে পারে। ঠিক সময়ের পূর্ব্বে মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হইলে শস্যের ক্ষতি হইবে। আবার কোন বৎসর হয়তো মৌসুমী বায়ু দেরীতে প্রবাহিত হওয়ায় যথেষ্ট পরিমাণে বৃষ্টিপাত হইল না, এবং জলাভাবে ভাল ফসল হইল না। ইহার ফলে খাদ্যাভাব এমন কি দুর্ভিক্ষ পর্য্যন্ত হইতে পারে।

Q. 2. *Discuss the economic effects of the monsoons on agriculture.* (C. U. 1955)

"*The prosperity of India depends entirely on the monsoons.*"—*Elucidate this statement.* (C. U. 1937, '39)

"*In European countries the variations in rainfall may increase or diminish the abundance of a crop, but in India they produce far greater consequences.*"—*Elucidate the statement.* (C. U. 1944c)

উঃ। মৌসুমী বায়ু ভারত মহাসাগর হইতে সজল মেঘ ভারতে আনিয়া দেয়। ফলে, এই দেশে বর্ষা হয়। ভারতবর্ষ প্রধানতঃ কৃষিপ্রধান দেশ, এবং অধিবাসীদের প্রায় শতকরা ৯০ ভাগ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভর করে। কৃষিকার্য্যে বৃষ্টিপাতের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ নাই। ভাল ফসল তুলিতে হইলে ক্ষেতে প্রচুর পরিমাণে জল দিতে হইবে। এই প্রয়োজনীয় জল সরবরাহের জন্য হয় সেচকার্য্যের উপর, না হয় মৌসুমী বায়ুর উপর নির্ভর করিতে হয়। ভারতবর্ষে সেচকার্য্যের বিশেষ কোনো উন্নতি হয় নাই। মোট কর্ষিত জমির মাত্র এক-পঞ্চমাংশ জলসেচের ব্যবস্থা আছে। ফলে, শস্যের প্রাচুর্য্য অথবা অভাব নির্ভর করে বর্ষার উপর। যে বৎসর উপযুক্ত সময়ে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হয়, সে বৎসর খুব ভাল ফসল

হয়। চাষীদিগের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয়। হাতে নগদ টাকা বেশী আসিলে তাহারা অনায়াসে খাজনা দিতে পারিবে ও নানাদ্রব্য কিনিবে। ফলে, জমিদারদের অবস্থা ভাল হইবে ও ব্যবসায়ের উন্নতি হইবে। পাট, তুলা প্রভৃতি বেশী পরিমাণে দেশে উৎপন্ন হইলে বিদেশেও বেশী পরিমাণে রপ্তানী করা সম্ভব হইবে। সুতরাং মোট রপ্তানী বাড়িয়া যাইবে, এই দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের উন্নতি হইবে। চাষীদের আয় বাড়িলে তাহারা বেশী শিল্পজাত দ্রব্য কিনিবে। ফলে শিল্পেরও উন্নতি হইবে।

তখন রেল, জাহাজ প্রভৃতি অধিক পরিমাণে খাদ্যশস্য বহন করিবে এবং এইভাবে তাহাদের আয়ও বাড়িয়া যাইবে।

সরকারের লাভ হইবে এবং বৈদেশিক বাণিজ্য বৃদ্ধি পাইলে, সরকার বাণিজ্যশুল্ক হইতে অধিক রাজস্ব আদায় করিতে পারিবে। রেলের আয় বৃদ্ধি পাইলে সরকার রেল হইতে বেশী রাজস্ব পাইবে।

কিন্তু উপযুক্তরূপে বর্ষা না হইলে অথবা একেবারে বর্ষা না হইলে ভারতবর্ষের সকল শ্রেণীর লোককে দুঃখ-দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হইবে। চাষীদিগের অবস্থা শোচনীয় হইবে; তাহাদের আয় কমিয়া যাইবে। জমিদার খাজনা আদায় করিতে পারিবে না; মহাজন সুদ পাইবে না। ফসল কম হইলে দেশে খাদ্যাভাব এবং দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে। সরকারকে দেশের লোকদের সাহায্যার্থে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতে হইবে। চাষীগণ শিল্পজাত দ্রব্য কম কিনিবে বলিয়া শিল্পের মালিকদের ক্ষতি হইবে। শস্য-রপ্তানীর অভাবে বৈদেশিক বাণিজ্য এবং রেলের আযও বহুল পরিমাণে কমিয়া যাইবে। বাণিজ্যশুল্কের মারফত সরকারের অপেক্ষাকৃত কম রাজস্ব আদায় হইবে। সুতরাং আমরা দেখিতে পাই যে, মৌসুমী বায়ু ও বর্ষার পরিমাণের উপর এই দেশের সকলের ভাগ্য নির্ভর করে।

Q. 3. ***Give a brief account of the main agricultural crops of India.***

উঃ। ভারতবর্ষে কৃষিজাত শস্যকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়—খাদ্য-শস্য এবং অন্যান্য শস্য। দ্বিতীয় প্রকার শস্যের ব্যবহার হয় শিল্পের কাঁচামাল-রূপে। মোট কর্ষিত অঞ্চলের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগে খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়, প্রায় শতকরা ৬ ভাগে তৈলবীজের চাষ হয় এবং শতকরা ৮ ভাগে তন্তুজাতীয় দ্রব্যের চাষ হয়।

খাদ্যশস্য :—ধান। ভারতের যত জমিতে ধান চাষ হয় এত আর কোন শস্য চাষ হয় না। যত জমিতে খাদ্যশস্যের চাষ হয়, তাহার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ অঞ্চলেই ধান হয়। চাল পশ্চিমবাংলা, আসাম এবং মাদ্রাজের প্রধান খাদ্য। পশ্চিমবাংলার মোট কৃষি-অঞ্চলের শতকরা ৭০ ভাগ এবং আসামের শতকরা মোট ৮০ ভাগ অঞ্চলেই ধানের চাষ হয়। তবুও ভারতবর্ষকে চাল আমদানী করিতে হয়। ইহার কারণ ভারতবর্ষে প্রতি বিঘায় মোট উৎপন্ন ধানের পরিমাণ অন্য দেশের তুলনায় খুবই কম।

গম। ভারতবর্ষের মোট কৃষি-অঞ্চলের শতকরা প্রায় ১০ ভাগে গমের চাষ হয়। পৃথিবীর পাঁচটি প্রধান গম-উৎপাদনকারী দেশের মধ্যে ভারতবর্ষ অন্যতম। ভারতবর্ষের গম রবিশস্য অথবা শীতকালীন শস্য। প্রধানতঃ পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র এবং বিহারে গম উৎপন্ন হয়। এই সকল প্রদেশের প্রধান খাদ্য গম।

ভারতবর্ষেই সর্ব্বপ্রথম ইক্ষুচাষের প্রবর্ত্তন হয়, এবং ভারতবর্ষের মাটি ইক্ষুচাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষেই সবচেয়ে বেশী জমিতে ইক্ষুর চাষ হয়। উত্তরপ্রদেশ, বিহার, পাঞ্জাব, পশ্চিমবাংলা, মাদ্রাজ এবং মহারাষ্ট্রে ইক্ষুর চাষ হয়। কিন্তু ভারতবর্ষে প্রতি বিঘায় উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ খুব সামান্য; জাভার তুলনায় মাত্র এক-চতুর্থাংশ ফসল প্রতি বিঘায় উৎপন্ন হয়।

অন্যান্য খাদ্যশস্যের মধ্যে বার্লি (উত্তরপ্রদেশ এবং বিহার), যব, বাজরা প্রভৃতি (মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি অঞ্চলে) ; কলাই প্রভৃতি ডাল

ও অন্যান্য ডাল (প্রধানতঃ উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চলে) পাওয়া যায়।

অন্যান্য শস্য। অন্যান্য শস্যের মধ্যে তূলা, পাট প্রভৃতি তন্তুজাতীয় শস্য, তৈলবীজ, চা, তামাক প্রভৃতি ভারতবর্ষে পাওয়া যায়।

তুলা। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই তূলা উৎপন্ন হয়। মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব এবং মাদ্রাজে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে তূলার চাষ হয়। ভারতবর্ষে উৎপন্ন তূলার অধিকাংশেরই আঁশ ছোট। এই দেশে দীর্ঘ আঁশ-সম্পন্ন তূলা কম পরিমাণে উৎপন্ন হয়।

পাট। পাটের চাষ অ-বিভক্ত বাংলার একচেটিয়া কারবার ছিল। বর্ত্তমানে পাটচাষ-অঞ্চলের অধিকাংশই পূর্ব্ববঙ্গে অবস্থিত। অ-বিভক্ত বাংলার পাটচাষের এক-চতুর্থাংশ অঞ্চল মাত্র পশ্চিমবাংলায় অবস্থিত। আসাম, বিহার এবং উড়িষ্যা-অঞ্চলেও সামান্য পরিমাণে পাটের চাষ হয়। অষ্ট্রেলিয়া, ইংলণ্ড, জার্ম্মানী, যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে বহু পাট রপ্তানী হয়।

তৈলবীজ। ভারতবর্ষে উৎপন্ন তৈলবীজের মধ্যে চিনাবাদাম সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। ইংলণ্ড ও ইউরোপে ইহা প্রচুর পরিমাণে রপ্তানী হয়। সেখানে ইহা হইতে উদ্ভিজ্জ তৈল প্রস্তুত হয়। ইহাতে ভারতবর্ষের ক্ষতি হয়, কারণ তৈল বাহির করিয়া লইলে যে খইল থাকে, তাহার দ্বারা জমিতে সার দেওয়া যায় ও গরুর খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা যায়; ভারতবর্ষের নিজস্ব তৈলশিল্প থাকা দরকার। এতদ্ব্যতীত ভারতবর্ষে তিসি, রাই বা সরিষা, তিল প্রভৃতি তৈলবীজ উৎপন্ন হয়।

চা। সম্ভবতঃ ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রথম চা-চাষের প্রচলন হয়। ভারতবর্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে চা উৎপন্ন হয়। আসাম, পশ্চিমবাংলার দার্জ্জিলিং এবং জলপাইগুড়ি, মাদ্রাজের নীলগিরি-অঞ্চল, উত্তরপ্রদেশের দেরাদুন এবং পাঞ্জাবের কাঙ্গরা উপত্যকা-অঞ্চলে চায়ের চাষ

হয়। মোট উৎপন্ন চায়ের প্রায় শতকরা ৯০ ভাগই বিদেশে রপ্তানী করা হয়।

এতদ্ব্যতীত ভারতবর্ষে কফি, সিঙ্কোনা, তামাক, গাঁজা, ভাঙ্ প্রভৃতিও উৎপন্ন হয়।

Q. 4. *What are the factors which influence the growth of population in India?* (C. U. 1937)

উঃ। জনসংখ্যাবৃদ্ধি দুইটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। প্রথম, জন্ম হইতে মৃত্যুর হার কত বেশী তাহার উপর; দ্বিতীয়তঃ, দেশের কত লোক বিদেশে যায় ও কত লোক বিদেশ হইতে আসে তাহার উপর।

ভারতবর্ষে **জন্মের হার** খুব বেশী। এখানে জন্মের হার হাজারে ২৪ জন; ইংলণ্ডে জন্মের হার মাত্র ১৮ জন। এত বেশী জন্মের হারের প্রধান কারণ বাল্যবিবাহপ্রথা এবং সার্ব্বজনীন বিবাহপ্রথা। বহুদিন হইতে এই দেশে বাল্যবিবাহপ্রথা প্রচলিত আছে। আবার এই দেশে প্রায় সকলেই বিবাহ করে। পাশ্চাত্ত্য দেশের তুলনায় এই দেশে অবিবাহিত পুরুষ অথবা মহিলার সংখ্যা খুবই কম। বাবা ও মা ছেলে-মেয়েদের বিবাহ দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্মের মধ্যে মনে করেন। হিন্দু এবং মুসলমান উভয়ের মধ্যে একই সঙ্গে একাধিক বিবাহের প্রচলন ছিল। এই দেশে জীবনধারণের মান খুব নীচু। ফলে জন্মহারের আধিক্য হইয়াছে।

ভারতবর্ষে **মৃত্যুর হারও** খুব বেশী। হাজারে ১১'৮ জন লোকের মৃত্যু হয়, অথচ জাপানে মাত্র ৮ জন মারা যায়। ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর বহুসংখ্যক শিশু মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বাংলাদেশে হাজার শিশু জন্মগ্রহণ করিলে এক বৎসরের মধ্যেই ২৭০ জনের মৃত্যু হয়। স্ত্রীলোকদের মধ্যেও মৃত্যুর হার বেশী। বহু স্ত্রীলোক সন্তানজন্মের সময় মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এতদ্ব্যতীত যক্ষ্মা এবং অন্যান্য রোগে বহু স্ত্রীলোকের মৃত্যু হয়। অল্পবয়সে মাতৃত্বের ফলেও বহু স্ত্রীলোকের মৃত্যু ঘটে। এখানে সর্ব্বপ্রকার সংক্রামক

ব্যাধি যেমন ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত প্রভৃতির প্রকোপ খুব বেশী। ইহার জন্য দায়ী ভারতবর্ষের দারিদ্র্য, পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব এবং অস্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রার প্রণালী ও শিক্ষা-দীক্ষার অভাব।

মৃত্যুর হার কমিতেছে ও জন্মের হার অধিক থাকাতে জনসংখ্যা বেশী বাড়িতেছে।

বিদেশ হইতে লোক ভারতবর্ষে বাসের জন্য আগমন করে, আবার ভারতবর্ষ হইতেও বিদেশে লোক যায়। বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে বেশী লোক আসে না। কিন্তু বহুসংখ্যক ভারতবাসী বিদেশে বাসের জন্য নিজ দেশ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিযাছে। ফলে ভারতবর্ষের জনসংখ্যা কমিয়া যায়।

Is India over-populated ? (C. U. 1951)

উঃ। বর্ত্তমানে চীনদেশের পরে ভারতবর্ষই পৃথিবীর মধ্যে জনবহুল দেশ। ১৯৬১ সালে ভারতের মোট জনসংখ্যা ৪৩ কোটি ৮০ লক্ষ। এইরূপ জনসংখ্যাবৃদ্ধির ফলে অনেক লোক চিন্তিত হইয়া পডিযাছেন। তাঁহাদের মতে জনসংখ্যা অতিরিক্ত হইয়া গিয়াছে। মোট জনসংখ্যা এত বেশী যে, উৎপন্ন খাদ্যদ্বারা তাহাদের যথোপযুক্ত ভরণপোষণ অসম্ভব। ভারতবর্ষে উৎপন্ন খাদ্যদ্রব্য মোট জনসংখ্যার প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রচুর। এই মোট উৎপন্ন খাদ্যদ্রব্য যদি সকল লোকের মধ্যে সমানভাগে ভাগ করিয়া দেওয়া যায়, তবুও প্রত্যেকে উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্য পাইবে না। দ্বিতীয়তঃ, ভারতবর্ষের জন্মের হার এবং মৃত্যুর হার দুই-ই বেশী। ম্যালথাসের (Malthus) মত অনুসারে যদি জন্মশাসনের বন্দোবস্ত না করা হয (অর্থাৎ যদি জন্মের হার না কমানো হয়), তবে প্রকৃতি মৃত্যুব হার বাড়াইয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করিবে। ভারতবর্ষে সংক্রামক ব্যাঁধির বিস্তার এবং অন্যান্য কারণে অধিক মৃত্যুর হার প্রমাণ করে যে, ভারতবর্ষের জনসংখ্যা খাদ্যবস্তুর তুলনায় বেশী এবং প্রকৃতি উদ্বৃত্ত জনসংখ্যাকে বেশী হারে মারিয়া

ফেলিতেছে। এই অতিরিক্ত জনসংখ্যার একটি ফল ভারতবাসীর অস্বাভাবিক দারিদ্র্য।

আর এক দল আছেন যাঁহারা এই মতবাদে বিশ্বাস করেন না; ভারতবর্ষে জন্মের হার বেশী বটে, সেইরূপ মৃত্যুর হারও খুব বেশী। ফলে, জনসংখ্যা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায় নাই। পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির তুলনায় ভারতবর্ষে জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার অপেক্ষাকৃত কম ছিল। ভারতবর্ষে প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ আছে; ইহার উপযুক্ত ব্যবহার করিতে পারিলে অনায়াসে বহুলোকের অন্নসংস্থান করা যাইবে। এই দেশের আসল সমস্যা লোক-সংখ্যার আধিক্য নয়। আসল সমস্যা প্রাকৃতিক সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার আমরা করিতে পারি নাই। কৃষিকার্য্যের উন্নতি হইলে ভারতবর্ষে উৎপন্ন খাদ্যশস্যের পরিমাণ বহুলাংশে বৃদ্ধি পাইবে। ভাল জলসেচের ব্যবস্থা এবং বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষ করিয়া ফসলের পরিমাণ অনায়াসে দ্বিগুণ করা যায়। এতদ্ব্যতীত ভারতবর্ষে শিল্পের বিশেষ উন্নতি হয় নাই। শিল্পের উন্নতি হইলে ভারতের ধনসম্পদ বহু বৃদ্ধি পাইবে। বর্ত্তমান জনসংখ্যা ভরণপোষণ করিতে তখন আর দুঃখ পাইতে হইবে না। বস্তুতঃ, এই ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করিলে ভারতবর্ষ তাহার বর্ত্তমান জনসংখ্যা অপেক্ষা অধিকসংখ্যক লোককে ভরণপোষণ করিতে পারিবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কৃষিকার্য্য

Q. 1. *"Though agriculture is the primary industry of India, yet it lags far behind that of any other country." Why is Indian agriculture backward? Can you suggest measures for its improvement?* (C. U. 1926)

What are the main drawbacks of agriculture in India? Suggest some important measures for its improvement. (C. U. 1931,1938)

উঃ। এদেশে কৃষিকার্য্যের গুরুত্ব সহজেই বোঝা যায়। ভারতবর্ষের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৭০ ভাগ লোক চাষে নিযুক্ত আছে এবং প্রায় ৯০ ভাগ লোক প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে ভরণপোষণের জন্য কৃষিকার্য্যের উপর নির্ভর করে। চাষের অবস্থা খারাপ হইলে দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে, আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্য কমিয়া যাইবে এবং সরকারের রাজস্বের ঘাটতি হইবে। সুতরাং আমাদের সর্ব্ববিধ আর্থিক উন্নতির মূলে আছে কৃষিকার্য্য।

অথচ এই দেশে চাষের অবস্থা খারাপ। অন্য যে-কোন দেশের তুলনায় ভারতবর্ষে প্রতি বিঘায় উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ অনেক কম। ভারতবর্ষের প্রতি বিঘাতে উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ জাপানের উৎপন্ন শস্যের প্রায় অর্দ্ধেক। এই দেশের প্রতি বিঘা জমিতে মাত্র ১৩ সের তূলা উৎপন্ন হয়, আমেরিকায় প্রায় ৩৩ সের এবং মিশরে ৭৫ সের তূলা জন্মায়।

এত কম উৎপাদনের কারণ কি? কারণগুলিকে প্রধানতঃ চারিভাগে ভাগ করা যায়:—জমি, শ্রম, মূলধন এবং বিক্রয়-ব্যবস্থা।

(ক) **জমিঃ**—(১) ভারতবর্ষের মাটি শুষ্ক বলিয়া তাহাতে প্রচুর পরিমাণে জল দিতে হয়। বর্ষার জল পাইলে ও জলসেচের ব্যবস্থা করিয়া জমিতে জল দেওয়া যায়। বর্ষার জলের কোন নিশ্চয়তা নাই এবং সকল সময়ে ভাল বর্ষাও হয় না। ফলে চাষীরা সর্ব্বদা যথেষ্ট পরিমাণ জল পায় না। জলসেচের ব্যবস্থাও উপযুক্তরূপ করা হয় নাই। মোট কর্ষিত অঞ্চলের মাত্র এক-পঞ্চমাংশ জমিতে জলসেচের বন্দোবস্ত আছে। উপযুক্ত পরিমাণ জলের অভাবে ফসল কম হয়।

(২) জমিতে উপযুক্ত পরিমাণে সার দেওয়ার বন্দোবস্ত নাই। গোবর

সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ সার। কিন্তু গোবর জমিতে না দিয়া ঘুঁটে করিয়া পোড়ান হয়। মূলধনের অভাবে চাষীরা কৃত্রিম সার কিনিতে পারে না।

(৩) ভারতবর্ষে জোত ও জমির আয়তন খুবই ছোট। ইহার জন্য বহুলাংশে দায়ী দেশের উত্তরাধিকার আইন। সব ছেলেকে সমান ভাগ দিতে হয় বলিয়া প্রত্যেক মালিকের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাহার জমি খণ্ড খণ্ড হইতেছে। ফলে, জোতের আযতন ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইতেছে। জোতের পরিমাণ খুব ছোট হইলে ভালভাবে চাষ করা যায় না ও ফসল কম হয়।

শ্রম :—ভারতবর্ষের চাষী অযোগ্য নহে, কিন্তু সে একেবারেই নিরক্ষর। আবার ম্যালেরিয়া ও অন্য রোগে নিত্য ভোগে বলিয়া তাহার স্বাস্থ্য ভাল নয়। চাষীদের জীবনধারণের মান খুব নীচু। কর্ম্মদক্ষতাও কম এবং বৈজ্ঞানিক উপাযে চাষের ব্যবস্থা তাহারা জানে না। দীর্ঘকাল দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করিয়া তাহারা অদৃষ্টবাদী হইয়া পড়িযাছে।

(খ) **মূলধন** :—চাষীগণ খুবই গরীব বলিযা সঞ্চয় করিবার কোন ক্ষমতাই তাহাদের নাই। ফলে, চাষের খরচের জন্য গ্রামের মহাজনের নিকট হইতে তাহাদের ঋণ গ্রহণ করিতে হয়। মহাজন অনেক ক্ষেত্রেই চড়া সুদ চায এবং নিরক্ষর চাষীদিগকে ঠকায। একবার মহাজনের খপ্পরে পড়িলে তাহারা আর বাহির হইযা আসিতে পারে না। মূলধনের অভাবে চাষীরা সার, ভাল বীজ এবং উন্নত ধরণের চাষের যন্ত্রপাতি কিংবা ভাল জাতের গরু-বলদ কিনিতে পারে না। তাহারা বৈজ্ঞানিক প্রথায় কৃষি-কার্য্যের কথা আজ পর্য্যন্ত ভাবিতে পারে না।

(ঘ) **বিক্রয়-ব্যবস্থা** :—ফসল বিক্রযের ভাল ব্যবস্থাও এই দেশে নাই। চাষীগণ বাজারে বা হাটে উৎপন্ন ফসল বিক্রয় করিবার জন্য লইয়া যায়। সেখানে ফড়িযা দালালের দল তাহাদের নানাপ্রকারে ঠকায। দারিদ্র্যের জন্য চাষী ফসল কাটার পরই ফসল বিক্রয় করিতে বাধ্য হয।

সাধারণতঃ সে সময়ে ফসলের দাম সর্ব্বাপেক্ষা কম থাকে। পরে দাম বাড়িলে কোন লাভ হয় না।

চাষের উন্নতি কিভাবে করা যায়? প্রথমতঃ, জমিতে ভাল জল দিবার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। বর্ষার উপর নির্ভর না করিয়া খাল, বিল, ইত্যাদি কাটিয়া জলসেচের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এইজন্য সরকারকে বেশী অর্থব্যয় করিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, চাষীদিগের জন্য অল্পদামে কাঠ এবং অন্যান্য জ্বালানীর বন্দোবস্ত করা প্রযোজন। তাহা হইলে তাহারা জমিতে গোবরের সার দিতে পারিবে। হাড ও সোরামাটির সার ব্যবহার সম্বন্ধে চাষীদের শিক্ষা দিতে হইবে। তবেই জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি পাইবে। এতদ্ব্যতীত চাষীদিগকে অল্পসুদে মূলধন সরবরাহ করিতে হইবে যাহাতে তাহারা রাসায়নিক সার কিনিতে পারে।

তৃতীয়তঃ, ক্ষেতের আযতন বড় করিতে হইবে। ছোট ছোট ক্ষেতে বেশী উৎপাদন হয না। চাষীগণ যাহাতে সমবায়পদ্ধতিতে নিজেদের ক্ষেতগুলি একসঙ্গে চাষ করে তাহার জন্য শিক্ষা দিতে হইবে। দরকার হইলে আইন প্রবর্ত্তন করিয়া সমবায-চাষব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের সহাযতা করিতে হইবে।

চতুর্থতঃ, চাষীদিগের উপযুক্ত শিক্ষা দিতে হইবে। প্রত্যেক গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয স্থাপন করিতে হইবে। কৃষকদিগের জন্য সাধারণ শিক্ষা এবং কৃষিশিক্ষা এই দুইয়েরই বন্দোবস্ত করা প্রয়োজন।

পঞ্চমতঃ, চাষীদের জন্য অল্পসুদে উপযুক্ত পরিমাণ মূলধন-সরবরাহের বন্দোবস্ত করিতে হইবে। প্রত্যেক গ্রামে সমবায়-ঋণদান-সমিতি প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। এই সমিতির কাজ হইবে চাষীদিগকে কমসুদে মূলধন সরবরাহ করা। যাহাতে তাহারা তাহাদের পূর্ব্ব ঋণ শোধ করিতে পারে এবং ভাল বীজ, ধান, সার, উন্নতধরণের যন্ত্রপাতি কিনিতে পারে ইহার সুবিধা করিয়া দিতে হইবে। গবেষণা করিয়া নূতন চাষের যন্ত্র আবিষ্কার

করিবার চেষ্টা সরকারী কৃষিবিভাগের করা উচিত। উন্নতধরণের বীজ উৎপাদন করিয়া চাষীদিগের মধ্যে বিতরণ করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। চাষীদিগের সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনমত তাকাবি ঋণ দিতে হইবে।

ষষ্ঠতঃ, গ্রামে গ্রামে **সমবায়-বিক্রয়-সমিতির** প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। এই সমিতির মারফত চাষীরা তাহাদের উৎপন্ন শস্য ঠিকমত দামে বিক্রয় করিতে পারিবে। অথবা **ক্রয়-সমবায়-সমিতি** প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাদের মারফত কৃষকদের প্রয়োজনীয় ভাল বীজ, ভাল সার এবং উন্নতধরণের যন্ত্রপাতি প্রভৃতি কিনিবার বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

Q. 2. *What steps have the government taken to improve agriculture in India ?* (C. U. 1927)

উঃ। সরকারের সহায়তা ব্যতীত কৃষিকার্য্যের উন্নতি করা অসম্ভব। ভারত সরকার বিভিন্ন সময়ে কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য কিছু কিছু কাজ করিয়াছে। '৮৮৯ সালে ভারত সরকার ডাঃ ভোয়েলকার নামক একজন বিশেষজ্ঞকে চাষের বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার জন্য নিযুক্ত করে। তিনি তাঁহার বিবরণীতে চাষের উন্নতির বিষয়ে বহু মূল্যবান্ তথ্য প্রকাশ করেন। পরবর্ত্তী কালে ১৯২৬ সালে একটি রাজকীয় কমিশন নিযোগ করা হয়। এই কমিশনের সভাপতি ছিলেন মারকুইস্ অব লিন্‌লিথগো। তিনি পরে গভর্ণর-জেনারেল পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কমিশনের বিবরণী অনুযায়ী চাষের উন্নতির জন্য নিম্নলিখিত সরকারী ব্যবস্থা করা হইয়াছে :—

(ক) **জলসেচের ব্যবস্থা** :—সরকারী ব্যয়ে বহু জলসেচের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। বিশেষ করিয়া পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, মাদ্রাজ, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি অঞ্চলে বড় বড় খাল কাটা হইয়াছে এবং উত্তরপ্রদেশে নলকূপ খনন করিয়া সেচের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

(খ) **কৃষিবিভাগ** :—প্রত্যেক প্রাদেশিক সরকারের অধীনে একটি

করিয়া কৃষিবিভাগ খোলা হইয়াছে। এই কৃষিবিভাগ চাষের উন্নতির **ব্যবস্থা** করিয়াছে; **বহুস্থানে** উন্নত **প্রকারের** কৃষিপ্রণালী শিক্ষা দিবার জন্য আদর্শ কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করা হইযাছে।

(গ) **শিক্ষা** :—গ্রাম-অঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের জন্য চেষ্টা করা হইয়াছে। কৃষিবিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য সরকার অনেকগুলি কৃষিবিদ্যালয় এবং কলেজ স্থাপন করিয়াছে।

(ঘ) **গবেষণাগার** :—ভারত সরকার একটি **রাজকীয় কৃষি-গবেষণাগার** (Indian Council of Agricultural Research) স্থাপন করিয়াছে। এই গবেষণাগারের অধীনে কৃষিকার্য্যের বিভিন্ন দিক হইতে বহু গবেষণা করা হয়।

•(ঙ) **পশুচিকিৎসা-বিভাগ** :—প্রত্যেক রাজ্যে সরকারী পশু-চিকিৎসা বিভাগে গবাদি পশুর চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

(চ) **মূলধন** :—সরকার কৃষিঋণ আইন এবং জমির উন্নতিকল্পে ঋণ আইন (Land Improvement Loans Act) প্রবর্ত্তন করিয়াছে। এই আইনে সরকার চাষীদের অভাবের সময কৃষিকার্য্যে উন্নতির জন্য তাকাবি ঋণ দিতে পারে। অবশ্য এই বিষয়ে সামান্য টাকা লগ্নী করা হইয়াছে।

(ছ) **.সমবায়** :—১৯০৪ সালে সরকারী তত্ত্বাবধানে সর্ব্বপ্রথম সমবায় আন্দোলনের (Co-operative movement) প্রবর্ত্তন হইয়াছে। সমবায় সমিতিগুলির কাজ হইল চাষীদিগকে সুদ লইয়া ধার দেওয়া। **সমবায়-বিক্রয়** এবং **সমবায়-ক্রয়-সমিতি** স্থাপন করিয়া উৎপন্ন শস্যের বিক্রয় এবং প্রযোজনীয় দ্রব্য কিনিবার সুযোগ চাষীগণকে দেওযা হইযাছে।

(জ) **জমির একত্রীকরণ ও ফসল বিক্রয়-ব্যবস্থা** :—সরকার খণ্ডবিখণ্ড জমি একত্রীকরণের জন্য সচেষ্ট হইয়াছে। অবিভক্ত পাঞ্জাবে সমবায কৃষিব্যবস্থার দ্বারা ছোট ক্ষেতগুলির একত্রীকরণের চেষ্টা করা হইয়াছিল। কোন কোন রাজ্যে আবার আইন করিয়া সমবায়-কৃষিব্যবস্থা

প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। ফসল-বিক্রয়ের ব্যবস্থা যাহাতে উন্নত হয় সেই উদ্দেশ্যে সরকার কয়েকজন বিক্রয়-আধিকারিক নিযুক্ত করিয়াছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত যাহা করা হইয়াছে প্রয়োজনের তুলনীয় তাহা অতি সামান্য।

Q. 3. *"One of the principal handicaps of Indian agriculture is the endless subdivision and fragmentation of land."—Elucidate the statement.* **(C. U. 1941, 1951 ; U. P. 1941)**

উঃ। আমাদের দেশে চাষের ক্ষেত্রগুলি আয়তনে অতি ক্ষুদ্র। মাঠগুলির দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিলে ইহা সকলের চোখে পড়ে। কোন চাষীর মৃত্যু হইলে তাহার ছেলেদের মধ্যে জমি সমান অংশে ভাগ হয়। ফলে, ব্যক্তিগত জোতের পরিমাণ ক্রমশঃই আকারে ক্ষুদ্র হইতেছে। আবার একজনের ভাগের সকল জমিও একসঙ্গে অবস্থিত নহে ; ক্ষেতগুলি গ্রামের চতুর্দ্দিকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত থাকে। জমির এই অবস্থার নাম হইয়াছে জমি-বিখণ্ডন (Fragmentation)। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, পাঞ্জাবে ২২ জন চাষীর মোট জোতের পরিমাণ তিন বিঘা বা তাহারও কম। মহারাষ্ট্রের রত্নগিরি-অঞ্চলে এক একটি জমিখণ্ডের আয়তন মাত্র ৩০ই বর্গগজ। পূর্ব্ববঙ্গের দিনাজপুর জিলায় প্রত্যেক চাষীর জোতের পরিমাণ ১.৫ একর। কিন্তু এই জমি আবার একসঙ্গে নাই, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে ছড়ান অবস্থায় আছে।

ক্ষেতগুলি ছোট হইবার প্রধান কারণ পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার প্রবর্ত্তনের ফলে একান্নবর্ত্তী পরিবারপ্রথা উঠিয়া যাওয়া। গত অর্দ্ধ-শতাব্দীতে এই দেশে জনসংখ্যা খুব বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ইহাদের বেশীর ভাগ লোকই ভরণপোষণের জন্য জমির উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হয়। কুটিরশিল্পের অবস্থা ক্রমেই খারাপ হওয়ায় এই দেশের গ্রামবাসিগণের চাষ করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। পাশ্চাত্ত্যের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সংঘাতে একান্নবর্ত্তী পরিবার এবং যৌথ কৃষিকার্য্যপ্রথা ধীরে ধীরে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে।

এখন প্রত্যেক উত্তরাধিকারী পৈতৃক সম্পত্তি ভাগ করিয়া পৃথক চাষ করে। ফলে, জমি ক্ষুদ্র অংশে ভাগ হইয়া যাইতেছে। প্রত্যেক উত্তরাধিকারী পৈতৃক সকল জমির সমান অংশ দাবী করে বলিয়া ক্ষেত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতেছে।

ফলে, অনেক ক্ষতি হইতেছে। জোতের আয়তন এক সময় এইরূপ কম থাকে যে, লাঙ্গল দিবার জন্য একবারও হালের বলদ ঘোরান সম্ভব হয় না। প্রত্যেকের ক্ষেতের চারিদিকে বেড়া দেওয়া সম্ভব হয় না। সুতরাং অনেক সময় বাহির হইতে গরু আসিয়া জমির ফসল নষ্ট করিয়া দেয়। এই ক্ষুদ্র ক্ষেতের আশে-পাশে অনেক জায়গা আল দেওয়ার জন্য নষ্ট হয়। ছোট জমিতে ট্রাকৃটর প্রভৃতি যন্ত্রদ্বারা চাষ করা যায় না; জলসেচের জন্য ইন্দারা খনন করিবার খরচ পোষায় না। জমির চারিদিকে আল এবং হাঁটাপথ লইয়া চাষীদিগের মধ্যে অনেকসময় অযথা ঝগড়াঝাঁটি এবং মামলা-মোকদ্দমা হয়।

এই অবস্থার উন্নতি করিবার জন্য সরকার দুইটি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে। পাঞ্জাবে সমবায়ভিত্তিতে এই সকল ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত জমির একত্রীকরণের চেষ্টা হইয়াছে। এই উপায়ে ১৯৩৭ সালের শেষভাগ পর্য্যন্ত ৭ লক্ষ একরের বেশী পরিমাণ জমির একত্রীকরণ হইয়াছে। ইহার ফলও খুব ভাল হইয়াছে। কিন্তু এই উপায়ে দেশের সকল ক্ষেত বৃহদায়তন করিতে হইলে অনেক সময় প্রয়োজন। এত সময় আমাদের নাই। মধ্যপ্রদেশে একটি জোত-একত্রীকরণের আইন প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। কোন গ্রামের মালিক ও চাষীদিগের অধিকাংশ যদি মত দেয়, তবে অন্যদের অমত সত্ত্বেও সরকার গ্রামের বিখণ্ডিত ক্ষেত্রগুলি বৃহদায়তন করিবার আদেশ দিতে পারে এবং তখন সেই আদেশ অনুসারে কাজ করা হইবে। বোম্বাইতেও এরূপ একটি আইন প্রণয়ন করা হইয়াছে। কিন্তু এরূপ স্বেচ্ছাকৃত প্রচেষ্টার ভিত্তিতে বিখণ্ডিত জমির একত্রীকরণ-প্রচেষ্টা মোটেই সার্থক হয় নাই। বাধ্যতামূলক

আইনের প্রবর্ত্তন করিয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত জমির একত্রীকরণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। পরিবার প্রতিপালনের মত চাষের উপযোগী জমি প্রত্যেক কৃষকের অধীনে একসঙ্গে যাহাতে থাকে তাহার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে হইবে।

১৫. *What are the causes of agricultural indebtedness in India? Suggest some remedies.* (C. U. 1929, 1932, 1935; U. P. 1938)

উঃ। চাষীদিগের চিরস্থায়ী ঋণের বোঝার কথা সর্ব্বজনবিদিত। এই কৃষি-ঋণের পরিমাণ ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। ১৮৫৫ সালে মিঃ নিকলসন মোট কৃষিঋণের পরিমাণ ৪ কোটি টাকা বলিয়াছেন। ১৯১৯ সালে স্যার এডওয়ার্ড ম্যাকলাগানের হিসাবে মোট ঋণের পরিমাণ ৩০০ কোটি টাকা হইয়াছিল। ব্যাঙ্কিং অনুসন্ধান কমিটির মতে মোট ঋণের পরিমাণ ১৯৩০ সালে প্রায় ৯০০ কোটি টাকায় দাঁড়াইয়াছিল। অবিভক্ত বাংলার মোট কৃষিঋণের পরিমাণ ছিল ১০০ কোটি টাকা। ঋণের পরিমাণ যে কেবলমাত্র বেশী তাহা নহে, ইহার অধিকাংশ গ্রহণ করা হইয়াছে অনুৎপাদক উদ্দেশ্যে। ফলে, ঋণের বোঝাও দিনের পর দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। ভারতের কৃষক একবার ঋণগ্রস্ত হইলে আর তাহার নিস্তার নাই। বংশানুক্রমে তাহাকে ঋণের বোঝা বহিয়া যাইতে হয়।

চাষীগণের এত ঋণ হয় কেন? চাষীগণ খুব গরীব ও সঞ্চিত অর্থ বলিতে তাহাদের কিছু নাই। তাহাদের আয় দ্বারা সংসার চালান খুব দুষ্কর। আবার এই যৎসামান্য আয়ও নিশ্চিত নহে।

(ক) প্রায়ই ঠিকমত বর্ষা হয় না বলিয়া ফসল ভাল হয় না। তখন ধার না করিয়া আর তাহাদের কোন উপায় থাকে না।

(খ) গো-মড়ক হইয়া হালের বলদ মরিয়া গেলে আবার বলদ কিনিতে হইলে চাষীদিগের ঋণ করিতে হয়।

(গ) আয় যতই হউক তদ্দ্বারা চাষীর খরচ চলে না। তাহার উপর জমিদারকে খাজনা দিতে হয়, সুতরাং ঋণ করিতে হয়।

(ঘ) চাষের কাজে কৃষক বৎসরের পাঁচ হইতে সাত মাস কাল ব্যাপৃত থাকে। কুটিরশিল্পগুলি নষ্ট হওয়ায় অবশিষ্টকাল চাষীকে বসিয়া থাকিতে হয়। ফলে, এই সময়ে টাকা ধার না করিয়া তাহার অন্য উপায় থাকে না।

(ঙ) জমির ক্ষুদ্রায়তন এবং বিখণ্ডনও চাষীদিগের ঋণগ্রস্ত হওয়ার অন্যতম কারণ। জমি ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হওয়ার ফলে উৎপাদন কম হয়। কম উৎপাদনের জন্য আয় কম হয় এবং ঋণগ্রহণ করা ব্যতীত চাষীদের অন্য কোন উপায় থাকে না।

(চ) চাষীদিগের স্বভাবের জন্যও তাহাদের ঋণে ডুবিতে হয়। অদৃষ্টবাদী বলিয়া তাহাদের সঞ্চয়প্রবৃত্তি কম। হাতে কোন সময়ে টাকা আসিলে তাহারা মামলা-মোকদ্দমায় তাহা নষ্ট করিতে ভালবাসে ঃ বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি উৎসব উপলক্ষে ঋণ করিয়া খরচ করিতে দ্বিধা করে না।

(ছ) গ্রাম্য মহাজনদিগের নিকট হইতে সহজলভ্য ঋণ গ্রহণ করিতে অবিবেচক কৃষকদিগের দ্বিধা নাই। অনেক সময় তাহারা ধারে জমি ক্রয় করে। মহাজনদিগের চড়া সুদের হার তাহাদের ঋণের বোঝা বাড়াইয়া দেয়।

এই অবস্থা **সংশোধনের উপায়** তিন প্রকার :—প্রথমতঃ, কৃষির উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করা দরকার। তাহা হইলে চাষীদিগের আয় বাড়িয়া যাইবে ও তাহারা পূর্ব্বের ঋণ শোধ করিয়া দিতে পারিবে এবং নূতন করিয়া ঋণ করিবার প্রয়োজন থাকিবে না। কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার উপায় হইল :—

অধিকতর সেচকার্য্য, সাধারণ এবং কৃষিবিদ্যাবিস্তার, কৃষিবিষয়ে গবেষণা, জোতের একত্রীকরণ, উন্নতধরণের বীজ, সার এবং যন্ত্রপাতি প্রভৃতির প্রবর্ত্তন,

সমবায়-বিক্রয়-সমিতির সংগঠন প্রভৃতি ব্যবস্থা করা। এই সকল বিষয়ের আলোচনা পূর্ব্ব প্রশ্নে করা হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, অল্পসুদে ধার দেওয়ার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে গ্রামে গ্রামে সমবায়-কৃষিঋণদান-সমিতি প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। এই সকল সমিতি অল্প-সুদে টাকা ধার দেয়।

তৃতীয়তঃ, পূর্ব্ব ঋণ পরিশোধ করিবার বন্দোবস্ত করা দরকার। প্রতি গ্রামে ঋণসালিশী বোর্ড গঠন করা হইয়াছে। বোর্ড দেনাদারদিগের ঋণ-পরিশোধের ক্ষমতা লক্ষ্য রাখিয়া পাওনাদারদিগের সঙ্গে মীমাংসার জন্য চেষ্টা করিবে। উচ্চহারে সুদ লওয়া নিষিদ্ধ করা হইয়াছে।

Q. 5. *Describe measures that have been adopted in India to check the indebtedness of the agriculturist.* (C. U. 1937, 1942)

উঃ। চাষীগণ যাহাতে ঋণ শোধ করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে সরকার নিম্নলিখিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে :—

(ক) চাষীদিগের যাহাতে সঞ্চয়ের অভ্যাস বাড়ে, সেইজন্য সরকার প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা করিতেছে।

(খ) বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করিয়া সরকার অধিক পরিমাণে সুদ লওয়া বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছে। ১৯১৮ সালের অতিরিক্ত সুদ আইনের বলে আদালত চড়াসুদ গ্রহণ বন্ধ করিয়া দিতে পারে। মহাজনী আইন (Money-Lender's Act) প্রণয়ন করিয়া সরকার সর্ব্বোচ্চ সুদের হার নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে এবং মহাজনদিগের দুর্নীতি বন্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছে। বর্ত্তমানকালেও মহাজন কৃষকদিগের সহিত যাহাতে প্রতারণা করিতে না পারে সেইজন্য এই আইনে তাহাদের মহাজনী কারবারের হিসাব রাখা বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে।

(গ) ১৯০১ সালের **পাঞ্জাব জমিহস্তান্তরমূলক আইন** (Punjab Land Alienation Act) পাস করিয়া চাষী ব্যতীত অন্যের নিকট জমি বিক্রয় নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। মহাজনগণ যাহাতে কৃষকগণের জমি কিনিয়া না লইতে পারে, তাহার জন্য এই আইন প্রণয়ন করা হইয়াছে।

(ঘ) **ঋণদান** :—সরকার কৃষিঋণ দিবার বন্দোবস্ত করিয়াছে। সরকার কৃষিঋণ আইন (Agricultural Loans Act) প্রণয়ন করিয়া কৃষকদিগের অভাব এবং দুঃখকষ্টের সময় এবং জমির উন্নতিবিধায়ক ঋণ আইন (Land Improvement Loans Act) পাস করিয়া জমির উন্নতিকল্পে চাষীদের ঋণ দিবার বন্দোবস্ত করিয়াছে। কিন্তু এই ধরণের সরকারী ঋণ (যাহাকে **তাকাবি ঋণ** বলে) মোটেই জনপ্রিয় হয় নাই।

(ঙ) **সমবায় আন্দোলন** :—১৯০৪ সাল হইতে সমবায় আন্দোলন প্রবর্ত্তন করিয়া অল্পসুদে টাকা ধার দিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। **জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক** (Land Mortgage Bank) স্থাপন করা হইয়াছে। চাষীরা এই ব্যাঙ্ক হইতে তাহাদের জমি বন্ধক রাখিয়া দীর্ঘমেয়াদী ঋণ পাইতে পারে।

(চ) **ঋণসালিশী বোর্ড** :—কিছুদিন পূর্ব্বে বাংলাদেশে এবং অপর কয়েকটি প্রদেশে **ঋণসালিশী বোর্ড** (Debt Conciliation Boards) স্থাপন করা হইয়াছিল। চাষীরা যত টাকা দিতে পারে সেইদিকে লক্ষ্য রাখিয়া বোর্ড পাওনাদারদিগের সঙ্গে আপোষ মীমাংসা করিয়া দেনার পরিমাণ অনেক কমাইয়াছিল।

Q. 6. *What are the different forms of irrigation works in India? Discuss their economic importance.* (C. U. 1936, 1938, '43 ; U. P. 1942)

উঃ। ভারতবর্ষে তিনপ্রকার জলসেচের ব্যবস্থা আছে :—

(১) **ইন্দারা** :—চাষীদের নিজ খরচে ও চেষ্টায় অধিকাংশ ইন্দারা

খনন করা হইয়াছে। তবে চাষীদের সাহায্য করিবার জন্য সরকার হইতে ঋণ দেওয়া হইয়াছে। যে সকল অঞ্চলে জলসেচের ব্যবস্থা আছে তাহার প্রায় তিন ভাগের একভাগ জমিতে এইভাবে জল দেওয়া হয়। উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, মাদ্রাজ এবং বিহারে ইন্দারার সাহায্যে সেচকার্য্য করা হয়। উত্তরপ্রদেশে বিদ্যুৎ শক্তি-পরিচালিত নলকূপের দ্বারা সেচকার্য্যের প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। খালের সাহায্যে সেচকার্য্য অপেক্ষা এই ধরণের সেচকার্য্য অনেক বেশী কার্য্যকরী হইয়াছে। তাহার কারণ ইন্দারা হইতে কষ্ট করিয়া জল তুলিতে হয় বলিযা চাষীরা একটু হিসাব করিয়া সেই জলের ব্যবহার করে।

(২) **পুষ্করিণী** ঃ—পুষ্করিণী খনন করিয়া তাহার জল জমিতে দেওযার ব্যবস্থা আমাদের দেশে বহুদিন হইতে প্রচলিত আছে। প্রায় প্রত্যেক রাজ্যেই এই ব্যবস্থা আছে। ভারতে প্রায় ৪০,০০০ পুষ্করিণী আছে এবং তাহার জলে ২০ হইতে ৩০ লক্ষ একর জমিতে জল দেওয়া হয়।

(৩) **খাল** ঃ—খাল কাটিযা জলসেচের ব্যবস্থাও এই দেশে বহুদিন হইতে আছে। সরকারও খাল কাটার কাজে বহু অর্থ ব্যয় করিযাছে। খালগুলি আবার তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়: প্লাবনখাল (Inundation canals), সম্বৎসরব্যাপী জলপূর্ণ খাল (Perennial canals) এবং জলসঞ্চিত খাল (Storage canals)।

(ক) **প্লাবন খাল** ঃ—এইগুলি এমনভাবে খোঁড়া হয় যে কেবলমাত্র নদীতে বান আসিলে পর এই খালে জল আসে। ফলে বর্ষাকালেই এই ধরণের খালে জল থাকে।

(খ) **সম্বৎসরব্যাপী জলপূর্ণ খাল** ঃ—এইগুলি এরূপভাবে কাটা হয় যে, ইহাতে সারা বৎসর জল থাকে। উত্তরপ্রদেশের সরদা-খাল প্রভৃতি এই ধরণের।

(গ) উপত্যকা-অঞ্চলে বাঁধ দিয়া বর্ষার জল ধরিয়া রাখা হয়। এই সঞ্চিত জলকে অতঃপর খালের ভিতর দিয়া জমিতে লওয়া হয়।

রাজস্ব-আদায়ের দিক হইতে খালের নিম্নলিখিত শ্রেণী বিভাগ করা হইয়াছে :—যেমন উৎপাদনশীল খাল, সংরক্ষক খাল, এবং অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র কার্য্যের জন্য কাটা খাল। যে সকল খাল অন্ততঃ ১০ বৎসরের মধ্যে লাভজনক হয় তাহাদের বলা হয় উৎপাদনশীল (Productive) খাল। সংরক্ষণ খাল কাটা হয় দুর্ভিক্ষ নিবারণের উদ্দেশ্যে। এই সমস্ত খাল হইতে বেশী আয় আশা করা হয় না। এতদ্ব্যতীত অনেক ছোট ছোট খাল (Minor works) আছে।

অবিভক্ত পাঞ্জাবে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক খাল কাটা হইয়াছিল। ইহার মধ্যে শতদ্রু উপত্যকা-অঞ্চলের উচ্চ দোয়াব-খাল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ইহার পর খালের সংখ্যা বেশী আছে মাদ্রাজে, তাহার পর মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চলে।

সেচকার্য্যের প্রয়োজনীয়তা ঃ—ভারতের কৃষিসমস্যা প্রধানতঃ জলসরবরাহের সমস্যা। ভারতবর্ষের মত কৃষিপ্রধান দেশে সেচকার্য্য অবশ্য প্রয়োজনীয়।

(ক) ভারতের মাটি শুষ্ক। জমিতে উপযুক্ত জল না দিলে এখানকার মাটিতে ভাল ফসল জন্মান অসম্ভব। বর্ষার জল পাওয়ার আশা অনিশ্চিত। সুতরাং জলসেচের ব্যবস্থা করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

(খ) রাজস্থান প্রভৃতি অঞ্চলে নামেমাত্র বৃষ্টিপাত হয়। সেখানে কেবলমাত্র সেচকার্য্যের সহায়তায় জমিকে চাষোপযোগী করা চলে। বস্তুতঃ, খালের সহায়তায় পাঞ্জাবের একটা বৃহৎ অংশ মরুভূমি হইতে শস্যশ্যামলা অঞ্চলে পরিণত হইয়াছে।

(গ) ইক্ষু প্রভৃতি কয়েক প্রকারের ফসলের জন্য প্রচুর পরিমাণে জল সরবরাহের প্রয়োজন হয়।

(ঘ) জলসেচের ব্যবস্থা হইতে অনেক লাভ হইয়াছে। প্রথমতঃ, ইহার ফলে জমির উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ ও জমির মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। খালগুলি হইতে সরকারও রাজস্ব লাভ করে। দ্বিতীয়তঃ, সেচকার্য্যের ফলে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ হ্রাস পাইযাছে। তৃতীয়তঃ, চাষীদের আর অনিশ্চিত বর্ষার উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হয় না। সুতরাং কৃষকদিগের আয় এবং জীবনধারণের মান ও বাড়িয়াছে।

Q. 7. *Write short notes on the River-Valley Projects in India.* (C. U. 1958).

উঃ। গত দশ বার বৎসর হইল ভারত সরকার বিভিন্ন অঞ্চলে সেচ-ব্যবস্থার উন্নতি, বন্যানিয়ন্ত্রণ ও জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য কতকগুলি বড় স্কীম কার্য্যে পরিণত করিতেছেন। এই স্কীমগুলি অনুযায়ী বড় নদীতে বাঁধ দেওয়া হইযাছে। এই বাঁধগুলিতে জল ধরিযা রাখিয়া বন্যানিয়ন্ত্রণের সুবিধা করা হয়। বাঁধের জল খাল কাটিয়া দূরাঞ্চলের জমিতে জলসেচের জন্য দেওয়া হইতেছে ও বাঁধের জলের স্রোত হইতে জলবিদ্যুৎ প্রস্তুত করা হইতেছে। এইজন্য এইগুলিকে রিভার-ভ্যালী প্রোজেক্ট (বা নদী-উপত্যকা বাঁধের স্কীম) অথবা মাল্‌টিপারপাস্ প্রোজেক্ট (বা বহুমুখী প্রোজেক্ট) নাম দেওয়া হইয়াছে। নিম্নে প্রধান প্রধান প্রোজেক্টের বর্ণনা দেওয়া হইল।

দামোদর উপত্যকা প্রজেক্ট (D. V. C.):—এই প্রোজেক্টের উদ্দেশ্য দামোদর নদীতে বিভিন্ন স্থানে বাঁধ দিয়া জলের গতি নিয়ন্ত্রণ করা। বাংলাদেশে বহুবার দামোদর নদীতে বন্যা হইয়া দেশের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে। ডি. ভি. সি.র স্কীম অনুযায়ী নানাস্থানে নদীতে বাঁধ দেওয়া হইয়াছে। আশা করা যায় যে, এই বাঁধগুলি বন্যানিয়ন্ত্রণের কার্য্যে সাহায্য করিবে। বহু খালও কাটা হইয়াছে এবং ইহার ফলে পশ্চিমবঙ্গের অনাবৃষ্টি ও কমবৃষ্টির অঞ্চলের ক্ষেতে জল দেওয়া যাইবে। ইহা ছাড়া, প্রচুর পরিমাণে বিদ্যুৎও উৎপাদন করা হইতেছে। দামোদর ভ্যালী স্কীমের কাজ শেষ হইয়া আসিয়াছে।

মাইথন, তিলাইয়া, বোকারো প্রভৃতি অঞ্চলে দামোদর নদীতে বাঁধ দেওয়া হইয়াছে ও রাণীগঞ্জে বিরাট ব্যারেজ করা হইয়াছে। এই স্কীমের ফলে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের কৃষি ও শিল্পের প্রভূত উন্নতি হইবে আশা করা যায়। বাংলাদেশে **ময়ূরাক্ষীর বাঁধও** প্রসিদ্ধ। ইহার কাজও শেষ হইয়া গিয়াছে।

উড়িষ্যার মহানদীতে **হীরাকুন্দ বাঁধ** প্রোজেক্টও উল্লেখযোগ্য। মহানদীও দামোদরের মত বন্যার জন্য বিখ্যাত। এই মহানদীর বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য নানাস্থানে বাঁধ দেওয়া হইতেছে এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই স্কীমের ফলে উড়িষ্যার প্রায় দশলক্ষ একর অঞ্চলে সেচের সুবন্দোবস্ত হইবে।

পাঞ্জাবের **ভাকরানাঙ্গাল প্রোজেক্ট,** বিহারের **কোশীড্যাম প্রোজেক্ট** ও মাদ্রাজের **তুঙ্গভদ্রা প্রোজেক্ট**ও উল্লেখযোগ্য।

তৃতীয় অধ্যায়

সমবায়

Q. 1. *Describe the main features of co-operative movement in India.* (C.U. 1939)

উঃ। ভারতবর্ষে সমবায়-আন্দোলন-প্রতিষ্ঠার প্রারম্ভে গ্রামে গ্রামে সমবায়-ঋণদান-সমিতি প্রতিষ্ঠার দিকেই মনোযোগ দেওয়া হইয়াছিল। ১৯১২ সালের সমবায়-সমিতি আইনে ঋণদান-সমিতি ব্যতীত অন্য সমিতিও স্থাপন করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল। দেশে বর্তমানে নিম্নলিখিত সমিতি আছে: সমবায়-সমিতির মধ্যে সমবায়-কৃষি-সমিতির (ঋণদান সমিতির এবং ঋণদান ব্যতীত অন্যান্য সমিতি উভয় প্রকারের) সংখ্যা অনেক বেশী।

দ্বিতীয়তঃ, কেবলমাত্র কৃষকশ্রেণী ব্যতীত অন্য শ্রেণীর জন্যও নানাপ্রকার সমবায় সমিতি আছে। সমিতিগুলিকে অর্থ সাহায্য দিবার জন্য কেন্দ্রীয় সমবায়-ব্যাঙ্কসমূহ এবং প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক স্থাপন করা হইয়াছে।

(ক) পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, মোট সমিতির অধিকাংশই কৃষি-সমিতি। এই দেশে এইরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। ভারত কৃষিপ্রধান দেশ এবং সমবায়-আন্দোলনের উদ্দেশ্য হইল দরিদ্র ব্যক্তিগণকে সাহায্য করা।

(খ) ভারতীয় সমবায়-আন্দোলনের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল এই যে, ইহাদের মধ্যে শতকরা ৮৫ ভাগই ঋণদান-সমিতি। আন্দোলনের প্রারম্ভে ১৯০৪ সালের আইনে কেবলমাত্র ঋণদান-সমিতি গঠন করিবার ব্যবস্থা ছিল। পরবর্ত্তী কালে অবশ্য নূতন আইন প্রবর্ত্তন করিয়া অন্য সমিতি স্থাপন করিবার অনুমতি দেওয়া হয়। কিন্তু ঋণদান-সমিতি স্থাপনের দিকে সরকারের যত চেষ্টা ছিল অন্য সমিতি গঠন করিবার জন্য তত লক্ষ্য ছিল না।

(গ) সমবায়-আন্দোলনের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হইল এই যে, এখানকার সমবায়-আন্দোলন সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় গঠিত হইয়াছে, জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত্ত চাহিদার ফলে নয়। সমবায়-আন্দোলনের আদিম জন্মস্থান জার্ম্মানীতে এই আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল প্রধানতঃ বে-সরকারী প্রচেষ্টায়, কিন্তু ভারতবর্ষে সমবায়-আন্দোলনের প্রবর্ত্তন হইয়াছে সরকারী প্রচেষ্টার দ্বারা।

যে কোন ১০ জন সভ্য একত্র হইয়া একটি প্রাথমিক ঋণদান-সমিতি স্থাপন করিতে পারে। সভ্যদিগের দায়িত্ব অসীম থাকে। সমিতির পরিচালনকার্য্য মোটামুটিভাবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই হয়। এই ধরণের সমিতি ছাড়াও সমবায়-বিক্রয়-সমিতি ও ক্রয়-সমিতি প্রভৃতি আছে। চাষীদের এবং কারিগরদিগের উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয় করিতে সাহায্য করা এই সমিতির উদ্দেশ্য। এতদ্ব্যতীত সমবায়-জলসেচ-সমিতি, ভাল দুধ সরবরাহের জন্য দুগ্ধ সরবরাহ-সমিতি, এবং দ্বিখণ্ডিত জমির একত্রীকরণের

উদ্দেশ্যে সমবায়-একত্রীকরণ-সমিতির প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। এইদিকে উন্নতির ধারা অবশ্য খুব মন্থর গতিতে অগ্রসর হইয়াছে। এই সকল সমিতির প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহের উদ্দেশ্যে প্রদেশের প্রায় সকল জিলাতে কেন্দ্রীয় সমবায়-ব্যাঙ্ক স্থাপন করা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রধান কাজ হইল প্রাথমিক সমিতিগুলিতে প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহ করা। প্রায় প্রতি রাজ্যে রাষ্ট্রীয় সমবায়-ব্যাঙ্ক স্থাপন করা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কসমূহের কার্য্যাবলীর সমন্বয়-সাধন এবং তাহাদের প্রযোজনীয় অর্থ সরবরাহ করা এই ব্যাঙ্কের কাজ। এই সকল সমবায়-সমিতির ঊর্দ্ধে সমবায়-সমিতিগুলির নিযামক বা রেজিস্ট্রার আছেন। তিনি একজন উচ্চ সরকারী কর্ম্মচারী এবং এই আন্দোলনের পরিচালন এবং পরিদর্শন করেন।

Q. 2. *Explain fully the organization of rural co-operative credit society.* (C. U. 1921, 1931, 1941)

Describe the functions of co-operative banks in India. (C. U. 1958)

উঃ। কোন্ গ্রামের অথবা কয়েকটি গ্রামের দশ বা ততোধিক প্রাপ্তবয়স্ক অধিবাসী মিলিয়া সমবায়-ঋণদান-সমিতি স্থাপন করে। সাধারণতঃ এই সকল সমিতির সভ্যদিগের দায়িত্ব সীমাহীন করা হয়। অর্থাৎ সমিতির প্রত্যেক সদস্য সমিতির ঋণ-পরিশোধের নিমিত্ত দায়ী থাকিবে এবং তাহার সকল সম্পত্তি এইজন্য বিক্রয় হইয়া যাইতে পারে।

সমিতির মূলধন নিম্নলিখিত উপায়ে সংগ্রহ করা হয়। সভ্যদিগের প্রবেশ-মূল্য, শেয়ার-বিক্রয়ের মূলধন, সমিতি কর্ত্তৃক গৃহীত আমানত এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হইতে প্রাপ্ত ঋণ। সমিতির কার্য্যপরিচালনার ভার দুইটি কমিটির হস্তে অর্পণ করা হয়। সভ্যদিগকে লইয়া গঠিত সাধারণ কমিটি এবং তাহাদের মধ্য হইতে নির্ব্বাচিত পরিচালক-কমিটি। পরিচালক-কমিটি সমিতির দৈনন্দিন কাজ চালায়। সমিতি কেবলমাত্র সভ্যদিগকে ঋণ দিতে পারে এবং প্রত্যেক

সভ্যকে প্রদত্ত ঋণের জন্য অপর সভ্য দায়ী থাকে। কোন বাজে খরচের জন্য টাকা ধার দেওয়া হয় না। কেবলমাত্র সেই উদ্দেশ্যের জন্য টাকা দেওয়া হয় যাহার ফলে সভ্যদিগের আয় বৃদ্ধি পাইবে।

প্রত্যেক সভ্য তাহার সুবিধামত কিস্তিতে কিস্তিতে ঋণ শোধ করে। সমিতির মোট মুনাফার এক-চতুর্থাংশ সংরক্ষিত তহবিলে রাখিয়া অবশিষ্ট হইতে অংশীদারদিগের লভ্যাংশ দেওয়া হয়। প্রত্যেক সমিতির বাৎসরিক হিসাবপত্র রেজিস্ট্রার কর্ত্তৃক নিযুক্ত কর্ম্মচারীদের দ্বারা পরীক্ষিত হয়। সমিতিগুলিকে কতকগুলি বিষয়ে সরকার সুবিধা দেয়। যেমন আয়কর, ষ্ট্যাম্পকর প্রভৃতি কর হইতে সমবায়-সমিতিকে রেহাই দেওয়া হইয়াছে।

Q. 3. *Discuss how co-operation can help the agriculturists.* (C. U. 1945)

Discuss the part played by the co-operative movement in removing the difficulties of Indian agriculture. (C. U. 1959)

উঃ। সমবায় আন্দোলন নানাপ্রকারে চাষীদের কাজে লাগিতে পারে :—

(১) চাষীদিগের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন টাকার। পূর্ব্ব ঋণ শোধ এবং চাষের খরচ সংগ্রহ করিবার জন্য তাহাদের কমসুদে ঋণ পাওয়া প্রয়োজন। **সমবায়-ঋণদান-সমিতি** প্রতিষ্ঠা করিয়া অল্পসুদে চাষীদিগকে যথেষ্ট পরিমাণে প্রয়োজনীয় অর্থের সরবরাহ করা সম্ভব হয়।

(২) চাষীদিগের আর একটি প্রয়োজন চাষের জন্য উপযুক্ত পরিমাণে জলের সরবরাহ। **সমবায়-সেচপ্রণালী-সমিতির** দ্বারা জমিতে উন্নত প্রকারের সেচপ্রণালী প্রবর্ত্তন করা সম্ভব।

(৩) **সমবায়-ক্রয়-সমিতি** স্থাপন করিয়া চাষীদের প্রয়োজনীয় বীজ-ধান, সার এবং চাষের জন্য উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি অপেক্ষাকৃত অল্পদামে

কিনিবার ব্যবস্থা করা যায়। সমিতি এই সকল জিনিষ পাইকারী দামে কিনিয়া সভ্যদিগের মধ্যে ভাগ করিয়া দিবে এবং সভ্যগণ কিস্তিতে কিস্তিতে অল্প করিয়া টাকা শোধ করিবে।

(৪) **সমবায়-বিক্রয়-সমিতি** স্থাপন করিয়া ফসল বিক্রয়ের ভাল বন্দোবস্ত করিতে পারিলে চাষীদিগের উপকার হইবে। তাহারা দালাল ও ফড়িযার অত্যাচার হইতে বাঁচিবে এবং ফসল বিক্রয় করিয়া ন্যায্য মূল্য পাইবে।

(৫) **সমবায়-গো-বীমা-সমিতির** মারফত—চাষীদের গরু ও বলদ মরিয়া গেলে—আবার নূতন গরু ও বলদ কিনিতে পারিবে।

(৬) **সমবায়-একত্রীকরণ-সমিতি** স্থাপন করিয়া জমির আয়তন বৃদ্ধি এবং বিখণ্ডীকরণ রোধ করা সম্ভব হইবে।

বস্তুতঃ, কেবলমাত্র সমবায়-আন্দোলনের দ্বারা চাষের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি করা যায় এবং চাষীগণ উন্নত প্রকারের চাষ, ব্যবসায় এবং জীবন-যাপন করিতে সমর্থ হয়।

Q. 4. *Write short notes on (a) Service co-operatives and (b) Co-operative farming.*

উঃ। (ক) *Service co-operatives* : বিভিন্ন প্রকারের সমবায-সমিতি গঠন করিযা চাষী বা অন্য গরীব লোকদের টাকা ধার দেওয়ার ব্যবস্থা করা যায, চাষীদের চাষের সময় ভাল বীজ, সার, হাল ও অন্য যন্ত্র, বলদ প্রভৃতি কিনিতে সাহায্য করা বা এই সব জিনিষ কিনিযা তাহাদের মধ্যে বিলি করা যায, ফসল উঠিলে তাহা ঠিকমত দামে বা বাজারে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা যায়। এই ধরণের কাজ যে সমবায-সমিতি করে ইহাকে সার্ভিস কো-অপারেটিভ নাম দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ এই ধরণের সমবায়-সমিতির মূল উদ্দেশ্য চাষী বা অন্যান্য ব্যক্তিদের কাজে নানাভাবে সাহায্য করা যাহাতে তাহাদের আয়

বাড়ে ও জীবনধারণের মান উন্নত হয়। নাগপুর কংগ্রেসে এই শ্রেণীর সমবায়-সমিতির ব্যাপক প্রসার করিবার প্রস্তাব গ্রহণ করা হইয়াছে।

(খ) *Co-operative farming*: আমাদের দেশে চাষের ক্ষেতের আয়তন খুবই ছোট, অসংখ্য চাষী অতি ক্ষুদ্রকায় ক্ষেতে চাষ করে বলিয়া ফসলের পরিমাণ কম হয়। উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব হয় না। অথচ ক্ষেতের আয়তন বাড়াইতে হইলে বহু চাষীকে জমি বা চাষের কাজ হইতে সরাইয়া নিয়া যাইতে হইবে। ইহা সম্ভব নহে ও বাঞ্ছনীয় নহে। এইজন্য প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, এক বা একাধিক গ্রামের চাষীদের নিয়া একটি সমবায়-ক্ষেত-সমিতি গঠন করিতে হইবে। চাষীরা এই সমিতির সভ্য থাকিবে ও একটি কার্য্যকরী সমিতি নির্ব্বাচন করিবে। এই সমিতি গ্রামের বা সভ্যদের সকলের জমি একসঙ্গে চাষ করিবার ব্যবস্থা করিবে। চাষীরা সকলেই সমিতির নির্দ্দেশমত জমি চাষ করিবে। ফসল কাটার পর ফসল দুই ভাগে ভাগ করা হইবে। একভাগ যে যতদিন ক্ষেতে কাজ করিয়াছে তাহার হিসাব করিয়া সভ্যদের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে। ইহা পরিশ্রমের মজুরী হিসাবে পাওয়া যাইবে। আর এক অংশ যার যত জমি আছে ইহার হিসাব করিয়া ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে। ধরা যাক, গ্রামে মোট ১০০ বিঘা জমি চাষ হয় ও তাহা হইতে এক হাজার মণ ধান পাওয়া গেল। ইহার মধ্যে ৫০০ মণ ধান মজুরী হিসাবে চাষীদের মধ্যে কাজের ফর্দ্দ অনুযায়ী ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে। বাকী ৫০০ মণ, জমির হিসাবে দেওয়া হইবে। অর্থাৎ বিঘা প্রতি পাঁচ মণ পড়িল। যাহার চার বিঘা জমি আছে সে ২০ মণ ধান পাইবে।

সমবায়-ক্ষেত-সমিতি গঠন করা হইলে একদিকে যেমন ক্ষেতের আয়তন বাড়িবে আবার অন্যদিকে কোন চাষীকেই জমি হইতে বিতাড়িত হইতে হইবে না। ইহা মস্ত সুবিধা। তবে এই সমিতি গঠন সময়সাপেক্ষ এবং গ্রামে দলাদলি থাকিলে ঠিকমত কাজ চালান শক্ত হইয়া পড়ে।

Q. 5. *Discuss the benefits and shortcomings of the co-operative movement in India.*

Or, Indicate the various lines in which the co-operative system in India has benefited the country. (C. U. 1932)

উঃ। সমবায়-আন্দোলনে দেশের অনেক উপকার হইয়াছে। নিম্নলিখিত **অর্থনৈতিক সুবিধা** হইয়াছে :—

(১) অর্থনৈতিক দিক হইতে বিচার করিলে দেখা যায় যে, সমবায়-সমিতি-প্রতিষ্ঠার ফলে চাষীগণ কম সুদে টাকা ধার পাইতেছে। গ্রামাঞ্চলে সুদের হার কমিয়া গিয়াছে ; এই বাবদ দেশের কম টাকা বাঁচিয়া যাইতেছে না। সমবায়-ঋণদান-সমিতির প্রতিযোগিতার ফলে বহু গ্রামে মহাজনদিগের প্রতিপত্তি অনেক হ্রাস পাইয়াছে।

(২) সমবায়-আন্দোলনের প্রভাবে চাষীদিগের মধ্যে সঞ্চয়ের ইচ্ছা বৃদ্ধি পাইয়াছে। যাহারা সঞ্চিত অর্থ চোরের ভয়ে নানাভাবে লুকাইয়া রাখিত তাহারা সঞ্চিত অর্থ সমিতিতে জমা দিতেছে। সমিতি এই টাকা লোকের উপকারের জন্য নিয়োগ করিতেছে।

(৩) সমবায়-আন্দোলনের ফলে চাষীগণ নানাভাবে উপকৃত হইয়াছে। বিভিন্ন সমবায়-সমিতির মারফত তাহারা অল্পমূল্যে সার, চাষের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি প্রভৃতি পাইয়াছে ; ও উৎপন্ন ফসল ভাল দামে বিক্রয় করিতেছে। পাঞ্জাবের সমবায়-সমিতি চাষীর ক্ষুদ্রায়তন জমির একত্রীকরণে অনেক সাহায্য করিয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গে সমবায়-দুগ্ধসরবরাহ-সমিতি, ম্যালেরিয়া-নিবারণী-সমিতি, সরবরাহ এবং বিক্রয়-সমিতি, জলসেচ-সমিতি উত্তম কাজ করিতেছে।

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত **সুবিধাও** আছে :—

(৪) এই আন্দোলনের প্রভাবে গ্রামবাসীদিগের মিতব্যয়ের অভ্যাস হইতেছে। ভাল সমবায়-সমিতির সভ্যদিগের মধ্যে মামলা-মোকদ্দমা এবং

অপব্যয়ের বদ অভ্যাস খুব হ্রাস পাইয়াছে। বহুস্থানে মোকদ্দমা সালীশ-মীমাংসা করিয়া মিটাইয়া লওয়া হইতেছে। শ্রাদ্ধ ও বিবাহ উপলক্ষে অযথা অর্থব্যয় বন্ধ হইয়াছে। ভাল সমবায়-সমিতির প্রভাবে সভ্যদিগের মধ্যে অধ্যবসায়, আত্মবিশ্বাস প্রভৃতি গুণের বিকাশ হইতেছে।

(৫) ঋণপত্রে সই করা এবং হিসাব রাখার প্রয়োজনীয়তার জন্য চাষীদের মনে শিক্ষার ইচ্ছা জাগিয়া উঠিয়াছে এবং অনেক সমিতি শিক্ষা বিস্তারের জন্য অর্থ ব্যয় করিয়াছে।

(৬) ইহার ফলে অন্তত: গ্রাম্যজীবনের কিয়ৎপরিমাণ উন্নতি হইয়াছে। জনজাগরণের পথে সমবায়-সমিতি আন্দোলনের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে।

চাষীদিগের নিরক্ষরতার জন্য এই আন্দোলনের বেশী প্রসার হয় নাই। নিরক্ষতার জন্য সভ্যগণ সমবায়সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানলাভ করিতে পারে নাই।

এই দেশে সমবায়-সমিতি-আন্দোলনের **ক্রটি :—**

(১) বহুক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে, পরিচালন কমিটির সদস্যবৃন্দ স্বার্থ-প্রণোদিত হইয়া ঋণের অধিকাংশ নিজ-পকেটস্থ করে। ঋণ মঞ্জুরব্যাপারেও তাহারা পক্ষপাতিত্ব করিয়া নিজ দলের লোককেই মাত্র ধার দেয়।

(২) সদস্য যাহাতে সময়মত ঋণ শোধ করে সেই সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা অনেক সমিতিতে করা হয় নাই। সমিতিগুলির মোট ঋণের মধ্যে বেশী অংশই বাকী থাকিয়া গিয়াছে ও তাহাদের আর্থিক অবস্থার অবনতি হইয়াছে।

(৩) আন্দোলনের উপর অতিরিক্ত পরিমাণ সরকারী নিয়ন্ত্রণ রহিয়াছে।

(৪) আন্দোলনের আর একটি ক্রটি হইল, উপযুক্ত দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দিতে পারে এইরূপ প্রতিষ্ঠানের অভাব। মহাজনদিগের পূর্ব্বঋণ পরিশোধ এবং জমির দীর্ঘস্থায়ী উন্নতিবিধানকল্পে চাষীদিগের দীর্ঘমেয়াদী ঋণের দরকার হয়। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী ঋণ মঞ্জুর করিবার মত তহবিল সমবায়-ঋণদান-সমিতিগুলির নাই।

চতুর্থ অধ্যায়
ভূমি-রাজস্ব

Q. 1. *What are the different systems of land tenure prevalent in India?* (C. U. 1942, 1944, 1945, 1946)

উঃ। ভারতবর্ষে চারিটি বিভিন্ন প্রণালীতে জমি বিলি-বন্দোবস্ত করা হইত। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, মহলওয়ারী বন্দোবস্ত, মালগুজারী বন্দোবস্ত এবং রায়তী বন্দোবস্ত।

(১) **চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে** ভূমি-রাজস্ব চিরকালের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া থাকিত। সরকার জমিদারদিগকে জমির মালিক বলিয়া গণ্য করিত ও তাঁহাদের নিকট হইতে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ খাজনা আদায় করিত। কত খাজনা দিতে হইবে তাহার পরিমাণ ১৭৯৩ সালেই স্থির করা ছিল। জমিদার যদি নির্দ্দিষ্ট তারিখের মধ্যে ভূমি-রাজস্ব না দিত, তবে তাহার সম্পত্তি নিলামে বিক্রয় করা হইত। প্রজাদিগের স্বার্থসংরক্ষণের উদ্দেশ্যে প্রয়োজন হইলে নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা বহাল করিবার অধিকারও সরকারের ছিল। জমিদারগণ চাষীদিগের নিকট হইতে ইচ্ছামত খাজনা আদায় করিত। পূর্ব্ব এবং পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, কাশী এবং উত্তর মাদ্রাজে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ছিল। পশ্চিমবঙ্গে এই বন্দোবস্ত এতদিন বহাল ছিল; এখন তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

(২) **মহলওয়ারী বন্দোবস্তে** সম্পূর্ণ গ্রামটির উপর একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ খাজনা ঠিক করা হয়। গ্রামবাসিগণ যুক্তভাবে এবং প্রত্যেকে পৃথক্ ভাবে নিজ খাজনার জন্য দায়ী। সরকারী তহবিলে খাজনা জমা দিবার জন্য একজন গণ্যমান্য লোক নিযুক্ত হয়, এবং তিনি অংশীদারদিগের তরফ হইতে সরকারের সঙ্গে বন্দোবস্তপত্রে সই করেন। উত্তরপ্রদেশে ও পাঞ্জাবে এইরূপ বন্দোবস্তের প্রবর্ত্তন হইয়াছে।

(৩) **মালগুজারী বন্দোবস্তে** সরকার মালগুজারদিগকে গ্রামের জমির মালিক বলিয়া স্বীকার করিয়াছে, এবং সরকারী খাজনার জন্য তাহাদিগকে দায়ী করিয়াছে। কিন্তু রায়তী বন্দোবস্তে যেভাবে খাজনা ঠিক হয় এই ব্যবস্থায়ও সেই নিয়ম পালন করা হয়, অর্থাৎ কয়েক বৎসর পর সরকারী তহসিলদারগণ জমির গুণাগুণ বিচার করিয়া খাজনা ঠিক করে। মধ্যপ্রদেশে এইরূপ বন্দোবস্ত বহাল আছে।

রায়তী অথবা প্রজাস্বত্ব বন্দোবস্তে সরকার প্রত্যেক চাষীর সঙ্গে পৃথক্ ভাবে বন্দোবস্ত করে। রায়ত বা প্রজাদিগকে জমির প্রকৃত মালিক বলিয়া স্বীকার করা হয়। বোম্বাই, আসাম, বেরার এবং মাদ্রাজের অধিকাংশ অঞ্চলে এই বন্দোবস্ত প্রবর্ত্তিত আছে।

Q. 2. *Discuss the merits and defects of the permanent settlement of land revenue in Bengal.*

"The zemindari system is at the root of the poverty of the Bengal peasants." Do you agree with the statement? Give reasons for your answer. (C. U. 1934)

Do you support the abolition of the zemindari system? **(C. U. 1949.)**

উঃ। বৃটিশ-শাসনের গোড়ার দিকে ভূমি-রাজস্বের বন্দোবস্ত প্রথমতঃ এক বৎসরের জন্য এবং পরবর্ত্তী কালে পাঁচ বৎসরের জন্য করা হইয়াছিল। কিন্তু রাজস্ব-আদায়ের দিক হইতে এই বন্দোবস্তে সরকারের বিশেষ লাভ হইত না। সুতরাং লর্ড কর্ণওয়ালিশ ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্ত্তন করেন। এই বন্দোবস্তে সরকার জমিদারদিগকে জমির মালিক বলিয়া স্বীকার করিলেন। জমিদারদিগের দেয় রাজস্বের পরিমাণ ঠিক করিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু তালুকদার এবং রায়তদিগের স্বার্থসংরক্ষণের নিমিত্ত আইন-প্রণয়নের অধিকার সরকার নিজ হস্তে রাখিয়াছিল।

গুণাবলী ঃ—(ক) এই ব্যবস্থা-প্রণয়নের ফলে সরকার অক্লেশে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব আদায় করিতে পারিত। প্রজাদিগের নিকট হইতে খাজনা আদায় করিয়া জমিদার সরকারকে নিয়মিত সময়ে খাজনা পৌঁছাইয়া দিত। জমিদার সময়মত সরকারী-রাজস্ব জমা না দিলে সরকার তাহার সম্পত্তি নিলামে বিক্রয় করিয়া দিত।

(খ) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে সরকারের অনুগত একদল জমিদারের সৃষ্টি হইযাছিল। এই ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের ফলে জমিদারের বহু লাভ হইয়াছিল, সুতরাং তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোক ইংরাজ সরকারকে সমর্থন করিত।

(গ) ইহার ফলে বাংলাদেশে মধ্যবিত্তশ্রেণীর উত্থান সম্ভব হইয়াছিল। বাংলার সামাজিক, সাহিত্যিক এবং রাজনৈতিক সর্ব্ববিধ উন্নতির মূল এই মধ্যবিত্তশ্রেণী।

(ঘ) জমিদারগণ গ্রামের নেতা বলিয়া গণ্য হইতেন এবং গ্রাম্যজীবনের উন্নতির জন্য তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই অকাতরে অর্থদান করিতেন।

(ঙ) চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত-প্রবর্ত্তনের ফলে বাংলাদেশ অস্থায়ী বন্দোবস্তের কুফল হইতে রক্ষা পাইযাছিল।

ত্রুটি ঃ—(ক) চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত-প্রবর্ত্তনের ফলে সরকার বহু ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। দেশের উন্নতি যতই হউক না কেন, খাজনার পরিমাণ আর বর্দ্ধিত হইত না। জমিদারগণ প্রজার নিকট হইতে প্রচুর টাকা খাজনা বাবদ আদায় করিতেন। কিন্তু তাহাদের দেয় সরকারী খাজনার পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট ছিল। ফলে সরকারের ক্ষতি হইত।

(খ) বহু জমিদার শহরে বিলাস-ব্যসনে মত্ত হইয়া জমিদারীর ভার সম্পূর্ণভাবে নায়েব-গোমস্তার হস্তে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। এই নায়েব-গোমস্তার দল প্রজাদিগকে শোষণ করিয়া অবৈধভাবে অর্থ আদায় করিয়া

নিজ পকেটস্থ করিত। ফলে, প্রজাদিগের উপর অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

(গ) প্রজার উপর খাজনার চাপ ক্রমশঃই বাড়িতে লাগিল। অতিরিক্ত খাজনা এবং নানাপ্রকার অবৈধ করের চাপে প্রজার অবস্থা খুব খারাপ হইতে থাকে। জমিদারগণ শহরবাসী হওয়ার ফলে গ্রামের উন্নতির দিকে তাঁহাদের আর কোন লক্ষ্য রহিল না, ফলে গ্রামগুলির দুর্দ্দশা উপস্থিত হইল।

(ঘ) এই বন্দোবস্তের ফলে জমিদার ও প্রজার মধ্যে আবার একদল স্বত্বভোগী জন্মলাভ করিল, ফলে প্রজাদের উপর করের বোঝা বৃদ্ধি পাইল।

(ঙ) জমিদারী খুব লাভের ব্যবসায় এবং জমিদারদিগের খুব প্রতিষ্ঠা বলিয়া অর্থশালী লোক জমিদারী কিনিতে আরম্ভ করে। দেশের উদ্বৃত্ত অর্থ জমিতে নিযোজিত হইবার ফলে শিল্পে অর্থাভাব ঘটে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দেশের শিল্পোন্নতির অন্তরায় হইয়াছে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দোষ-গুণ অনুসন্ধানের নিমিত্ত বাংলা সরকার ১৯৩৮ সালে একটি কমিশন নিয়োগ করে। এই কমিশনের নাম ফ্লাউড কমিশন। ইহার অধিকাংশ সদস্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অবসান করিবার পক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে সকল জমিদারী ক্রয় করিয়া লইয়া দেশে রায়তী বন্দোবস্তের প্রবর্ত্তন করা সরকারের উচিত। পশ্চিমবঙ্গ ও অন্যান্য রাজ্যে এই ব্যবস্থা তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

Q. 3. *What is a ryotwari settlement? Point out the principles of assessment in temporarily settled areas.* **(C. U. 1944.)**

উঃ। রায়তী অথবা প্রজাস্বত্বমূলক বন্দোবস্তে রায়ত অথবা প্রজা সরকারের অধীনে জমি ভোগ করে। সরকার তাহাদের প্রত্যেকের নিকট হইতে পৃথক্‌ভাবে খাজনা আদায় করে। সাধারণতঃ ৩০ বৎসরের জন্য খাজনা ঠিক করা হয়। এই সময় অন্তে খাজনার হার আবার পরিবর্ত্তন করা

হয়। বোম্বাই, মাদ্রাজ এবং আসামে এই বন্দোবস্ত আছে। বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন নীতি অনুসারে খাজনা ঠিক করা হয়। প্রথমে প্রত্যেক গ্রাম নির্ভুলভাবে জরীপ করা হয় এবং জোতদারদিগের একটি পঞ্জীপত্র প্রস্তুত করা হয়, জমির গুণাগুণ লক্ষ্য করিয়া শ্রেণীবিভাগ করা হয়। কোন্ জমি হইতে গড়পড়তা কি পরিমাণ শস্য উৎপন্ন হইতে পারে, তাহার একটা আনুমানিক হিসাব প্রস্তুত করা হয়। এই আনুমানিক শস্যের পরিমাণ হইতে শস্যের ব্যয় বাদ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই নীট শস্যের পরিমাণ। সরকার এই নীট শস্যের অনধিক শতকরা ৫০ ভাগ খাজনা হিসাবে গ্রহণ করে। বোম্বাইতে কর-নির্দ্ধারণের নীতি অন্য প্রকারের। বন্দোবস্ত-প্রবর্ত্তনের সময় যে পরিমাণ খাজনা হইত, তাহাকে ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করা হয়। উৎপন্ন শস্যের মূল্য বৃদ্ধি কিংবা হ্রাস হইয়াছে তাহা লক্ষ্য রাখিয়া প্রজাদিগের সাধারণ অবস্থার কিরূপ উন্নতি হইল তাহার হিসাব করিয়া খাজনার পরিমাণ বাড়াইয়া অথবা কমাইয়া দেওয়া হয়।

পঞ্চম অধ্যায়

কুটিরশিল্প

Q. 1 *Describe some of the more important cottage industries of India.* (C. U. 1936, 1941 ; U. P. 1941)

উঃ। এক সময়ে ভারতবর্ষ তাহার কুটিরশিল্পের জন্য বিখ্যাত ছিল। ঢাকার সূক্ষ্ম মসলিন বস্ত্র, কাশ্মীরের সুন্দর শাল, দিল্লীর বুটিদার রেশমী কাপড় যখন সর্ব্ব-পৃথিবীর রাজা-মহারাজাদের অঙ্গ অলঙ্কৃত করিত, তখন বৃটেনের অধিবাসিগণ বন্যমানুষের পর্য্যায়ভুক্ত ছিল। এই সকল কারুশিল্পের

মধ্যে অনেকগুলি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। যে কয়টি আজও আছে, তাহাদের অবস্থাও বিশেষ ভাল নহে। এখানে আমরা কয়েকটি কুটিরশিল্পের কথা বলিতেছি :—

(ক) **তাঁতশিল্প** ঃ—এই দেশে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লোক চাষে নিযুক্ত আছে। তাহার পরের সংখ্যা নিযুক্ত আছে এই শিল্পে। প্রাচীন ভারতে চরকার প্রচলন সর্ব্বত্র ছিল। কিন্তু হাতে সূতাকাটা একপ্রকার লুপ্ত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে অম্বর চরকার ব্যবহার দ্বারা ইহাকে পুনরুদ্ধার করিবার চেষ্টা চলিতেছে। তাঁতশিল্প এখনও ভারতবর্ষের বৃহৎ শিল্প। বৎসরে প্রায় ·০ কোটি টাকার কাপড় তাঁতশিল্পে প্রস্তুত হয়। তাঁতশিল্পের কতকগুলি বিশেষ সুবিধা আছে এবং ইহার উন্নতির জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করিলে তাঁতশিল্প আবার সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারিবে।

(খ) **রেশম শিল্প** ঃ—গুটিপোকা-পালন এবং রেশমবস্ত্র-বয়ন এই দুইটি শিল্প প্রধানতঃ পশ্চিমবঙ্গ (মালদহ, মুর্শিদাবাদ ও বিষ্ণুপুর), আসাম, মহীশূর এবং কাশ্মীরে প্রতিষ্ঠিত আছে। এই শিল্পের প্রধান ত্রুটি এই যে, রেশমের সূতা প্রায়ই অপরিষ্কার ও অসমান থাকে।

(গ) **পশমশিল্প** ঃ—কাশ্মীর এবং মির্জ্জাপুরে পশমশিল্পের প্রবর্ত্তন আছে। একসময় ভারতবর্ষের পশমশিল্প খুব বিখ্যাত ছিল, কিন্তু বৈদেশিক প্রতিযোগিতার ফলে এই শিল্প আজ নানা অসুবিধার মধ্যে পড়িয়াছে। এই শিল্পে কেবলমাত্র সুন্দর পশমী শালই নহে, মোটা খসখসে কম্বলও প্রস্তুত করা হয়।

(ঘ) **পিত্তল এবং কাংস্য শিল্প** ঃ—এই শিল্পের প্রধান কেন্দ্র হইল মুর্শিদাবাদ, কাশী, শ্রীনগর, মির্জ্জাপুর প্রভৃতি। পিতল এবং কাঁসা-নির্ম্মিত বাসনপত্র ভারতবাসিগণ খুবই ব্যবহার করে। বর্ত্তমানে এলুমিনিয়ামের বাসনপত্র ব্যবহারের জন্য এই শিল্পে মন্দা দেখা দিয়াছে।

Q. 2. *Name some of the cottage industries of West Bengal.* (C. U. 1929)

উঃ। (ক) **তাঁতশিল্প** :—এখন পর্য্যন্তও তাঁতশিল্প পশ্চিমবঙ্গের সর্ব্বপ্রধান শিল্পের স্থান অধিকার করিয়া আছে। এই রাজ্যের সর্ব্বত্রই তাঁতশিল্পের প্রচলন আছে। তাঁতবস্ত্র-প্রস্তুতের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র হইল শান্তিপুর এবং ধনেখালি। শান্তিপুর এবং ফরাসডাঙ্গার সূক্ষ্ম বস্ত্র এবং শাড়ীর প্রচুর সমাদর আছে। চরকায় সূতাকাটার অভ্যাস বিগতপ্রায়, যদিও খাদি আন্দোলনে এই বিভাগের পুনরুদ্ধারের জন্য চেষ্টা চলিতেছে।

(খ) **রেশমবয়ন** :—বাংলাদেশ একসময় তাহার রেশমনির্ম্মিত বস্ত্রের জন্য বিখ্যাত ছিল। কিন্তু অন্যান্য কুটিরশিল্পের ন্যায় রেশমশিল্পেও আজ মন্দা দেখা দিয়াছে। এই শিল্পের প্রধান কেন্দ্র মুর্শিদাবাদ, মালদহ এবং বীরভূম। চীন এবং জাপান হইতে রেশম আমদানী এবং কৃত্রিম রেশম প্রবর্ত্তনের ফলে বাংলাদেশের রেশমশিল্পের অবস্থা তত ভাল নহে। তাঁতীগণ দেশী রেশমী সূতা পছন্দ করে না, তাহার কারণ তাহা অপরিষ্কার ও অসমান। তাহারা বিদেশী রেশমী সূতা ব্যবহারের পক্ষপাতী।

(গ) **পিত্তল এবং কাংস্যশিল্প** :—এই শিল্পের প্রধান কেন্দ্র হইল খাগড়া, নবদ্বীপ, মুর্শিদাবাদ এবং মেদিনীপুর। খাগড়াই কাংস্য-নির্ম্মিত বাসন প্রদেশের সর্ব্বত্র খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে। এলুমিনিয়াম-নির্ম্মিত বাসন প্রচলনের ফলে এই শিল্প কিয়ৎপরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

(ঘ) **বোতাম এবং চিরুনিশিল্প** :—এই শিল্পের উৎপন্ন দ্রব্য বিশেষ কারুকার্য্য-খচিত। মুর্শিদাবাদের হস্তিদন্তশিল্পেও সুন্দর কারুকার্য্য-খচিত দ্রব্য উৎপন্ন হয়।

(ঙ) **লেসশিল্প** :—উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র হুগলী, ২৪-পরগণা এবং দার্জ্জিলিং।

(চ) **মৃৎশিল্প**ঃ—এই রাজ্যের সর্বত্রই মৃৎশিল্পের প্রচলন আছে। কৃষ্ণনগরের মৃত্তিকানির্ম্মিত পুতুল ও অন্য দ্রব্য ভারতবিখ্যাত।

এতদ্ব্যতীত রাজ্যের সর্ব্বত্র আরও অনেক শিল্প আছে। যেমন, কাঞ্চননগরের ছুরিকাঁচি প্রভৃতি শিল্প, চন্দননগরের আসবাব শিল্প, মেদিনীপুরের বেত ও বাঁশ নির্ম্মিত দ্রব্য এবং মাছুরশিল্প প্রভৃতি।

Q. 3. *Explain the importance of cottage industries in Indian economy. Discuss the steps that have been suggested for their development in the Second Five Year Plan of India.* (Burd. 1962)

উঃ। অনেক লেখকের মত যে, কুটিরশিল্পের কোন ভবিষ্যৎ নাই। বর্ত্তমান যুগ বড় বড কারখানার যুগ। কুটিরশিল্পের এখানে কোন স্থান নাই। কুটিরশিল্পে যে খরচায় জিনিষ তৈয়ারী হইবে ইহার চেয়ে অনেক কম খরচে মিলে সেই জিনিষ তৈয়ারী করা যাইবে। কারণ, কুটিরশিল্প প্রসারে বৃথা সময়, অর্থ ও শক্তিক্ষয় করিবার কোন প্রয়োজন নাই।

কিন্তু ঠিকমত বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে যে, ভারতবর্ষে কুটিরশিল্পের একটি বিশেষ স্থান আছে। প্রথমতঃ, আমাদের দেশে মূলধনের পরিমাণ কম এবং জনসংখ্যাও অত্যন্ত বেশী। বড় বড় কারখানা বসাইতে বহু মূলধনের প্রয়োজন হয় এবং সেই তুলনায় কমসংখ্যক লোককে কাজ দেওয়া যায়। কুটিরশিল্পে মূলধন কম লাগে এবং বহু লোকের কাজের সংস্থান করা যায়। আমাদের দেশে এমন শিল্প-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতে হইবে যাহাতে কম মূলধন লাগিবে এবং বেশী সংখ্যক লোককে কাজ দেওয়া যাইবে। সুতরাং আমাদের দেশে কুটিরশিল্প-প্রসারের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। গ্রামাঞ্চলে বহুলোক বেকার বা অর্দ্ধবেকার বসিয়া আছে। কুটিরশিল্প গঠন ও উন্নত করিয়া এই সমস্ত লোককে নিজেদের বাড়ীতে থাকিয়া কাজ করিবার সুযোগ দেওয়া যাইবে। চাষীরা যখন ক্ষেতের কাজ

থাকে না তখন কোন কুটিরশিল্পে কাজ করিয়া আয় বাড়াইতে পারে। কুটিরশিল্পে উৎপাদনব্যয় যে সব সময়ে বেশী একথা সত্য নহে। উন্নততর উৎপাদন-প্রণালী অবলম্বন করা হইলে এখানেও কম ব্যয়ে জিনিষ উৎপাদন করা সম্ভব হইবে।

অনেক কুটিরশিল্পে বিশেষ রুচিসম্পন্ন ও কারুকার্য্য-খচিত জিনিষ প্রস্তুত হয়। উদাহরণস্বরূপ বেনারসী শাড়ীর কথা উল্লেখ করা যায়। এই সমস্ত জিনিষের উৎপাদনে কুটিরশিল্পের বিশিষ্ট স্থান আছে। এমন কি এই সব জিনিষ বিদেশে রপ্তানী করিবার যথেষ্ট সুযোগ রহিয়াছে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সরকার কুটিরশিল্প এবং ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উন্নতির জন্য মোট ১৭৫ কোটি টাকা ব্যয় করিয়াছে। ইহার মধ্যে অম্বর-চরকার উন্নতির জন্য প্রায় ৮২ কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে। তাঁতশিল্পের জন্য প্রায় ৩০ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দ ছিল। এই শিল্পগুলির উন্নতির জন্য সরকার কয়েকটি প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়াছে—ইহাদের কাজ হইতেছে বিভিন্ন কুটিরশিল্পের উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা করা। এই প্রতিষ্ঠানগুলির কাজ অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে।

Q. 4. *Discuss the advantages possessed by the cottage industries.*

উঃ। কুটিরশিল্পের কতকগুলি **সুবিধা** আছে বলিয়া আজও তাহারা বাঁচিয়া আছে :—

(ক) গ্রামে মজুরীর হার খুব কম। গ্রামবাসিগণ দূর দেশে অপরিচিত কারখানায় কাজ করা অপেক্ষা নিজের বাড়ীর নিকট কাজ করা বেশী পছন্দ করে।

(খ) আবার বাড়ীতে থাকিয়া কাজ করিলে পরিবারের অন্য লোক, বিশেষ করিয়া স্ত্রীলোক এবং শিশুদিগের সহায়তা লাভ করিবার সুযোগ

পায়। পরিবারের অন্যান্য লোকের সাহায্য পাইলে কেবল যে খরচ কমে তাহা নহে। নিজের লোকের মধ্যে কাজ করিলে পরিশ্রমের কষ্ট কম হয়।

(গ) এই সকল কারিগর তাহাদের গ্রাহকদিগের রুচি এবং চাহিদার সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত আছে। ফলে, তাহারা তাহাদের ক্রেতাদিগের রুচি অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকারের জিনিষ প্রস্তুত করে।

(ঘ) অনেক সময় চাষীগণ তাহাদের অবসর সময়ে কোন কুটিরশিল্পে কাজ করিয়া আয় বাড়াইতে পারে।

(ঙ) এই সকল কুটিরশিল্পে বিশেষ রুচিসম্পন্ন ও কারুকার্য্য-খচিত বস্তু প্রস্তুত হয়। উদাহরণস্বরূপ, বেনারসী শাড়ীর উল্লেখ করা যাইতে পারে। এখানে মিল, কুটিরশিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া পারিবে না।

Q. 5. *What are the defects of cottage industries?* (C. U. 1941)

উঃ। (ক) কারিগরদিগের **নিরক্ষরতা এবং রক্ষণশীল মনোবৃত্তি** কুটিরশিল্পের অনেক ক্ষতি করে। নিরক্ষরতার জন্য কারিগরেরা আধুনিক উন্নত ধরণের উৎপাদন-পদ্ধতি প্রবর্ত্তনে অনিচ্ছুক হয়।

(খ) **কারিগরদিগের যান্ত্রিক শিক্ষার অভাব** বলিয়া তাহারা তাহাদের শিল্পে বিশেষ উন্নতি করিতে পারে না।

(গ) চাষীদিগের মত কুটিরশিল্পের কারিগরগণও মহাজনদিগের নিকট ঋণে বাঁধা আছে। মহাজনের নিকট ঋণ আছে বলিয়া কারিগরগণ উৎপন্ন দ্রব্য অল্প মূল্যে মহাজনের নিকট বিক্রয় করিয়া দিতে বাধ্য হয়। জিনিষের ন্যায্য দাম পায় না বলিয়া দারিদ্র্য মোচন হয় না।

(ঘ) কারিগরগণ সেই অতি প্রাচীন উৎপাদন-পদ্ধতির অনুসরণ করিয়া চলিতেছে। এই বিষয়ে উন্নতি করিবার দিকে তাহাদের লক্ষ্য নাই।

(ঙ) আর একটি অসুবিধা হইল যে, কুটিরশিল্পের উৎপন্ন দ্রব্য বাজারে বিক্রয় করিবার কোন ভাল বন্দোবস্ত নাই। এইজন্য কারিগরগণের অসুবিধা ভোগ করিতে হয়।

Q. 6. *Indicate the various ways in which you can develop the cottage industries of India.* (C. U. 1928, 1929, 1932, 1942, 1943 ; U. P. 1941)

উঃ। (ক) **শিক্ষা** :—সর্ব্বাগ্রে কারিগরগণকে উপযুক্ত শিক্ষিত করিতে হইবে। তাহাদের কেবলমাত্র সাধারণ শিক্ষা দিলেই চলিবে না, সেইসঙ্গে যান্ত্রিক শিক্ষা দিবার ব্যবস্থাও করিতে হইবে। কুটিরশিল্পের বড় কেন্দ্রে যন্ত্রশিক্ষার বিদ্যালয় স্থাপন করা প্রয়োজন। এই সকল বিদ্যালয়ে কারিগর-গণকে উন্নত ধরণের উৎপাদন-পদ্ধতি-শিক্ষা দিতে হইবে।

(খ) **অল্প সুদে মূলধন সরবরাহ** :—সমবায়-ঋণদান-সমিতি গঠন করিয়া অল্প সুদে কারিগরদিগের প্রযোজনীয় অর্থ ধার দিতে হইবে।

(গ) **উন্নত প্রকারের কলকব্জা এবং যন্ত্রপাতির প্রবর্ত্তন** :—কুটিরশিল্পের উপযোগী উন্নত প্রকারের যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করিবার জন্য গবেষণা করা প্রযোজন। পরে কারিগরগণের মধ্যে এই সকল পদ্ধতি প্রচার করিতে হইবে। কারিগরগণ যাহাতে কিস্তিতে কিস্তিতে টাকা দিয়া ঐ সকল উন্নত প্রকারের যন্ত্রপাতি কিনিতে পারে, সরকারকে তাহার বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

(ঘ) **উন্নত বিক্রয়-সমিতি-সংগঠন** :—কুটিরশিল্পজাত জিনিষ জনপ্রিয় করিয়া তুলিবার জন্য বড় বড় শহরে এবং বিদেশে দোকানঘর স্থাপন করিতে হইবে। মাঝে মাঝে কুটিরশিল্পজাত দ্রব্যের প্রদর্শনীর বন্দোবস্ত করিতে হইবে। ভারতবর্ষে এবং বিদেশে শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য একটি কেন্দ্রীয় বিক্রয়-সমিতি-সংগঠন সংস্থাপন করা প্রয়োজন।

(ঙ) **প্রচারকার্য্য**ঃ—লোকে যাহাতে কুটিশিল্পে প্রস্তুত দ্রব্য বেশী করিয়া ক্রয় করে সেই উদ্দেশ্যে সরকারকে প্রচারকার্য্য চালাইতে হইবে।

Q. 7. *Estimate the possibilities of handloom industry in India.* (C. U. 1930)

উঃ। একসময় তাঁতশিল্প ভারতবর্ষে বিখ্যাত এবং বর্দ্ধিষ্ণু কুটিশিল্প ছিল। পৃথিবীর সর্ব্বত্র ঢাকার মসলিন বস্ত্রের কদর ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে এই তাঁতশিল্পের অবস্থা খুব খারাপ। তৎসত্ত্বেও তাঁতশিল্প ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রধান কুটিরশিল্প। গুরুত্বে কৃষিকার্য্যের পরেই ইহার স্থান। ভারতবর্ষের মোট উৎপন্ন বস্ত্রের প্রায় শতকরা ৩৮ ভাগ তাঁতশিল্পে প্রস্তুত এবং এই শিল্প হইতে বৎসরে তাঁতীদিগের প্রায় ৫০ কোটি টাকা আয় হয়। তাঁতশিল্প আজ ধ্বংসোন্মুখ অবস্থায় এবং ইহার সংগঠন অনেক ত্রুটিপূর্ণ। কিন্তু এই শিল্পের কতকগুলি বিশেষ **সুবিধা** আছে। সেইজন্য ইহা আজও বাঁচিয়া আছে ঃ—

(ক) বংশপরম্পরায় একই কাজ করিবার জন্য তাঁতীগণ নিজ ব্যবসায়ে খুব দক্ষতা অর্জ্জন করিয়াছে।

(খ) এই শিল্পে স্থায়ী মূলধনের পরিমাণ খুব সামান্য লাগে।

(গ) সাধারণতঃ তাঁতী তাঁতশিল্পের সঙ্গে চাষবাস কিংবা অন্য কাজ করে।

(ঘ) তাঁতী তাহার পরিবারের অন্যান্য লোকদিগের, বিশেষ করিয়া স্ত্রীলোক এবং শিশুদের, সাহায্য পায়।

(ঙ) কারখানার শ্রমিক অপেক্ষা সে অনেক বেশী উৎসাহ ও দরদ লইয়া কাজ করে।

(চ) সে ধনী ক্রেতার রুচি অনুযায়ী কারুকার্য্য-খচিত এবং বিশেষভাবে অলঙ্কৃত বস্ত্র উৎপাদন করিতে পারে।

(ছ) মিলের কাপড় অপেক্ষা বেশী স্থায়ী হয় বলিয়া গরীব লোক তাঁতের মোটা আটপৌরে কাপড় পছন্দ করে।

এই সকল সুবিধা আছে বলিয়া আশা করা যায় যে, উপযুক্ত ব্যবস্থা হইলে তাঁতশিল্পের ভবিষ্যৎ সমুজ্জ্বল।

তাঁতশিল্পের উন্নতি সম্বন্ধে পূর্ব্ববর্ত্তী প্রশ্ন দেখ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

শিল্প

Q. 1. *Account for the causes of the industrial backwardness of India.*

Or, What, according to you, are the conditions necessary for the industrial progress of a country? Do they exist in India?

Discuss some of the factors hampering India's efforts at a speedy development of her industries. (C. U. 1951, 1958)

উঃ। শিল্পোন্নতি করিতে হইলে যে-সকল উপাদান থাকা দরকার, তাহাদের সংক্ষেপে চারভাগ ভাগ করা হয়, যথা—জমি, শ্রম, মূলধন এবং সংগঠনশক্তির যথেষ্ট পরিমাণ সরবরাহ। (১) যে দেশে প্রচুর পরিমাণে প্রাকৃতিক সম্পদ, যেমন কয়লা, পেট্রোল প্রভৃতি খনিজ দ্রব্য আছে, তাহার শিল্পোন্নতি হইবার সম্ভাবনা অনেক বেশী। (২). শ্রমিকগণ দক্ষ হইলে শিল্পপ্রতিষ্ঠার সুবিধা হয়। (৩) প্রচুর মূলধনের সরবরাহ থাকা প্রয়োজন এবং (৪) ব্যবসায়-জগতে বহুসংখ্যক দক্ষ উৎপাদক থাকা প্রয়োজন।

দুর্ভাগ্যবশতঃ ভারতবর্ষে এই সকল প্রয়োজনীয় উপাদানের সরবরাহ বেশী নাই। সেইজন্য ভারতবর্ষ শিল্পোন্নতিতে এত পশ্চাৎপদ আছে।

জমিঃ—ভারতবর্ষে নানাবিধ শস্যের উপযুক্ত জমি, খনিজ সম্পদ এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ প্রচুর পরিমাণে আছে। কিন্তু শক্তিসম্পদ যথেষ্ট নহে। ভারতবর্ষে পেট্রোলিয়াম বিশেষ উৎপন্ন হয় না। কয়লার খনির অধিকাংশই পশ্চিমবঙ্গ এবং বিহারে অবস্থিত। দক্ষিণ কি পশ্চিম ভারতে কয়লার একান্ত অভাব। ভারতবর্ষে জলবিদ্যুৎ-শক্তির বিশেষ উন্নতি হয় নাই।

(২) **শ্রমঃ**—ভারতবর্ষে দক্ষ শ্রমিকের সংখ্যা অল্প বলিয়া শিল্পোন্নতির পথে বহু অন্তরায় আছে।

(৩) **মূলধনঃ**—আমাদের দেশে সঞ্চিত ধনের পরিমাণ খুব সামান্য। চরম দারিদ্র্যের জন্য সাধারণের সঞ্চয়ের ক্ষমতা নাই বলিলেই চলে। অধিকন্তু যাহাদের সামান্য মূলধন আছে তাঁহারা উদ্যমহীন এবং শিল্পব্যবসায়ে তাহাদের উদ্বৃত্ত অর্থ বিনিয়োগ করিতে চায় না। তাহারা হয় জমি না হয় কাম্পানীর কাগজ বা সরকারী ঋণপত্র কিনিবার পক্ষপাতী। ভাল ব্যাঙ্কার সংখ্যা আমাদের দেশে খুব বেশী নয়। মূলধনের অভাবের জন্য আমাদের কিছু কিছু শিল্পই বিদেশী মূলধনদ্বারা পরিচালিত।

(৪) **ব্যবসায়ী জগতের নেতৃবৃন্দঃ**—আমাদের দেশে ব্যবসায় পরিচালনা করিবার মত উপযুক্ত নেতার একান্ত অভাব। স্যার আর. এন. মুখার্জ্জী, মিঃ টাটা প্রভৃতির মত ব্যবসায়-প্রতিভা এবং সংগঠন-শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি আমাদের দেশে বিরল। আমাদের সামাজিক পরিবেশ এবং শিক্ষাপ্রণালীও শিক্ষিত শ্রেণীকে ব্যবসায়-বিমুখ করিতেছে।

(৫) বৃটিশ আমলে সরকার শিল্পে হস্তক্ষেপ না-করার নীতি অনুসরণ করিয়া আসিয়াছে ও শিল্পোন্নয়নের জন্য কোন সাহায্য করে নাই।

Q. 2. ***What measures do you suggest for the development of industries in India ?***

উঃ। (ক) সর্ব্বপ্রথম এই দেশের যুবকদিগকে ব্যবসায়বুদ্ধি গ্রহণে উৎসাহিত করা প্রয়োজন। কারণ, ব্যবসায়জগতে ভাল উদ্যোক্তার অভাবে কোন শিল্পের উন্নতি করা সম্ভবপর নহে। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষাপ্রণালীর উন্নতি করা প্রয়োজন। **যান্ত্রিক শিক্ষাদানের** উদ্দেশ্যে আরও অধিকতর অর্থ ব্যয় করা উচিত।

(খ) শ্রমিকগণের কর্ম্মক্ষমতাবৃদ্ধির জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। **সাধারণ এবং যান্ত্রিক** দুই প্রকার শিক্ষার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। শ্রমিকগণের জন্য ভাল বাসস্থান নির্ম্মাণের এবং অধিক হারে মজুরী দিবার বন্দোবস্ত করা প্রয়োজন।

(গ) শিল্পের উন্নতিবিধান করিতে হইলে দেশে উন্নত ধরণের ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। প্রত্যেক রাজ্যে শিল্পোন্নয়নকার্য্যে ঋণদান করিবার জন্য **শিল্পসহায়ক ব্যাঙ্ক** প্রতিষ্ঠা করা প্রযোজন।

(ঘ) শিল্পোন্নয়নের জন্য সরকারকেও সচেষ্ট হইতে হইবে। প্রয়োজনীয় শিল্পের সংরক্ষণ করিতে হইবে।

Q. 3. ***Give a brief outline of the manner in which the state is trying to promote industrial development of India.*** (C. U. 1959.)

উঃ। এই কথা আজ সর্ব্বজনস্বীকৃত যে, দেশের শিল্পোন্নয়নের জন্য সরকারের সাহায্য প্রযোজন। জাপানের শিল্পোন্নতির মূলে আছে সে দেশের সরকারের প্রভূত সাহায্য দান। এমন কি, ইংলণ্ডের সরকার বর্ত্তমানে নিজ দেশীয় শিল্পের উন্নতির জন্য নানাভাবে চেষ্টা করিতেছে।

মাত্র অল্প কিছুদিন পূর্ব্বে ভারত সরকার আমাদের দেশীয় শিল্পের উন্নতিবিধানের নীতি গ্রহণ করিয়াছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে সরকার শিল্পে

হস্তক্ষেপ না করার নীতি অনুসরণ করিয়াছে এবং ভারতে শিল্পোন্নয়নের জন্য কোনপ্রকার সাহায্য করে নাই। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মাদ্রাজ সরকার দুই একটি কারখানা প্রতিষ্ঠা করিয়া সর্ব্বপ্রথম শিল্পোন্নয়নের চেষ্টা করে; কিন্তু ভারতসচিব এই নীতি অনুমোদন করেন নাই। ফলে, শিল্পোন্নয়নের নীতি পরিত্যক্ত হয়।

প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর ভারতের শিল্পগুলির দুরবস্থার দিকে সকলের দৃষ্টি পড়িল। ভারত সরকার শিল্পোন্নয়নের জন্য কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়া ১৯১৭ সালে একটি **শিল্প কমিশন** নিয়োগ করে। শিল্প কমিশন ভারতে শিল্পোন্নতির উদ্দেশ্যে ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য কয়েকটি প্রস্তাব করে। সরকার কি উপায়ে শিল্পোন্নতির সহায়তা করিতে পারে কমিশন তাহাও নির্দেশ করে। তাঁহাদের মতে সরকার শিল্পোন্নতির উদ্দেশ্যে গবেষণার ব্যবস্থা করিবে; বিভিন্ন শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা করিবে; যান্ত্রিক শিল্প প্রবর্ত্তনের বন্দোবস্ত করিবে; প্রয়োজনমত ঋণ দিবে, এবং সরকার নিজ ব্যবহারের জন্য স্বদেশী জিনিস কিনিবে। ভারত সরকার কমিশনের প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করে।

ইহার পর ভারত সরকারের এবং প্রত্যেক প্রাদেশিক সরকারের অধীনে এক একটি শিল্পবিভাগের প্রবর্ত্তন করা হইল। এই বিভাগের কাজ হইল শিল্পোন্নতির উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় উপদেশ এবং সংবাদ পরিবেশন করা, অনুসন্ধান করা প্রভৃতি। কোন কোন রাজ্যে আবার শিল্পগুলিকে আর্থিক সাহায্য দিবার জন্য আইন (State Aid to Industries Act) প্রণয়ন করিয়া শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিকে সরকারী ঋণদানের বন্দোবস্ত করা হইল। বাংলা সরকার ছোট শিল্পের সহায়তার জন্য একটি শিল্পসহায়ক ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা করিযাছে।

১৯২২ সালে ভারতীয় ষ্টোর বিভাগের (Indian Store Dept.) প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই বিভাগের কাজ হইল সরকারের প্রয়োজনীয়

জিনিসপত্র এই দেশে ক্রয় করার ব্যবস্থা করা। ১৯২২ সালে ভারতীয় রাজস্ব কমিশন (Indian Fiscal Commission) সংরক্ষণনীতি (Discriminating protection) প্রবর্ত্তনের জন্য সুপারিশ করে। কমিশনের সুপারিশমত সরকার লৌহ এবং ইস্পাত শিল্প, দিয়াশলাই, চিনি, কাগজ, প্রভৃতি শিল্পকে বৈদেশিক প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষা করিবার জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়াছে।

বর্ত্তমানে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হইবার পর এই নীতির আমূল পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সরকার এখন পূর্ণভাবে দেশের শিল্পগুলিকে সহায়তা করিতেছে।

Q. 4. *Describe some of the more important manufacturing industries in India.* (C. U. 1944)

উঃ। (ক) **বস্ত্রশিল্প** ঃ—১৮১৮ সালে কলিকাতায় প্রথম কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৫৮ সালে বোম্বাইতে প্রথম সুতাকল-স্থাপনের পর বস্ত্রশিল্পের প্রতিষ্ঠা হইল। মিলগুলির অধিকাংশ বোম্বাই এবং আমেদাবাদ অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত, যদিও প্রায় প্রত্যেক প্রদেশেই অল্পবিস্তর কাপড়ের কল আছে। মিলগুলির অধিকাংশের মালিক ভারতীয়। এই শিল্পে মোট মূলধনের পরিমাণ প্রায় ৪০ কোটি টাকা। ইহাদের অধিকাংশেই মোটা সুতার বস্ত্র প্রস্তুত হয়। কিন্তু ক্রমশঃ অধিকসংখ্যক মিলে সূক্ষ্ম বস্ত্র প্রস্তুত হইতেছে। ল্যাঙ্কাশায়ার এবং জাপানের প্রতিযোগিতা হইতে বস্ত্রশিল্পকে সংরক্ষণ করা হইয়াছে।

(খ) **পাটকল** ঃ—বাংলাদেশে রিষড়া অঞ্চলে ভারতবর্ষের প্রথম পাটকল স্থাপিত হয় ১৮৫৫ সালে। পাটকলগুলি পশ্চিমবঙ্গে হুগলী নদীর তীরে অবস্থিত। পাটশিল্পের অধিকাংশ ইউরোপীয়দিগের হস্তগত।

(গ) **লৌহ এবং ইস্পাত শিল্প** :—যদিও লৌহ প্রস্তুত করিবার চেষ্টা ১৮৫৩ সাল হইতে হইতেছে, ভারতবর্ষে লৌহশিল্পের প্রকৃত পত্তন হয় ১৯০৭

সালে জামসেদপুরে টাটা লৌহ এবং ইস্পাত-শিল্প কোম্পানী প্রতিষ্ঠার সঙ্গে। লৌহ-উৎপাদন কার্য্যে বৃটিশ কমনওয়েলথের মধ্যে এইটিই সর্ব্ববৃহৎ প্রতিষ্ঠান। লৌহ-শিল্পকেই সরকার সর্ব্বপ্রথম সংরক্ষিত শিল্পের অন্তর্ভুক্ত করে। লৌহ-শিল্পের কর্ত্তৃত্ব ভারতীয়দিগের হস্তেই ন্যস্ত আছে।

(ঘ) **কাগজ-শিল্প**ঃ—১৮৭০ সালের হুগলীর নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে ভারতবর্ষের প্রথম কাগজের কল স্থাপিত হয়। বর্ত্তমানে প্রায় ১১টি কাগজের কল আছে। কিন্তু ইহাদিগের অধিকাংশই ইউরোপীয়দিগের পরিচালনাধীনে আছে। ১৯২৫ সাল হইতে কাগজ-শিল্পকে সংরক্ষিত শিল্পের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

(ঙ) **চিনি-শিল্প**ঃ—চিনি-শিল্প ভারতবর্ষের একটি প্রাচীন শিল্প। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে সাদা চিনি প্রস্তুত করিবার জন্য অনেকগুলি চিনির কলের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। চিনির কলগুলি প্রধানত বিহার এবং উত্তরপ্রদেশেই প্রতিষ্ঠিত। দেশের মোট প্রয়োজনীয় চিনি আমাদের দেশীয় চিনির কলগুলিই সরবরাহ করিতে সমর্থ। ১৯৩২ সাল হইতে আমাদের চিনি-শিল্প সংরক্ষিত হইয়াছে।

(চ) **সিমেণ্ট-শিল্প**ঃ—১৯০১ সালে মাদ্রাজে প্রথম সিমেণ্টের কারখানা স্থাপিত হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতে সিমেণ্ট-শিল্পের খুব দ্রুত উন্নতি হইয়াছে।

(ছ) **দিয়াশলাই-শিল্প**ঃ—উচ্চহারে সংরক্ষণ শুল্ক ধার্য্য করিবার পর এই শিল্পের দ্রুত উন্নতি হইয়াছে। বর্ত্তমানে আমাদের দিয়াশলাই শিল্প দেশের সম্পূর্ণ প্রয়োজন মিটাইতে সমর্থ।

এতদ্ব্যতীত আমাদের দেশে বর্ত্তমানে অনেক চামড়ার কল, কাঁচের কারখানা, রসায়ন শিল্প প্রভৃতি স্থাপিত হইয়াছে।

Q. 5. *Discuss briefly the causes of the low level of efficiency of industrial labour in India.* (U. P. 1941)

উঃ। ভারতবর্ষের শ্রমিকদিগের কর্ম্মদক্ষতার **অভাব** একটা জনপ্রবাদে পরিণত হইযাছে। একজন ল্যাঙ্কাশাযাবের শ্রমিক নাকি তিনজন **ভারতীয়** শ্রমিকের সমান কাজ করিতে পারে। ভাবতীয় শ্রমিকের এই অযোগ্যতাব কারণ নানাবিধ :

(ক) একটি কারণ **ভারতবর্ষের জলবায়ু**। ভারতবর্ষের উষ্ণপ্ত জলবায়ুতে অধিকক্ষণ পরিশ্রম কবা সম্ভবপর নহে।

(খ) আর একটি কাবণ **শ্রমিকের খারাপ স্বাস্থ্য**। ভারতবর্ষেব শ্রমিকগণ উপযুক্ত পুষ্টিকব খাদ্য পায় না। তাহারা নরকতুল্য **বস্তি** এবং **চালাঘরে** বাস করে। ফলে, অতি সহজেই শ্রমিকগণ রুগ্ন হয় ও দীর্ঘ সময় পরিশ্রম কবিতে পারে না।

(গ) শ্রমিকগণেব **নিরক্ষরতাও** তাহাদেব অযোগ্যতার জন্য দায়ী। যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে তাহাদেব কোন জ্ঞান নাই। আবার দেশে যান্ত্রিক বিদ্যালয়ের অভাবে তাহাদেব যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিবার কোন সুবিধাও নাই।

(ঘ) শ্রমিকগণেব **জীবনধারণের মান** অত্যন্ত নিম্ন, ইহাও তাহাদেব অযোগ্য কবিযা দেয।

(ঙ) আরও একটি কারণ ভারতীয শ্রমিকগণেব কর্ম্মের অযোগ্যতার জন্য দায়ী। কাবখানার অধিকাংশ শ্রমিকই গ্রামবাসী এবং প্রায় গ্রামে ফিরিযা যাইবার জন্য ব্যস্ত। কারখানার কাজ তাহারা সুনজরে দেখে না। সুতরাং কারখানার কাজে যোগ্যতা অর্জ্জনেব জন্য তাহাদের বেশী উৎসাহ নাই।

(চ) ভারতবর্ষের শ্রমিকগণের **বেতন এত অল্প** যে, তদ্দ্বারা যোগ্যতা অর্জ্জন কবা তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর নহে।

Q. 6. *Suggest measures for the improvement of the efficiency of Indian labour.* (U. P. 1941)

উঃ। (ক) ভাবতীয় শ্রমিকগণের যোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন শিক্ষা। শ্রমিকগণকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে হইবে। বহুসংখ্যক যান্ত্রিক

বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া তাহাদের যান্ত্রিক শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

(খ) শ্রমিকগণের জন্য অপেক্ষাকৃত **ভাল বাসস্থানের বন্দোবস্ত** করিতে হইবে। বস্তিগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে। মালিক এবং স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির কর্ত্তৃপক্ষগণের উচিত, শ্রমিকগণের জন্য আদর্শ স্বাস্থ্যকর বাসস্থান নির্ম্মাণ করা। শ্রমিকগণের জন্য ভাল চিকিৎসার বন্দোবস্ত, সমবায় ভাণ্ডারের মারফত বিশুদ্ধ খাদ্য সরবরাহ প্রভৃতির ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। ইহার ফলে শ্রমিকগণের স্বাস্থ্যের উন্নতি হইবে।

(গ) শ্রমিকগণকে **উচ্চহারে বেতন** দিতে হইবে। কারখানায় যাহাতে উপযুক্ত আলো-হাওয়া থাকে, তাহার বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

সপ্তম অধ্যায়

বৈদেশিক বাণিজ্য

Q. 1. *Point out the chief characteristics of India's foreign trade.* (C. U. 1934, '40 ; U. P. 1945, '47)

উঃ। (ক) ভারতবর্ষের বৈদেশিক বাণিজ্যের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হইল এই যে, পূর্ব্বে আমরা প্রধানতঃ কাঁচামাল ও খাদ্যশস্য রপ্তানী এবং বিদেশ হইতে শিল্পজাত দ্রব্য আমদানী করিতাম। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষ শিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানী করিত। কিন্তু রেলপথ-নির্ম্মাণ এবং ইংলণ্ডের শিল্পবিপ্লবের ফলে আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে রপ্তানী দ্রব্যের অধিকাংশ কাঁচামাল ও খাদ্যদ্রব্য এবং আমদানীর অধিকাংশই শিল্পজাত দ্রব্য। গত কয়েক বৎসর

অবশ্য এই অবস্থার কিছু পরিবর্ত্তন দেখা যাইতেছে। এখন আমরা খাদ্যদ্রব্য ও কাঁচামাল আমদানী করি ও রপ্তানীর মধ্যে শিল্পজাত দ্রব্যের পরিমাণ বাড়িতেছে।

(খ) আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্যের আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল আমদানী অপেক্ষা রপ্তানীর আধিক্য। প্রায় প্রতি বৎসরই আমাদের রপ্তানী দ্রব্যের মূল্য আমদানী দ্রব্যের মোট মূল্য অপেক্ষা অধিক হইত, অর্থাৎ ভারতবর্ষের বাণিজ্যিক গতি ছিল অনুকূল। ইহার কারণ কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের বহু ঋণ ছিল এবং ইংলণ্ডকে প্রতি বৎসর বহু অর্থ ঋণ পরিশোধ বাবদ প্রেরণ করিতে হইত। সেইজন্য ভারতবর্ষকে আমদানী হইতে রপ্তানী বেশী করিতে হইত। বর্ত্তমানে অবশ্য রপ্তানী অপেক্ষা আমদানী দ্রব্যের পরিমাণ বেশী।

(গ) ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের বৈদেশিক বাণিজ্যের আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, প্রতি বৎসরই বহু পরিমাণে সোনা এবং রূপা এদেশে আমদানী হইত। বৈদেশিক বাণিজ্যের এই বৈশিষ্ট্য অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত আছে। কিন্তু ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের পর ভারতবর্ষ হইতে বহু পরিমাণে সোনা রপ্তানী হইয়াছিল।

Q. 2. *What are the causes of the present unfavourable balance of trade of India ?* (C. U. 1959).

উঃ। গত পাঁচ বৎসরের মধ্যে চার বৎসর ভারতবর্ষের বাণিজ্যিক গতি প্রতিকূল হইতেছে। প্রতি বৎসরই রপ্তানী দ্রব্যের পরিমাণ আমদানী হইতে কম। ইহার কারণ কি ?

প্রধান কারণ এদেশের খাদ্যসমস্যা। এদেশে যে পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন হয়, প্রয়োজনের তুলনায় তাহা অনেক কম। সেইজন্য প্রতি বৎসরই বহু টাকার খাদ্যদ্রব্য বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হইতেছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে খাদ্যদ্রব্য আমদানী করিতে হইলেও তাহার পরিমাণ অনেক কম ছিল।

দ্বিতীয় কারণ, দেশবিভাগ। পাকিস্তান-প্রতিষ্ঠার ফলে কাঁচামাল-উৎপাদনকারী অঞ্চলগুলির অধিকাংশই পাকিস্তানে পড়িয়াছে, যেমন পাট ও তুলা। পূর্ব্বে আমরা বহু টাকার পাট ও তুলা রপ্তানী করিতাম। বর্ত্তমানে রপ্তানী ত দূরের কথা, প্রতি বৎসরই বহু টাকার পাট ও তুলা আমাদের আমদানী করিতে হইতেছে। ফলে, রপ্তানীর পরিমাণ কমিয়াছে ও আমদানী বাড়িয়াছে।

তৃতীয় কারণ দেশের মধ্যে মুদ্রাস্ফীতি। তাহার ফলে জিনিষপত্রের দাম বাড়িযাছে ও আমদানীর পরিমাণ বাড়িতেছে।

চতুর্থ কারণ, অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা কার্যকরী করার ফল। অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিবার জন্য প্রতি বৎসর বহু যন্ত্রপাতি আমদানী করিতে হইতেছে। ফলে আমদানী বাড়িয়াছে।

Q. 3. ***Give some ideas of distribution of India's foreign trade (a) by chief commodities, and (b) by principal countries*** (C. U., 1938, '53, '54, '59).

উঃ। নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলির **রপ্তানী ও আমদানী** করা হয়।

(ক) রপ্তানী ঃ—রপ্তানী দ্রব্যের অধিকাংশই হইল কাঁচামাল এবং খাদ্যদ্রব্য।

(১) **পাট এবং পাটজাত দ্রব্য** ঃ—মোট রপ্তানীর শতকরা ২৮ ভাগ মূল্যের পাট ও পাটজাত জিনিষ রপ্তানী হয়। ইংলণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া এবং আমেরিকা প্রভৃতি দেশে ইহা রপ্তানী হয়। বর্ত্তমানে অবশ্য কাঁচা পাট রপ্তানীর পরিমাণ খুব কম।

(২) **তুলা এবং তুলাজাত বস্ত্র**ঃ—মোট রপ্তানীর শতকরা ২৫ ভাগ মূল্যের তুলা ও বস্ত্র রপ্তানী হয়। ইহাদের প্রধান ক্রেতা অষ্ট্রেলিয়া, সিংহল, মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলি প্রভৃতি। তুলা রপ্তানীর পরিমাণও বর্ত্তমানে কম।

(৩) **খাদ্যশস্য**ঃ—বর্ত্তমানে অতি সামান্য পরিমাণে খাদ্যশস্য রপ্তানী হয়। চাল, গম, বার্লী প্রভৃতি খাদ্যশস্য ইংলণ্ড, সিংহল প্রভৃতি দেশে রপ্তানী হয়।

(৪) **তৈলবীজ**ঃ—মোট রপ্তানীর শতকরা ৮ ভাগ হইল তৈলবীজ। ইহাদের মধ্যে বাদাম, তিসি প্রভৃতি আছে। ইহাদের রপ্তানী করা হয় ইংলণ্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়াম এবং আমেরিকা প্রভৃতি দেশে।

(৫) **চামড়া**ঃ—ট্যান-করা ও ট্যান-না-করা চামড়া ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানী হয়। জার্ম্মানী এবং আমেরিকা ভারতবর্ষ হইতে কাঁচা চামড়া ক্রয় করে, আর ট্যান-করা চামড়া প্রধানতঃ ইংলণ্ডে রপ্তানী হয়।

(৬) এতদ্ব্যতীত ভারতবর্ষ **লোহা, খনিজ পদার্থ** প্রভৃতি রপ্তানী করে।

(খ) **আমদানী**ঃ—শিল্পজাত দ্রব্যই বেশী পরিমাণে আমদানী করা হয়।

(১) **তুলা ও বস্ত্র**ঃ—ইদানীং বস্ত্রের আমদানী হ্রাস পাইয়াছে। ইহার প্রধান কারণ ভারতবর্ষে নিজস্ব বস্ত্রশিল্পের উন্নতি এবং স্বদেশী আন্দোলন। আর একটি কারণ কৃষকদের ক্রয় করিবার ক্ষমতা হ্রাস। ফলে, তাহারা অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণে বস্ত্র ক্রয় করিতেছে। যে-পরিমাণ বস্ত্র ভারতবর্ষে আমদানী করা হইত, তাহার অধিকাংশই আসিত ইংলণ্ড হইতে। কিন্তু দেশের অভ্যন্তরে মোট উৎপন্নের তুলনায় এই আমদানীর পরিমাণ খুবই সামান্য। দেশবিভাগের পর হইতে তুলার আমদানী বাড়িয়াছে।

(২) **পশমজাত এবং রেশমজাত দ্রব্য**ঃ—পশমজাত দ্রব্যের অধিকাংশ সরবরাহ করে ইংলণ্ড ; তারপর জার্ম্মানী এবং জাপানের নাম করা

যাইতে পারে। জাপান, চীন এবং ইটালী হইতে অধিকাংশ রেশমজাত দ্রব্য আসে।

(৩) **ধাতু** ঃ—লৌহ এবং ইস্পাত, এলুমিনিয়াম, কাঁসা, তামা, জিঙ্ক প্রভৃতি ধাতু আমদানী করা হয়। ইহাদের অধিকাংশই সরবরাহ করে গ্রেট বৃটেন, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশ।

(৪) **কলকব্জা ও রেলের যন্ত্রপাতি** ঃ—ভারতবর্ষ বহু পরিমাণে যন্ত্রপাতি আমদানী করে। এই আমদানী অধিকাংশই আসে ইংলণ্ড হইতে। এতদ্ব্যতীত রেলপথ-নির্ম্মাণের উপযোগী যন্ত্রপাতি, বাষ্পীয় যান, শকট প্রভৃতি ও ছুরি, কাঁচি, প্রভৃতি যন্ত্রপাতি বহু আমদানী করা হয়। আমদানী দ্রব্যের মধ্যে ইহাই প্রথম স্থান অধিকার করে বলা যায়।

(৫) **চিনি** ঃ—প্রধানতঃ জাভা, মরিসিয়াস প্রভৃতি অঞ্চল হইতে চিনি আমদানী করা হইত। বর্ত্তমানে মাঝে মাঝে অল্প পরিমাণ চিনির আমদানী করিতে হইতেছে।

(৬) **মোটরগাড়ী** ঃ—অধিকাংশই সরবরাহ করে আমেরিকা, কানাডা, ও ইংলণ্ড।

(৭) এতদ্ব্যতীত ভারতবর্ষ **রাসায়নিক দ্রব্য, ঔষধপত্র এবং কলকব্জা, কাগজ, কাঁচ ও কাঁচনির্ম্মিত দ্রব্য, রং, মদ্যদ্রব্য,** প্রভৃতি আমদানী করে।

দেশগত বাণিজ্য ঃ—যে সকল দেশের সঙ্গে আমাদের বৈদেশিক কারবার আছে, তাহাদের মধ্যে ইংলণ্ডের অংশ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। ইদানীং গ্রেট বৃটেনের অংশ কিছু কমিয়াছে। এই হ্রাসের গতি বন্ধ করিবার জন্য অটোয়া চুক্তি করা হইয়াছিল। আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ইংলণ্ড বস্ত্র, ধাতু এবং খনিজ পদার্থ, রেলের যন্ত্রপাতি, লৌহজাত দ্রব্য, পশমীদ্রব্য প্রভৃতি ভারতবর্ষে রপ্তানী করে, এবং চা, চামড়া, পাট, কাঁচা তুলা

প্রভৃতি আমদানী করে। জাপান হইতে ভারতবর্ষে প্রধানতঃ বস্ত্র, লৌহদ্রব্য, কাঁচনির্ম্মিত বস্তু প্রভৃতি আমদানী হয় এবং জাপান আমাদের দেশ হইতে কাঁচা তুলা, পাট প্রভৃতি দ্রব্য ক্রয় করে।

জার্ম্মানী ভারতবর্ষকে রং, যন্ত্রপাতি, কাগজ, লৌহ এবং ইস্পাত-নির্ম্মিত দ্রব্য বিক্রয় করে এবং এই দেশ হইতে পাট, চামড়া, লাক্ষা প্রভৃতি ক্রয় করে।

আমেরিকা, ভারতবর্ষ হইতে পাট, চা, লাক্ষা প্রভৃতি ক্রয় করে, এবং কাঁচা তুলা, মোটরগাড়ী প্রভৃতি রপ্তানী করে।

অন্য যে সকল দেশের সঙ্গে ভারতবর্ষের কারবার আছে, তাহাদের মধ্যে ফ্রান্স, বেলজিয়াম, চীন, সিংহল, অষ্ট্রেলিয়া, বর্ম্মা ও পাকিস্তান প্রভৃতি আছে।

Q. 4. *What would you advocate for India, free trade or protection and why?* (C. U. 1939)

What are the principal industries which have been granted protection in India?

উঃ। ভারতবর্ষের প্রায় সকলেই সংরক্ষণ-নীতি-গ্রহণের পক্ষে যুক্তি দিয়া থাকেন। এই নীতির সপক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তি অবতারণা করা হয়।

(ক) **সংরক্ষণ-নীতি**ঃ—ভারতবর্ষের শিল্পোন্নতির জন্য সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বনের প্রয়োজন আছে। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। কিন্তু উৎপাদনের 'ক্রমিক হ্রাস আইন' অনুসারে চাষে বেশী লাভ হয় না। এতদ্ব্যতীত ভারতবর্ষ যতদিন পর্য্যন্ত চাষের উপর নির্ভর করিবে, ততদিন পর্য্যন্ত তাহাকে মৌসুমী বায়ুর দয়ার উপর নির্ভর করিতে হইবে এবং ফলে প্রায়ই অভাব এবং দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইবে। সুতরাং ভারতবর্ষে শিল্পোন্নতি আশু প্রয়োজন। সংরক্ষণ-নীতি শিল্পোন্নতির সহায়ক। এইজন্য সংরক্ষণ-নীতি গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

(খ) **শিশুশিল্পের যুক্তি**ঃ—দুইটি সমপরিমাণ উন্নত দেশের মধ্যে যখন অবাধ বাণিজ্য চলে, তখন উভয়ের পক্ষে তাহা মঙ্গলজনক হয়। কিন্তু যখন একটি দেশের শিল্প অতি উন্নত এবং অন্য দেশটি অত্যন্ত পশ্চাদ্‌পদ, তখন অবাধ বাণিজ্যের ফলে দ্বিতীয় দেশের শিল্পের ক্ষতি হইবে। কারণ অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল সবলের প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে পারিবে না। ভারতীয় শিল্প এখন শৈশব অবস্থায়, সুতরাং পাশ্চাত্ত্যের শক্তিশালী শিল্পের প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের শিশুশিল্পদিগকে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন।

(গ) **নানাবিধ শিল্প**ঃ—সংরক্ষণের সহায়তায় ভারতবর্ষে নানাবিধ শিল্পপ্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হইবে। শিল্পের এইরূপ সামগ্রিক উন্নতিবিধানের ফলে জনসাধারণের সর্ব্বপ্রকার গুণের বিকাশ হইবে। আবার, ইহার ফলে ভারতবর্ষ যতদূর সম্ভব স্বয়ংসম্পূর্ণ হইয়া গঠিত হইবে।

ভারতীয় রাজস্ব কমিশনের অনুমোদনক্রমে ভারতবর্ষে ১৯২৩ হইতে সংরক্ষণ-নীতির প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে ও নিম্নলিখিত শিল্পগুলিকে সংরক্ষণ করা হইয়াছে:—

(১) লৌহ এবং ইস্পাত-শিল্প, (২) কাগজ-শিল্প, (৩) দিয়াশলাই-শিল্প, (৪) চিনি-শিল্প (৫) বস্ত্র-শিল্প প্রভৃতি শিল্পকে সংরক্ষণ করা হইয়াছে।

অষ্টম অধ্যায়

ভারতের মুদ্রানীতি এবং ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থা

Q. 1. *Describe the present currency system in India.* **(C. U. 1954.)**

উঃ। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান প্রচলিত মুদ্রানীতিকে নিয়ন্ত্রিত মুদ্রানীতি বলা হয়। এই নীতি অনুযায়ী ভারতবর্ষে কেবলমাত্র রূপার টাকা এবং

কাগজী নোটের প্রচলন আছে। ৫ টাকা, ১০ টাকা ও ১০০ ও তদূর্দ্ধক টাকার নোট রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে চালু করা হয়। এই দেশে স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন নাই। কিন্তু যে-কেহ টাকার পরিবর্ত্তে একটা নির্দ্দিষ্ট হারে ষ্টার্লিং (বিলাতী মুদ্রা) বা ডলার বা অন্যান্য বিদেশী মুদ্রা পাইবে। অর্থাৎ ১৩ টাকা ৭ আনা দিলে লণ্ডনের এক পাউণ্ড দেওয়া হয়। লণ্ডনে ১ পাউণ্ড দিলে ভারতে ১৩ টাকা ৭ আনা দেওয়া হয়। কেবলমাত্র ষ্টার্লিং নহে, অন্যান্য দেশের মুদ্রার সঙ্গেও ভারতীয় মুদ্রার বিনিময় করা চলে। আন্তর্জ্জাতিক আর্থিক তহবিল (International Monetary Fund) প্রতিষ্ঠার সঙ্গে ভারতবর্ষে এই নীতি প্রচলিত হইয়াছে।

টাকা এবং কাগজী নোট উভয়ই নিদর্শক মুদ্রা (Token money) সরকার একটি টাকা ১৬ আনা দামের রূপা না দিয়া কম মূল্যের রূপার দ্বারা প্রস্তুত করে। টাকা ছাড়া আধুলি, সিকি, দুয়ানি প্রভৃতি মুদ্রাও আছে।

Q. 2. *Describe the present system of the issue of paper currency.*

উঃ। ১৮৬১ সাল হইতে সরকার এই দেশে কাগজী নোটের প্রচলন করিয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমানে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কাগজী মুদ্রা চালু করে। ২ টাকা, ৫ টাকা, ১০ টাকা, ১০০ টাকা ও ১০০০ টাকা মূল্যের কাগজী মুদ্রার প্রচলন করা হইয়াছে; এই সকল কাগজী মুদ্রার পরিবর্ত্তে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক টাকা দিতে বাধ্য। রিজার্ভ ব্যাঙ্কে এইজন্য কিছু সোনা এবং বিদেশী মুদ্রা যেমন ষ্টার্লিং, ডলার, টাকা জমা রাখিতে হয়। বাকী অংশের জন্য তহবিলে টাকা বা কোম্পানীর কাগজ অথবা হুণ্ডি রাখিতে হইবে। তহবিলে রক্ষিত সোনার পরিমাণ কখনও ১১২ কোটি টাকার কম হইবে না। আর মোট বিদেশী ঋণপত্রের পরিমাণ ২০০ কোটি টাকার কম হইবে না।

Q. 3. *Give an account of principal types of banks in India.* (C. U. 1936, '53 ; '58 ; U. P. 1936.)

উঃ। ভারতবর্ষে নিম্নলিখিত ব্যাঙ্ক আছে :—(১) ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, (২) ষ্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া, (৩) যৌথ মূলধন ব্যাঙ্ক, (৩) বিনিময় ব্যাঙ্ক, (৫) দেশীয় ব্যাঙ্ক এবং (৬) সমবায় ব্যাঙ্ক।

(১) ১৯৩৫ সালে **ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের** প্রতিষ্ঠা হয়। ব্যাঙ্কের মূলধন ৫ কোটি টাকা। ব্যাঙ্কের পরিচালনার ভার একটি পরিচালক সভার হস্তে ন্যস্ত। সরকার কর্তৃক মনোনীত একজন গভর্ণর, দুইজন সহকারী গভর্ণর, এবং সরকার কর্তৃক মনোনীত ৮ জন পরিচালক লইয়া এই পরিচালক-সভা গঠিত। কাগজী মুদ্রা চালু করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে দেওয়া আছে। সরকারের তহবিল রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট জমা আছে। টাকার বাজার নিয়ন্ত্রণ করা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রধান কাজ।

(২) **ষ্টেট ব্যাঙ্কের** পূর্ব্বের নাম ছিল ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক। ইহার প্রতিষ্ঠা হয় ১৯২১ সালে। তিনটি প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্ক মিলিযা এই ব্যাঙ্ক গঠিত হইয়াছিল। ১৯৩৪ সাল পর্য্যন্ত ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে সরকারী তহবিল জমা থাকিত, বর্ত্তমানে অবশ্য থাকে না। এই ব্যাঙ্ক সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কের কাজ (যেমন, আমানত লওযা, টাকা ধার দেওয়া প্রভৃতি) করে। ভারতের সর্ব্বত্র ইহার শাখা আছে। ১৯৫৫ সাল হইতে এই ব্যাঙ্ককে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হইয়াছে ও ইহার নাম হইয়াছে **ষ্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া।**

(৩) **যৌথ মুলধনী ব্যাঙ্কগুলি** ভারতীয় কোম্পানী আইন অনুসারে রেজেষ্ট্রীকৃত প্রতিষ্ঠান। ইহাদের কাজ জনসাধারণের নিকট হইতে আমানত গ্রহণ করা, ব্যবসায়িগণকে ঋণদান, হুণ্ডি ক্রয়-বিক্রয় করা প্রভৃতি।

(৪) যে সকল বড় বিদেশী ব্যাঙ্ক প্রধানতঃ বৈদেশিক বাণিজ্যের টাকার লেনদেন করে, তাহাদের **বিনিময় ব্যাঙ্ক** বলা হয়। এই সকল ব্যাঙ্ক জনসাধারণের নিকট হইতে আমানত গ্রহণ করে এবং দেশের অন্তর্ব্বাণিজ্যের জন্য অর্থ বিনিয়োগ করে।

(৫) আমাদের দেশের সাহুকর, বেনিয়া ও মহাজনকে **দেশীয় ব্যাঙ্ক** আখ্যা দেওয়া হয়। ইহাদের প্রধান কাজ কৃষকগণকে ঋণ দেওয়া ও দেশের অন্তর্বাণিজ্যে অর্থ যোগান দেওয়া। ইহারা প্রাচীন পদ্ধতিতে ব্যবসায় করে, এবং খুব উচ্চ হারে সুদ আদায় করে।

(৬) **সমবায় ব্যাঙ্ক** ঃ—সমবায় ঋণদান-সমিতি, কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্ক তাহাদের সভ্যগণের টাকা জমা রাখে ও ধার দেয়।

ভারত সরকারও কিঞ্চিৎ পরিমাণে ব্যাঙ্কিং-এর কাজ করে। ভারত সরকার দেশের সর্ব্বত্র পোষ্টাল সেভিংস ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। এই সকল ব্যাঙ্কে জনসাধারণ টাকা জমা রাখে। সরকার চাষীগণের অভাবের সময় কৃষিঋণ দেয়।

এই দেশে নানাপ্রকারের ব্যাঙ্ক আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু দেশের প্রয়োজন ও লোকসংখ্যার তুলনায় ব্যাঙ্কের সংখ্যা খুব অল্প। ভারতবর্ষে মাথাপিছু আমানতের পরিমাণ খুব সামান্য। ভারতবর্ষের তুলনায় জাপান একটি ক্ষুদ্র দেশ, অথচ জাপানে ভারতবর্ষ অপেক্ষা অধিকসংখ্যক ব্যাঙ্ক আছে।

Q. 4. *Give an account of the functions of the Reserve Bank of India.* (C. U. 1944, '48, '51 ; U. P. 1937.)

উঃ। ১৯৩৫ সালে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আমাদের দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক। এইজন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হস্তে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কার্য্যভার ন্যস্ত আছে। প্রথমতঃ, কাগজী মুদ্রা চালু করিবার একমাত্র অধিকারী রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। এই উদ্দেশ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে ১১২ কোটি টাকা মূল্যের সোনা ও ৪০০ কোটি টাকা মূল্যের বিদেশী ঋণপত্র জমা রাখিতে হয়। অবশিষ্ট টাকা, সরকারী ঋণপত্র প্রভৃতিতে রাখিলেই

চলে। দ্বিতীয়তঃ, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সরকারের ব্যাঙ্কার। কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকার তাহাদের টাকা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট জমা রাখে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কোন আমানতের উপর সুদ দেয় না। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অল্প মেয়াদে সরকারকে টাকা ধার দেয়। সরকারী ঋণ পরিচালনা করিবার ভার ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হস্তে ন্যস্ত। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সরকারের তরফ হইতে ঋণপত্র বিক্রয় করিয়া নির্দ্দিষ্ট তারিখে ঋণ পরিশোধ করে। তৃতীয়তঃ, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দেশের অন্যান্য যৌথ মূলধনী ব্যাঙ্কসমূহের ব্যাঙ্কারের কাজও করে। যে সকল ব্যাঙ্কের স্থায়ী মূলধন এবং সংরক্ষিত তহবিলের মোট পরিমাণ অন্ততঃপক্ষে ৫ লক্ষ টাকা, তাহাদের বলা হয় "রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ক" (Scheduled Bank)। এই সকল তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ককে তাহাদের চল্‌তি (Current Account) ও স্থায়ী আমানতের শতকরা ৩ ভাগ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট জমা রাখিতে হয়। তৎপরিবর্ত্তে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ইহাদের অভাবের সময় নগদ টাকা ধার দেয়। চতুর্থতঃ, টাকার সঙ্গে ষ্টার্লিং-এর বিনিময়মূল্য ঠিক রাখিবার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতি টাকা ১ শি. ৬ পেনি মূল্যে এবং এই উদ্দেশ্যে অন্যান্য বিদেশী মুদ্রা নির্দ্দিষ্ট হারে ক্রয়-বিক্রয় করে। পঞ্চমতঃ, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক চেক-বিনিময় কেন্দ্রের কাজ করে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের একটি **'কৃষিঋণ'** বিভাগ আছে। এই বিভাগের কার্য্য, কি উপায়ে কৃষিঋণ-ব্যবস্থার উন্নতি করিতে পারা যায়, সে সম্বন্ধে গবেষণা করা।

নবম অধ্যায়

সরকারী রাজস্বনীতি

Q. 1. *Describe the sources of revenue and the heads of expenditure of the Government of India.* (C. U. 1927, '28, '36, '42, '46, '55. 59.)

Indicate the relative importance of these sources. (C. U. 1942,'59.)

উঃ। নূতন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী ভারত সরকার নিম্নলিখিত উৎস হইতে রাজস্ব আহরণ করে।

(১) **আমদানী এবং রপ্তানী-শুল্ক** ঃ—বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে আনীত প্রায় প্রত্যেকটি জিনিষের উপর আমদানী-শুল্ক ধার্য্য আছে। পাট, চা প্রভৃতি দ্রব্যের উপর রপ্তানী-শুল্ক ধার্য্য আছে। কেন্দ্রীয় সরকার এই রপ্তানী-শুল্কের সমস্তটাই অথবা, একটি অংশ রাজ্যসরকারগুলিকে দিতে পারে। পূর্ব্বে পাট-রপ্তানী-শুল্কের শতকরা ৬২½ ভাগ উৎপাদনকারী রাজ্যগুলিকে, অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, উড়িষ্যা ও বিহারকে দেওয়া হইত। বর্ত্তমানে ইহার পরিবর্ত্তে ভারত সরকার এই চারিটি রাজ্যসরকারকে নির্দ্দিষ্ট অর্থ সাহায্য করে। ১৯৬৩-৬৪ সালে এই উৎস হইতে ৩০৮·৫৯ কোটি টাকা আদায় হইবে।

(২) **উৎপাদন শুল্ক** ঃ—দিয়াশলাই, চিনি, তামাক, বনস্পতি, চা, সুপারি প্রভৃতি ভারতবর্ষজাত দ্রব্যের উপর এই শুল্ক বসান আছে। আদায়ীকৃত শুল্কের সমস্তটা অথবা একটি অংশ কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যসরকারগুলির মধ্যে বিতরণ করিতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমানে তামাক প্রভৃতি কয়েকটি

দ্রব্যের উপর ধার্য্য উৎপাদন-শুল্কের শতকরা ৪০ অংশ রাজ্যগুলির মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়।

১৯৬৩-৬৪ সালে এই শুল্ক হইতে আদায়ীকৃত আনুমানিক অর্থের পরিমাণ মোট ৫৬২'৫০ কোটি টাকা হইবে।

(৩) **রেলের উদ্বৃত্ত অর্থ** :—ভারতবর্ষের রেল-চলাচল ব্যবস্থার মোট লাভের একটি অংশ কেন্দ্রীয় সরকার পায়। ১৯৬৩-৬৪ সালে এই বাবদ কেন্দ্রীয় সরকারের আয় মোট ২৪'১৫ কোটি টাকা।

(৪) **রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও মুদ্রা-প্রস্তুতের লভ্যাংশ** :—ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মোট লাভ এবং মুদ্রা প্রস্তুত করিয়া যে লাভ হয়, তাহা কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিলে জমা হয়। ১৯৬৩-৬৪ সালে এই বাবদ ৫৬'৪৩ কোটি টাকা আদায় হইবে।

(৫) **আয়কর** :—লোকের ও কোম্পানীর আয়ের উপর আয়কর ধার্য্য করা হয়। বর্তমানে যাহাদের বাৎসরিক আয় ৩,০০০ টাকার বেশী তাহাদের আয়কর দিতে হয়। কোম্পানীগুলির লভ্যাংশের উপর যে আয়কর ধার্য্য আছে তাহার সমস্ত অংশই কেন্দ্রীয় সরকার পায়। ব্যক্তিগত আয়করের অনধিক শতকরা ৬০ ভাগ কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যসরকারগুলির মধ্যে ভাগ করিয়া দেয়। ১৯৬৩-৬৪ সালে আয়কর হইতে মোট আদায়ীকৃত অর্থের পরিমাণ ২১৮'০ কোটি টাকা হইবে।

(৬) **ডাক ও টেলিগ্রাফ** :—১৯৬৩-৬৪ সালে এই বিভাগ হইতে আনুমানিক আয় মোট ১১১ লক্ষ টাকা হইবে।

ভারত সরকারের মোট বাৎসরিক রাজস্বের পরিমাণ ১৬৯৬'৯১ কোটি টাকা।

কেন্দ্রীয় সরকার নিম্নলিখিতভাবে রাজস্ব ব্যয় করে :—

(১) **সামরিক ব্যয়বরাদ্দ** :—১৯৬৩-৬৪ সালে সামরিক ব্যয়ের পরিমাণ মোট ৭০৮'৫১ কোটি টাকা হইবে।

(২) **ঋণ পরিশোধ**ঃ—সরকারী ঋণের উপর প্রত্যেক বৎসর একটি মোটা টাকা সুদ ও আসল-বাবদ দিতে হয়।

(৩) **বেসামরিক ব্যয়বরাদ্দ**ঃ—বিভিন্ন দপ্তরের ব্যয়-বাবদ বৎসরে প্রায় ১১২'১১ কোটি টাকা খরচ হয়।

(৪) **উন্নয়ন কার্য্যের ব্যয়**ঃ—বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা বাবদ ১৯৬১-৬২ সালে মোট ১৮৬'০১ কোটি টাকা ব্যয় করা হইবে।

ভারত সরকারের মোট ব্যয়ের পরিমাণ ১৯৬৩-৬৪ সালে ১৬৯৭'৬৮ কোটি টাকা হইবে।

Q. 2. *Discuss the sources of revenue and the heads of expenditure of the States.* (C. U. 1926, '29, '57, '42, '52)

উঃ। রাজ্যসরকার নিম্নলিখিত উপায়ে রাজস্ব সংগ্রহ করে :—

(১) **ভূমি-রাজস্ব**ঃ—জমিদার ও প্রজাকে জমি-বাবদ সরকারী খাজনা দিতে হয়। বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন ব্যবস্থায় এই খাজনা আদায় হয়। পশ্চিমবঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জন্য ভূমি-রাজস্বের পরিমাণ অত্যন্ত কম। মোট আদায়ীকৃত রাজস্বের পরিমাণ প্রায় দুই কোটি টাকা। অথচ জমিদারগণ প্রজাদের নিকট হইতে প্রায় ইহার চতুর্গুণ অর্থ আদায় করিতেন। পশ্চিমবঙ্গে ও আসামে ভূমি-রাজস্বের পরিমাণ যথাক্রমে মোট ৮'৬৯ কোটি ও ৪'২০ কোটি টাকা।

(২) **আবগারী-শুল্ক**ঃ—মদ এবং অন্যান্য মাদকদ্রব্য এবং ঔষধপত্র উৎপাদন ও বিক্রয়ের উপর যে শুল্ক বসান হয়, তাহাকে আবগারী-শুল্ক বলা হয়। সরকারের মাদকদ্রব্য-বর্জ্জনের প্রস্তাব কার্য্যকরা হইলে, এই বাবদ আদায়ীকৃত রাজস্বের পরিমাণ কমিয়া যাইবে। পশ্চিমবঙ্গে আবগারী বিভাগ হইতে মোট আয় প্রায় ৭'২৭ কোটি টাকা এবং আসাম রাজ্যে মোট ১'৯৬ কোটি টাকা আদায় হয়।

(৩) **সরকারী ষ্ট্যাম্প ঃ**—এক্সচেঞ্জ বিল প্রভৃতি ব্যবসায়-বাণিজ্য-সম্পর্কিত দলিলের উপর এই কর ধার্য্য করা হয়। মোকদ্দমাকারী আদালতে যে ফী দেয় তাহাও এই শুল্কের অন্তর্ভুক্ত। পশ্চিমবঙ্গে এই বাবদ আদায়ীকৃত অর্থের পরিমাণ ছিল মোট ৬'৩৪ কোটি টাকা ও আসামে ৬৬ লক্ষ টাকা।

(৪) **বনবিভাগ ঃ**—সরকারী বনবিভাগের অন্তর্গত কাঠ ও অন্যান্য বনজাত দ্রব্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থ সরকারী রাজস্বে জমা হয়। পশ্চিমবঙ্গে বনবিভাগের মোট রাজস্বের পরিমাণ ও আসামে ১১৪ লক্ষ টাকা।

(৫) **রেজেষ্ট্রী বিভাগ ঃ**—সর্ব্বপ্রকার দলিল রেজেষ্ট্রী করার জন্য সরকার একটি শুল্ক আদায় করে। পশ্চিমবঙ্গে এই সেরেস্তায় মোট আয় ছিল ৫০ লক্ষ টাকা।

(৬) **সেচবিভাগ ঃ**—সেচের খাল হইতে জল লইলে চাষীদের কর দিতে হয়। এই করের হার ও পরিমাণ বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন রকমের। পশ্চিমবঙ্গে সেচকার্য্যের স্বল্পতার জন্য এই বিভাগ হইতে মোট আয়ের পরিমাণ কম হয়।

(৭) **আয়করের একটি অংশ ঃ**—রাজ্য সরকার ব্যক্তিগত আয়কর বাবদ অনধিক শতকরা ৬০ ভাগের অধিকারী। পশ্চিমবঙ্গ এই বাবদ প্রায় ১১'৮৫ কোটি ও আসাম ২'৩৯ কোটি টাকা পায়।

(৮) **পাট-রপ্তানী-শুল্ক ঃ**—পূর্ব্বে পাট-রপ্তানী-শুল্কের শতকরা ৬২½ ভাগ পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার প্রভৃতি পাট-উৎপাদনকারী রাজ্যগুলির মধ্যে ভাগ করা হইত। বর্ত্তমানে ভারত সরকার এই রাজ্যগুলিকে নির্দ্দিষ্ট অর্থ দেয়। পশ্চিমবঙ্গ এই বাবদ মোট ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা পাইতেছে।

(৯) **আমোদ-প্রমোদ, জুয়াখেলা, বিদ্যুৎসরবরাহ প্রভৃতির উপর কর ঃ**—থিয়েটার, সিনেমা এবং অন্যান্য আমোদ-প্রমোদে যোগদানকারী ব্যক্তিদের, জুয়ারীদের এবং বৈদ্যুতিকপ্রবাহ-ব্যবহারকারীদের উপর রাজ্য সরকার কর ধার্য্য করে।

(১০) **বিক্রয়-কর** :—প্রত্যেক রাজ্যে, বিক্রীত জিনিষের উপর কর ধার্য্য করা হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে এই বিক্রয়-করের হার টাকা প্রতি তিন পয়সা। এই বিক্রয়-করের মোট লভ্য অর্থের পরিমাণ ২১ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা। আসামে এই বাবদ ২'১৭ কোটি টাকা আদায় হইবে।

(১১) **কৃষি-আয়কর** :—পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার এবং মাদ্রাজে কৃষি-আয়ের উপর কর ধার্য্য করা হইয়াছে।

প্রধান প্রধান ব্যয়ের বিষয়

(১) **পুলিশ বিভাগ** :—পশ্চিমবঙ্গে পুলিশ বিভাগের জন্য মোট ব্যয়ের পরিমাণ ৪'৩৯ কোটি টাকা। রাজ্যের রাজস্বের তুলনায় এই ব্যয়ের পরিমাণ অধিক সন্দেহ নাই।

(২) **বিচার ও কারাবিভাগ** :—পশ্চিমবঙ্গে এই খাতে মোট ব্যয়ের পরিমাণ প্রায় আড়াই কোটি টাকা।

(৩) **সাধারণ শাসনব্যবস্থা** :—রাজ্যের রাজস্বের একটি প্রধান অংশ এই বাবদ ব্যয় করা হয়। এই তিনটি খাতে ব্যয়ের অঙ্ক কমান উচিত, এবং তাহা করিতে হইলে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের বেতনের হার কমাইয়া দিতে হইবে।

(৪) **শিক্ষা** :—শিক্ষাপ্রচার বাবদ রাজ্য সরকারের ব্যয়ের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় সামান্যই। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্ত্তন করিলে শিক্ষার জন্য ব্যয়ের পরিমাণও বৃদ্ধি পাইবে।

(৫) **কৃষি ও শিল্প** :—কৃষি ও শিল্প বিভাগে মোট ব্যয়ের পরিমাণ প্রায় ২৩৫ লক্ষ টাকা। বলা বাহুল্য, এই ব্যয়ের পরিমাণ বহুলাংশে বৃদ্ধি করা উচিত।

(৬) **জন-স্বাস্থ্য ও হাসপাতাল** :—এই বাবদ ব্যয়ের পরিমাণ নিতান্তই যৎসামান্য।

(৭) **সমবায় আন্দোলন**ঃ—বলা বাহুল্য, এই বিভাগটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিভাগ। অথচ প্রয়োজনের তুলনায় ব্যয়ের পরিমাণ সামান্যই।

রাজ্য সরকারের বিভিন্ন ব্যয়বরাদ্দের আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, পুলিশ ও সাধারণ শাসনব্যবস্থায় রাজ্যের মোট ব্যয়ের একটা বিরাট অংশ চলিয়া যায়। বলা বাহুল্য, এই দুইটি বিভাগের ব্যয়ের পরিমাণ কমাইয়া দিয়া জাতি গঠনের বিভাগগুলির জন্য আরও অধিক ব্যয় করা উচিত।

Q. 3. *Give an account of the Public Debt in India.* (C. U. 1944, '54)

উঃ। প্রায় প্রত্যেক সরকারকে ঋণ গ্রহণ করিতে হয়। ভারত সরকারও জনসাধারণের নিকট হইতে প্রচুর ঋণ গ্রহণ করিয়াছে। এই ঋণ 'সরকারী ঋণ' বলিয়া খ্যাত। প্রথমে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতের বিভিন্ন অংশ জয় করিবার জন্য ও পরে ভারত সরকার অন্যান্য কারণে এই ঋণ গ্রহণ করে। রেলপথ ও জলসেচের খাল খনন করিবার জন্য ভারত সরকার অনেক ঋণ করিয়াছে। প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার জন্যও ভারত সরকারকে অনেক ঋণ গ্রহণ করিতে হইযাছে। ১৯৪৫ সালের মার্চ্চ মাসের শেষে মোট ঋণের পরিমাণ ১৬০৯ কোটি টাকা ছিল। গত যুদ্ধের পূর্ব্বে মোট সরকারী ঋণের পরিমাণ ছিল ১১৫৮ কোটি টাকা। সেই সময় মোট ষ্টার্লিং ঋণের পরিমাণ (অর্থাৎ বিলাতী ঋণ) এবং রেলপথ নির্ম্মাণের জন্য ঋণের উপর বার্ষিক দেয় অর্থের পরিমাণ ৪৪৫ কোটি টাকা ছিল। গতযুদ্ধের মধ্যে ভারত সরকার এই সমস্ত ষ্টার্লিং দেনা শোধ করিয়া দিয়াছে। ১৯৪৫ সালের শেষে এই ষ্টার্লিং ঋণের পরিমাণ মাত্র ৩৭ কোটি টাকায় পরিণত হয়। আমরা আমাদের বিদেশী ঋণ পরিশোধ করিতে পারিয়াছি। বর্ত্তমানে আমাদের সরকারী ঋণের অধিকাংশ ভারতে গৃহীত ঋণ। গতযুদ্ধের পূর্ব্বে যে অবস্থা ছিল তাহার সঙ্গে তুলনা করিলে বর্ত্তমান অবস্থা সন্তোষজনক বলিয়া মনে হয়। আর একটি ভালকথা এই যে, ভারত সরকারের ঋণের অধিকাংশ উৎপাদনশীল

ঋণ (Productive debt); অর্থাৎ অধিকাংশ ঋণের অর্থ উৎপাদনশীল কার্য্যের জন্য ব্যয় হইয়াছে। মোট ঋণের মাত্র ৩৭৫ কোটি টাকা অনুৎপাদক ঋণ-পর্য্যায়ভুক্ত, অর্থাৎ এই পরিমাণ ঋণের অর্থ যুদ্ধের জন্য ব্যয় করা হইয়াছে। সরকারী ঋণ বিভিন্ন উপায়ে গ্রহণ করা হইয়াছে। দেশরক্ষা বণ্ড প্রভৃতি কতকগুলি ঋণ, দীর্ঘকালের জন্য গ্রহণ করা হইয়াছে, দীর্ঘমেয়াদী ঋণ (Funded debt) এই পর্য্যায়ভুক্ত। কিয়দংশ আবার স্বল্পমেয়াদী ঋণ পর্য্যায়ভুক্ত, যেমন, সরকারী হুণ্ডি (Treasury Bill)। সরকারী হুণ্ডির টাকা তিনমাস পরে দেয়।

দশম অধ্যায়

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

Q. 1. *Summarise the main provisions of First Five-year Plan in India.* (C. U. 1954)

উঃ। সাধারণতঃ কোন্ কোন্ শিল্প প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে তাহা ব্যবসায়ীরা নিজেদের সুবিধা ও লাভের হিসাব করিয়া ঠিক করে। তাহার ফলে হয়ত কোন কোন অপ্রয়োজনীয় শিল্পের বিশেষ প্রসার হয় ও প্রয়োজনীয় শিল্পের উৎপাদন কম হয়। সুতরাং একই সঙ্গে প্রয়োজনীয় সমস্ত শিল্পের উপযুক্ত প্রসারের জন্য একটি বিশেষ পরিকল্পনা গঠন করা সম্বন্ধে অনেকেই মত প্রকাশ করিয়াছেন। ভারতবর্ষেও কিছুদিন হইতে এইরূপ একটি অর্থনৈতিক পরিকল্পনা-গঠনের কথা অনেকেই বলিতেছেন। ১৯৫০ সালে ভারত গভর্ণমেণ্ট একটি পরিকল্পনা-কমিশন গঠন করেন ও এই কমিশন প্রথমে একটি খসড়া পরিকল্পনা প্রকাশ করে এবং সে সম্বন্ধে জনসাধারণের মতামত জানিতে চাহে।

পরে ১৯৫২ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রথম পঞ্চবার্ষিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনা চূড়ান্ত আকারে প্রকাশ করা হইয়াছে।

এই পরিকল্পনায় ১৯৫০-৫১ সাল হইতে ১৯৫৫-৫৬—এই পাঁচ বৎসরে কোন্ কোন্ শিল্পে কত টাকা ব্যয় করা হইবে ও কত দ্রব্য উৎপাদন করা হইবে ইহার একটি তালিকা দেওয়া হইয়াছে। এই পাঁচ বৎসরে সর্ব্বশুদ্ধ মোট ২০৬৯ কোটি টাকা ব্যয় করা হইবে। ইহার মধ্যে কৃষিকার্য্যে ও গ্রামোন্নতিকল্পেই বেশী টাকা ব্যয় করা হইবে। ২০৬৯ কোটি টাকা নিম্নলিখিত খাতে ব্যয়ের ব্যবস্থা হইয়াছে।

	ব্যয়ের পরিমাণ	মোট ব্যয়ের শতকরা অংশ
কৃষি উন্নয়ন—	৩৬১ কোটি	১৭.৫
জলসেচ—	১৬৮ "	৮.১
জলসেচ ও বিদ্যুৎ-উৎপাদন—	২৯৩ "	১৯.০
যানবাহন—	৪৯৭ "	২৪.০
শিল্প—	১৭৩ "	৮.৪
সমাজসেবা—	৩৪০ "	১৬.৪
পুনর্ব্বাসন—	৮৫ "	৪.১
বিবিধ—	৫২ "	২.৫
	২০৬৯ কোটি	১০০

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, কৃষির উন্নতি ও জলসেচ প্রভৃতির জন্য মোট অর্থের ৪৪.৬ অংশ ব্যয় করা হইবে। কমিশন আশা করিয়াছেন যে, এই অর্থ-ব্যয়ের পর খাদ্যশস্যের উৎপাদন ৫২৭ লক্ষ টন হইতে বাড়িয়া ৬১৬ লক্ষ টন হইবে; তুলার উৎপাদন ২৯.৭ লক্ষ গাঁইট হইতে ৪২.৪২ লক্ষ গাঁইট হইবে; পাটের উৎপাদন ৩৩.০ লক্ষ গাঁইট হইতে ৫৩.১ লক্ষ গাঁইট হইবে।

বর্ত্তমানে প্রায় ৫০০ লক্ষ একর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা আছে। তাহা বাড়িয়া ১১২০ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ করা হইবে।

শিল্পোন্নতিতে অবশ্য বেশী অর্থ ব্যয় করার ব্যবস্থা নাই। ইহা ব্যতীত রাস্তাঘাটের উন্নতি করা হইবে। গ্রামে গ্রামে প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা বাড়ান হইবে। হাসপাতালের সংখ্যা বাড়ান হইবে। গৃহ-নির্ম্মাণ বাবদ ৪৮ কোটি টাকা ব্যয় করা হইবে। ম্যালেরিয়া-নিয়ন্ত্রণ, পানীয় জল সরবরাহ, প্রসূতি ও শিশুদের স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা প্রভৃতির জন্যও অর্থব্যয় করা হইবে।

পাঁচ বৎসরে যদি এই হারে অর্থব্যয় করা হয়, তবে জাতীয় আয় শতকরা ১১ ভাগ বাড়িবে ও ২৭ বৎসরের মধ্যে জনপ্রতি জাতীয় আয় দ্বিগুণ হইবে। অর্থাৎ বর্ত্তমানে জনপ্রতি জাতীয় আয়ের পরিমাণ ২৫৫ টাকার স্থলে ২৭ বৎসর পরে ৫১০ টাকা হইবে।

এই টাকা কোথা হইতে আসিবে? কমিশন তাহার একটি তালিকাও দিয়াছেন। প্রতি বৎসরে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলি তাহাদের আয় অপেক্ষা কম টাকা ব্যয় করিয়া কিছু কিছু উদ্বৃত্ত রাজস্ব সঞ্চয় করিবে। এই উদ্বৃত্ত রাজস্ব হইতে পাঁচ বৎসরে মোট ৭৩৮ কোটি টাকা পাওয়া যাইতে পারে। জনসাধারণের নিকট হইতে নানাভাবে ঋণ লইয়া মোট ৫২০ কোটি টাকা সংগ্রহ করা হইবে। আমেরিকা, ইংলণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশ হইতে আমরা আজ পর্য্যন্ত মোট ১৫৬ কোটি টাকা পাইয়াছি। এই তিন খাতে ১৪১৪ কোটি টাকা পাওয়া যাইবে। বাকী ৬৫৬ কোটি টাকা ঘাটতি হয়। এই ঘাটতি বৈদেশিক সাহায্যে, কর-বৃদ্ধি বা ঋণ করিয়া মিটাইতে হইবে। ইহার মধ্যে হয়ত ২৯০ কোটি টাকার নোট ছাপিয়া বাজারে চালু করা প্রয়োজন হইতে পারে।

• •

পরিকল্পনাটিতে কৃষিকার্য্য ও গ্রামোন্নয়নের দিকে যে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে তাহা ন্যায়সঙ্গত। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। দেশের মোট

জনসংখ্যার শতকরা ৬৯ ভাগই কৃষির উপর নির্ভরশীল। সুতরাং কৃষির উন্নতির দিকেই বেশী দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া শিল্পোন্নতির দিকে কম দৃষ্টি দিলে চলিবে না। কারণ, শিল্পোন্নয়ন ব্যতীত কৃষির সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সম্ভব নহে। শিল্পোন্নতি না হইলে জমির উপর নির্ভরশীল জনসংখ্যার পরিমাণ কমিবে না ও লক্ষ লক্ষ বেকারের কর্ম্মসংস্থানেরও ব্যবস্থা হইবে না। সুতরাং শিল্পে আরও বেশী টাকা বিনিয়োগের ব্যবস্থা করা উচিত ছিল।

কোন পরিকল্পনাই গণ-সহযোগিতা ব্যতীত সফল হইতে পারে না। কমিশন যে পরিকল্পনা করিয়াছেন তাহার ফলে জাতীয় আয় আপাততঃ খুব সামান্যই বাড়িবে। এই অবস্থায়, জনগণের শ্রম ও উদ্যম বর্ত্তমান পরিকল্পনায় কাজে লাগাইবার সম্ভাবনা খুবই কম বলিয়া মনে হয়।

Q. 2. *Discuss the principal features of the Community Development Projects.* (C. U. 1958)

উঃ। খসড়া পরিকল্পনায় গ্রামোন্নতির জন্য "কমিউনিটি প্রোজেক্ট" নামে কতকগুলি বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা বলা হইয়াছিল। কমিউনিটি প্রোজেক্টের অর্থ হইতেছে যে, কতকগুলি গ্রামকে কেন্দ্র করিয়া গ্রামবাসীদের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি বিধানের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থাই করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে, গ্রামে গ্রামে শিক্ষাবিস্তারের ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যোন্নতির ব্যবস্থা, খাদ্য-দ্রব্য ও অন্যান্য ফসলের উৎপাদনবৃদ্ধির ব্যবস্থা একই সঙ্গে করিতে হইবে।

প্রায় ৩০০ গ্রাম লইয়া এক একটি প্রোজেক্ট গঠন করা হইবে। গ্রামগুলিতে প্রায় ২ লক্ষ লোক ও মোট দেড় লক্ষ একর কর্ষিত জমি থাকিবে। প্রত্যেক প্রোজেক্ট-অঞ্চলকে আবার তিনটি উন্নয়ন কেন্দ্র বা ডেভালপমেন্ট ব্লকে ভাগ করা হইবে। এক একটি কেন্দ্রে ১০০ গ্রাম ও প্রায় ৬৫ হাজার লোক থাকিবে।

উন্নয়ন কেন্দ্রগুলিকে আবার ১৫ হইতে ২৫টি গ্রাম লইয়া কতকগুলি ইউনিটে ভাগ করা হইবে। সুতরাং ১৫ হইতে ২৫টি গ্রাম লইয়া মণ্ডী-ইউনিট থাকিবে। চার হইতে পাঁচটি মণ্ডী-ইউনিট লইয়া একটি উন্নয়ন-কেন্দ্র গঠিত হইবে ও তিনটি উন্নয়ন-কেন্দ্র লইয়া একটি প্রোজেক্ট-এরিয়া থাকিবে। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে মোট ৫৫টি প্রোজেক্ট-এরিয়া খোলা হইয়াছে। ইহাদের কাজ ভাল হইতেছে দেখিলে ক্রমে ক্রমে প্রোজেক্টের সংখ্যা বাড়ান হইবে। পশ্চিমবঙ্গে মোট ৮টি উন্নয়ন-কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। তাহার মধ্যে বীরভূমে তিনটি, বর্দ্ধমানে দুইটি, এবং ২৪-পরগণা, মেদিনীপুর ও নদীয়া জেলায় একটি করিয়া কেন্দ্র আছে।

প্রত্যেক গ্রামে অন্ততঃ দুইটি নলকূপ বা পুকুর বা অন্ততঃ ২টি ইন্দারা থাকিবে। প্রাথমিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হইবে ও রাস্তাঘাটের উন্নতি করা হইবে। প্রত্যেক মণ্ডীতে অন্ততঃ একটি মাধ্যমিক স্কুল, পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ অফিস, ছোট্ট ডিসপেন্সারী, বাজার, কুটিরশিল্পের কেন্দ্র, ফসল রাখিবার গুদাম প্রভৃতি থাকিবে। ইহা ছাড়া, প্রত্যেক উন্নয়ন-কেন্দ্রে কৃষি-স্কুল, গরু-বাছুরের হাসপাতাল, বিদ্যুৎ প্রভৃতি থাকিবে। প্রত্যেক প্রোজেক্ট-এরিয়াতে একটি ছোট শহর থাকিবে ও সেখানে শহরের সমস্ত সুবিধাই পাওয়া যাইবে। সেখানে স্কুল, আদালত, কল ও ট্রাক্টর মেরামতি কারখানা, ডেয়ারী, পশুপালন কেন্দ্র প্রভৃতি থাকিবে। প্রত্যেক প্রোজেক্টের জন্য ৬৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। ইহার মধ্যে আমেরিকা প্রায় ৬ লক্ষ টাকা সাহায্য করিবে। বাকী টাকা কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার ব্যয় করিবে।

ঠিকমত করিতে পারিলে কমিউনিটি প্রোজেক্ট দ্বারা যে গ্রামোন্নতি হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে যে সমস্ত গ্রামোন্নতির পরিকল্পনা করা হইয়াছিল তাহা হইতে বর্ত্তমানে প্রোজেক্ট অনেক ব্যাপক ও সুচিন্তিত। কিন্তু প্রোজেক্টগুলির প্রকৃত সফলতা নির্ভর করিবে দুইটি জিনিষের উপর। প্রথমতঃ,

ইহা কার্য্যকরী করিবার দায়িত্ব যে শ্রেণীর লোকের উপর দেওয়া হইতেছে তাহাদের গুণাবলীর উপর ইহার সাফল্য নির্ভর করিতেছে। গ্রামোন্নতির মহান্ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া সর্ব্বপ্রকারে গ্রামবাসীদের সঙ্গে মিলিয়া-মিশিয়া কাজ করিতে যাহারা পারিবে, একমাত্র তাহাদের দ্বারাই ইহা সফল হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, গ্রামবাসীদের পূর্ণ সহযোগিতা না থাকিলে পরিকল্পনা ব্যর্থ হইয়া যাইবে। আশাহীন, উদ্যমহীন, অশিক্ষিত ও অর্দ্ধ-শিক্ষিত গ্রামবাসীদের মনে আশার সঞ্চার করিতে হইবে। এই সব মূঢ়, মূক, ম্লান মুখে ভাষা দিতে হইবে। প্রাণে উৎসাহ জাগাইতে হইবে। তবেই এই পরিকল্পনা সার্থক ও সফল হইবে।

Q. 3. *Give an outline of the Second Five-year Plan.*

(*b*) *How does it differ from the First Five-year Plan?* (C. U. 1958)

উঃ। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পাঁচ বৎসর ১৯৫৬ সালের ৩১শে মার্চ শেষ হইয়া গিয়াছে। এই পরিকল্পনা যখন করা হইয়াছিল তখন এদেশে খাদ্যাভাব-সমস্যা ছিল,—কোরিয়ার যুদ্ধজনিত ইন্‌ফ্লেসন বর্ত্তমান ছিল। কাজেই প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বেশী অর্থ বিনিয়োগ করা সম্ভব হয় নাই—কারণ তাহার ফলে ইন্‌ফ্লেসন বাড়িতে পারিত। আর খাদ্যশস্য ও অন্যান্য কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদনবৃদ্ধির দিকেই বেশী দৃষ্টি দিতে হইয়াছিল। গত পাঁচ বৎসরে ইন্‌ফ্লেসনের ভয় কাটিয়া গিয়াছে—খাদ্যশস্য ও অন্যান্য শস্যের উৎপাদন আশাতিরিক্ত বাড়িয়াছে। কিন্তু বেকারসমস্যা গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কাঠামো সম্বন্ধে আলোচনা

শুরু করা হইয়াছে। ১৯৫৫ সালের এপ্রিল মাসে গভর্ণমেণ্ট আলোচনার উদ্দেশ্যে একটি ড্রাফট প্ল্যান ফ্রেম অর্থাৎ পরিকল্পনার খসড়া কাঠামো প্রকাশ করে। এই খসড়া কাঠামোতে বলা হইয়াছে যে, আগামী পাঁচ বৎসরে জাতীব আয় যাহাতে শতকরা ২৫ ভাগ বাড়ে ও অন্ততঃ এক কোটি দশ কি কুড়ি লক্ষ লোকের জন্য নূতন কাজের ব্যবস্থা হয় সেই অনুযায়ী অর্থ বিনিয়োগ করিতে হইবে, এবং দেশে শিল্পপ্রসারের দিকে বেশী মনোযোগ দিতে হইবে। পাঁচ বৎসরে মোট ৫,৬০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করিতে হইবে ও তাহার মধ্যে ১,৪০০ কোটি টাকা বা এক-চতুর্থাংশ শিল্পপ্রসারে ব্যয় করা হইবে। এই ১,৪০০ কোটি টাকার মধ্যে ১,১০০ কোটি টাকা লৌহ ও ইস্পাত-শিল্প, এলুমিনিয়ম, সিমেণ্ট, ইত্যাদি ও যন্ত্র-শিল্পপ্রসারে ব্যয করা হইবে। মাত্র ১০০ কোটি টাকা বস্ত্র-শিল্প, চিনি-শিল্প প্রভৃতি কারখানায় প্রস্তুত ভোগ্যবস্তুর উৎপাদনবৃদ্ধিতে লাগান হইবে ও বাকী ২০০ কোটি টাকা কুটীর-শিল্পপ্রসারে ব্যয করা হইবে।

এই খসড়া কাঠামো লইয়া নানা আলোচনা চলে। পরে ১৯৫৬ সালের জানুয়ারী মাসে প্ল্যানিং কমিশন দ্বিতীয় পরিকল্পনার খসড়া বা ড্রাফ্ট এবং মে মাসে দ্বিতীয় পরিকল্পনা প্রকাশ করে। ইহাতে প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, আগামী পাঁচ বৎসরে নানাভাবে গভর্ণমেণ্ট মোট ৪,৮০০ কোটি টাকা ও সাধারণ ব্যবসায়ীরা ১,৩০০ কোটি টাকা বিনিযোগ করিবে। অর্থাৎ দুই পক্ষ মিলিয়া মোট ৬,১০০ কোটি টাকা ব্যয় করা হইবে। ইহার ফলে জাতীয় আয় শতকরা ২৫ ভাগ বাড়িবে ও এক কোটি দশ বা কুড়ি লক্ষ লোকের জীবিকা-সংস্থানের ব্যবস্থা হইবে। কমিশনের হিসাব মতে ১৯৫০-৫১ সালে গড়পড়তা জাতীয় আয় ২২৮ টাকা ছিল। ১৯৫৫-৫৬ সালে তাহা বাড়িয়া ২৫১ টাকা হইবে আশা করা যায়। আর পাঁচ বৎসর পরে ১৯৬০-৬১ সালে জনপ্রতি জাতীয় আয় বাড়িয়া ২৯৬ টাকা হইবে বলিয়া আশা করা যায়, অর্থাৎ জনপ্রতি আয় মাসিক ২৪৷৶১০ হইবে।

গভর্ণমেন্ট যে টাকা বিনিযোগ করিবে তাহা নিম্নলিখিত খাতে ব্যয় করা হইবে।

তুলনার সুবিধার জন্য প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনার ব্যয়ের হিসাব পাশাপাশি দেওয়া হইল।

		প্রথম পরিকল্পনায় ব্যয়	মোট ব্যয়ের অংশ	দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ব্যয়	মোট ব্যয়ের অংশ
১।	কৃষি ও কমিউনিটি ডেভালপ্‌মেণ্ট	৩৭২	১৬	৫৬৫	১২
২।	জলসেচ-ব্যবস্থা	৩৯৬	১৭	৪৫৮	৯
৩।	বিদ্যুৎ-উৎপাদন	২৬৬	১১	৪৪০	৯
৪।	শিল্প ও খনিজ দ্রব্য	১৭৯	৭	৮৯১	১৯
	(ক) বড় শিল্প	১৪৯	৬	৬৯১	১৫
	(খ) কুটিরশিল্প	৩০	১	২০০	৪
৫।	যানবাহন	৫৫৬	২৪	১,৩৮৪	২৯
৬।	শিক্ষাপ্রসার, গৃহনির্ম্মাণ, পুনর্ব্বাসন প্রভৃতি	৫৪৭	২৩	৯৪৬	২০
৭।	বিবিধ	৪১	২	১ ৬	১
		২,৩৫৬		৪,৮০০	

এই তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে যে, প্রথমটির তুলনায় দ্বিতীয় পরিকল্পনাতে শিল্পপ্রসারের জন্য অনেক বেশী অর্থ ব্যয় করা হইবে। শিল্প, খনিজ দ্রব্য ও যানবাহন-ব্যবস্থার জন্য মোট অর্থের প্রায় অর্দ্ধেক ব্যয় করা হইবে। প্রথম প্ল্যানে মাত্র ৩১ অংশ ব্যয় করার কথা ছিল। ইহা ছাড়া, সাধারণ ব্যবসায়ীরা শিল্পোন্নতির কাজে মোট ৭৭০ কোটি বিনিযোগ করিবে।

গভর্ণমেণ্ট যে ৪,৮০০ কোটি টাকা ব্যয় করিবে তাহা কিভাবে তোলা হইবে তাহারও একটি তালিকা দেওয়া হইয়াছে। বর্ত্তমানে যে রাজস্ব আদায় হয় তাহা হইতে শাসনকার্য্য পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয় মিটাইয়া মোট ৩৫০ কোটি টাকা থাকিবে। নূতন নূতন কর বসাইয়া ৪৫০ কোটি টাকা তোলা হইবে। রেলওয়ের রাজস্ব হইতে ১৫০ কোটি টাকা পাওয়া যাইবে। প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড প্রভৃতি বিভাগ হইতে ২৫০ কোটি ও জনসাধারণের নিকট হইতে নানাভাবে ঋণ তুলিয়া মোট ১,২০০ কোটি টাকা পাওয়া যাইতে পারে। এগুলি মিলিয়া মোট ২.৪০০ কোটি টাকা হইবে। বিদেশ হইতে ৮০০ কোটি টাকা সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে ও ১,২০০ কোটি টাকা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ধার বাবদ মিলিবে। বাকী ৪০০ কোটি টাকা কিভাবে তোলা হইবে তাহার কোন হিসাব আপাততঃ দেওয়া হয় নাই। নূতন করের মধ্যে প্রত্যেক বৎসর সম্পত্তিকর বা ধনকর বলিয়া ট্যাক্স বসাইবার কথা আলোচনা চলিতেছে। ইহার ফলে দেশের মধ্যে আয়-বণ্টনের অসাম্যতা অনেকটা কমিবে আশা করা যায়।

এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইলে যে বেকারসমস্যার সমাধান হইবে তাহা বলা হয় নাই। এইটুকু মাত্র আশা করা যায় যে, পাঁচ বৎসর পরে বেকার-সমস্যা একই রকম থাকিবে কিংবা হয়ত সামান্য কিছু কমিতেও পারে। কারণ যদিও ১১০।১২০ লক্ষ লোকের কর্ম্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হইতেছে, জনসংখ্যাবৃদ্ধির ফলে কর্ম্মপ্রার্থী লোকের সংখ্যাও প্রায় সেই অনুপাতে বাড়িবে। কাজেই অবস্থা পূর্ব্বের মতই থাকিয়া যাইবে। তবে আশা করা যায় যে, তৃতীয় পরিকল্পনায় আরো বেশী হারে অর্থবিনিয়োগের ব্যবস্থা করিয়া বেকারসমস্যা-সমাধানের পথ সুগম করা যাইবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিল্পপ্রসারের ভিত্তিগঠনের দিকেই বেশী মনোযোগ দেওয়া হইতেছে। লৌহ ও ইস্পাতের উৎপাদন বাড়ান হইবে—যন্ত্রনির্ম্মাণ ব্যবস্থা হইবে। ইহার

ফলে আমাদের আর বিদেশ হইতে যন্ত্র আমদানী করিতে হইবে না বা কম করিতে হইবে। দেশের তৈয়ারী যন্ত্র দিয়া শিল্পপ্রসারের কাজ আরো বেশী হারে বাড়ান চলিবে। তখন আশা করা যায় বেকারসমস্যার গুরুত্ব অনেক কমিয়া যাইবে।

অনেকে প্রশ্ন করিয়াছেন যে, দেশকে করভার-জর্জ্জরিত করিয়া, প্রচুর কাগজী নোট ছাপাইয়া বাজারে চালু করিয়া এত বেশী পরিমাণ অর্থ-বিনিয়োগ করায় লাভ কি হইবে? ফলে, আসিবে ইন্‌ফ্লেসন ও জিনিষপত্রের মূল্যবৃদ্ধি। তাহা হইলে ধনীর অর্থ বাড়িবে ও গরীবের অবস্থা আরো কাহিল হইবে। ইহার চেয়ে কম কর বসাইয়া, কম নোট ছাপাইয়া কম অর্থ বিনিয়োগ করাই ত ভাল। যতটা কাপড় সংগ্রহ করা সম্ভব হইবে সেই অনুপাতে জামা তৈয়ারী করাই বিজ্ঞজনোচিত। আবার একদল লোক আছেন যাঁহারা বলেন যে, এ প্ল্যান যথেষ্ট নয়। কারণ, ইহার ফলে বেকারসমস্যার সমাধান হইবে না। দেশে কেহই বেকার না থাকে এমন ব্যবস্থা করিতে হইলে যদি আরো বেশী অর্থ বিনিয়োগ করা প্রয়োজন হয় তাহা করিতে পশ্চাদ্‌পদ হইলে চলিবে না। কারণ, বেকার সমস্যার সমাধানই আমাদের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। ইন্‌ফ্লেসনের ভয়ে চুপ করিয়া থাকিলে চলিবে না। ঠিকমত উৎপাদন বাড়াইতে পারিলেই এই বিপদ হইতে উদ্ধার পাওয়া শক্ত হইবে না। এই পথ ক্ষুরের ধারের ন্যায় দুর্গম ও বিপদসঙ্কুল সন্দেহ নাই। কিন্তু দারিদ্র্য ও বেকারসমস্যাকে পুষিয়া রাখিলে বিপদের সম্ভাবনা আরো বেশী। নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য।

Q. 4. *Give a brief outline of India's Third Five-year Plan.* (Burd. Entra. 1962)

উঃ। ১৯৬১ সালের ৩১শে মার্চ্চ দ্বিতীয় পরিকল্পনার কাজ শেষ হইয়া গিয়াছে ও পরের দিন হইতে তৃতীয় পরিকল্পনা সুরু হইয়াছে। এই

পরিকল্পনায় আগামী পাঁচ বৎসরে মোট ১১ হাজার ৬ শত কোটি টাকা ব্যয় করা হইবে। ইহার মধ্যে সরকারী তরফ হইতে মোট ৭৫০০ কোটি টাকা ও বেসরকারী তরফ হইতে ৪১০০ কোটি টাকা ব্যয় করা হইবে। এই অর্থব্যয়ের ফলে আশা করা যায় যে, আগামী পাঁচ বৎসরে আমাদের জাতীয় আয় শতকরা প্রায় ৩০ গুণ বাড়িবে এবং গড়পড়তা আয় বাৎসরিক ৩৩০ টাকা হইতে বাড়িয়া ৩৮৫ টাকায় দাঁড়াইবে। খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদন শতকরা ৩০ গুণ বাড়াইবার চেষ্টা করা হইবে এবং ইহার ফলে খাদ্যশস্য উৎপাদনে আমরা প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারিব। তৃতীয় পরিকল্পনায় কৃষির উন্নতির দিকে বেশী দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে মোট ব্যয়ের শতকরা ১৪ ভাগ (অর্থাৎ ১০৬৮ কোটি টাকা) ব্যয় করা হইবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এই বাবদ ব্যয়ের পরিমাণ ছিল শতকরা ১১ ভাগ। ইহা ছাড়া শিল্পোন্নতির দিকেও যথেষ্ট নজর দেওয়া হইতেছে। বৃহদায়তন শিল্প ও খনি শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য শতকরা ২০ ভাগ টাকা (অর্থাৎ ১৫২০ কোটি টাকা) ব্যয় করা হইবে। এই অর্থের অধিকাংশই মৌলিক শিল্প ও যন্ত্রনির্ম্মাণ শিল্প প্রসারের উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হইবে। আশা করা যায় যে, আগামী দশ বৎসরে আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় সর্ব্বপ্রকারের যন্ত্র দেশেই তৈয়ারী করিতে পারিব। যানবাহন, রাস্তা ও রেলের উন্নতির জন্যও মোটা টাকা ব্যয় করা হইতেছে। এই বাবদ মোট ১৪৮৬ কোটি টাকা ধার্য্য করা হইতেছে। কারণ উৎপাদন বাড়াইতে হইলেই যানবাহনের উন্নতি করিতে হইবে। কারণ বিভিন্ন স্থানে কাঁচামাল, শ্রমিক ও উৎপন্ন দ্রব্য চালান দিতে হইবে। ইহা ছাড়া, দেশের জনসংখ্যা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যানবাহনেরও সংখ্যাবৃদ্ধি করিতে হইবে। গ্রাম্য ও ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নতির জন্যও বেশী টাকা ধরা হইয়াছে। এই বাবদ মোট ২৬৪ কোটি টাকা ব্যয় করা হইবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এই উদ্দেশ্যে মোট ১৭৫ কোটি টাকা ব্যয় করা হইয়াছিল।

কিন্তু এত অর্থব্যয় করিয়াও এই পরিকল্পনার দ্বারা বেকার-সমস্যার সমাধান মিলিবে না। তৃতীয় পরিকল্পনায় যে যে স্কীমে অর্থ বিনিয়োগ করা হইবে তাহাতে মোট ১ কোটি ৪০ লক্ষ লোকের জন্য কর্ম্মের সংস্থান করা যাইবে। কিন্তু জনসংখ্যা যে হারে বাড়িতেছে তাহাতে দেখা যায় যে, আগামী পাঁচ বৎসরে নূতন কর্ম্মপ্রার্থীর সংখ্যা দাঁড়াইবে এক কোটি ৭০ লক্ষ। কাজেই বেকার-সমস্যার সমাধান না হইয়া বরং বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবার আশঙ্কা রহিয়াছে। তবে একবার শিল্পোন্নতির বুনিয়াদ ঠিকমত গাঁথা হইয়া গেলে তাহার উপর বহু প্রকারের শিল্প গড়িয়া তোলা সহজ হইবে। তখন হয়ত বেকার-সমস্যার সমাধান মিলিতে পারে।

সরকারী তরফ হইতে মোট ৭৫০০ কোটি টাকা ব্যয় করা হইবে। এই অর্থ কিভাবে তোলা হইবে? নিম্নে ইহার একটি তালিকা দেওয়া হইল।

১।	বর্ত্তমানে ধার্য্যকর হইতে প্রাপ্তি	৫৫০ কোটি টাকা
২।	নূতন কর ধার্য্য বাবদ	১৭১০ " "
৩।	রেলওয়ে রাজস্ব বাবদ	১০০ "
৪।	অন্য সরকারী কোম্পানী হইতে প্রাপ্তি	৪৫০ "
৫।	জনসাধারণের নিকট ধার বাবদ	৮০০ "
৬।	পোষ্টাল সার্টিফিকেট ইত্যাদি বাবদ	৬০০ "
৭।	বিভিন্ন প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড ইত্যাদি বাবদ	৫৪০ "
৮।	বিদেশ হইতে প্রাপ্তি বাবদ	২২০০ "
৯।	ঘাটতি পূরণের জন্য কাগজী নোট ছাপা	৫৫০ "
		৭৫০০

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ঘাটতি পূরণের জন্য প্রায় এক হাজার কোটি টাকার কাগজী নোট ছাপান হইয়াছে। সেই তুলনায় এইবার কমই ঘাটতি পূরণের

প্রয়োজন হইবে। তবে নূতন করধার্য্য বাবদ এত বেশী টাকা তোলা যাইবে কিনা এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কারণ দ্বিতীয় পরিকল্পনা কালে প্রায় ১০৫২৲ কোটি টাকার নূতন কর বসাইয়া তোলা হইয়াছিল।

Q. 5. *Write a brief note on the aims and objectives of the Five-year Plans.* (C. U. Pre. U. 1961 ; Burd. 1961)

উঃ। তিনটি পরিকল্পনারই কয়েকটি সাধারণ উদ্দেশ্য আছে। যেমন, প্রতি বৎসর একটি নির্দ্দিষ্ট হারে যাহাতে জাতীয় আয় বাড়ে তাহার ব্যবস্থা করা। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বলা হইয়াছিল যে, জাতীয় আয় প্রতি বৎসর শতকরা পাঁচ ভাগ বাড়াইবার চেষ্টা করিতে হইবে। অর্থাৎ পাঁচ বৎসরে শতকরা ২৫ ভাগ বাড়াইতে হইবে। তৃতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হিসাবে বলা হইয়াছে যে, প্রতি বৎসর জাতীয় আয় শতকরা অন্ততঃ পাঁচ ভাগ বৃদ্ধি পাইবে এবং আশা করা যায় যে, পাঁচ বৎসর অন্তে মোট জাতীয় আয় শতকরা ৩০ ভাগ বৃদ্ধি পাইবে।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হইতেছে বর্দ্ধিত হারে কর্ম্ম-সংস্থানের ব্যবস্থা করা। দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নূতন কর্ম্মপ্রার্থীর সংখ্যা বাড়িতেছে। তাহাদের জন্য নূতন কর্ম্মের ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রত্যেক পরিকল্পনাতেই এই দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় ইহা সত্ত্বেও বেকার-সমস্যার সমাধান পরিকল্পনাগুলির দ্বারা সম্ভব হয় নাই। বরঞ্চ আশঙ্কা আছে যে, তৃতীয় পরিকল্পনা যখন শেষ হইবে তখন বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে পারে।

তৃতীয় উদ্দেশ্য হইতেছে দেশের মধ্যে আর্থিক বৈষম্য দূর করা ও সমাজ-তান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের ব্যবস্থা করা। পরিকল্পনাগুলি এমনভাবে গঠন করা হইবে যে, ইহার ফলে ধনী-দরিদ্রের মধ্যে আয়ের ও সম্পত্তির পার্থক্য কমিতে থাকিবে। জনসাধারণের সুবিধার জন্য স্কুল, কলেজ,

হাসপাতালের সংখ্যা বাড়াইতে হইবে ও গ্রামাঞ্চলের উন্নতি করিতে হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, গত দশ বৎসরে, ধন-বৈষম্য না কমিয়া বরং বাড়িয়াছে। ইহা কতদুর সত্য এবং সত্য হইলে কিভাবে তাহা হইয়াছে এই বিষয় পরীক্ষা করিবার জন্য সরকার হইতে একটি কমিটি গঠন করা হইয়াছে।

এই তিনটি ছাড়াও পরিকল্পনাগুলির অন্য উদ্দেশ্যও আছে। যেমন তৃতীয় পরিকল্পনায় বলা হইয়াছে যে, খাদ্যশস্য এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য শস্য উৎপাদনে আমাদিগকে স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করিতে হইবে এবং ইহা আগামী পাঁচ বৎসরের মধ্যেই যাহাতে করা যায় সেই চেষ্টা দেখিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, লোহ, ইস্পাত, কয়লা ও যন্ত্র-শিল্পের যথেষ্ট প্রসার বৃদ্ধি করিতে হইবে যাহার ফলে আমরা আগামী দশ বৎসরের মধ্যে নিজেদের প্রয়োজনীয় যন্ত্র ও অন্যান্য দ্রব্য দেশের মধ্যেই তৈয়ারী করিতে পারি। অর্থাৎ আমাদের অর্থনৈতিক সংস্থা যাহাতে স্বয়ং প্রসারশীল হয় সেইদিকে চেষ্টা করিতে হইবে।